সিয়াসতনামা

প্রসঙ্গ কথা

'সিয়াসতনামা'র লেখক নিজাম-উল-মুল্‌ক (১০১৭—১০৯২) ছিলেন পারস্যবাসী। তুসের নিকটবর্তী রাকন গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পুরা নাম আবু আলী আল হাসান ইব্‌নে আলী ইব্‌নে ইসহাক আল তুসী। তিনি আল্‌প আরসালান ও মালিক শাহের শাসনকালে প্রধান উজীর ছিলেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপে সুচিন্তিত নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে শুধু সাধারণভাবে কল্যাণকামী সরকারের বিষয় সম্পর্কেই নয়, বিচারালয়, কর আদায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনসাধারণ ও সৈনিকদের সমস্যাসমূহের সমাধান সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষনধর্মী বিশদ আলোচনা করেছেন।

নিজাম-উল-মুল্‌ককে রাজনীতি ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলীর পূর্বসূরী বলা যায়। দু'জনের মধ্যে বৈপরীত্য ও সাদৃশ্য উভয়ই রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে উভয়ের নীতিই বিশেষভাবে বাস্তবানুগ ও ভাবালুতাবর্জিত ছিল; পার্থক্য হচ্ছে নিজাম-উল-মুল্‌কের নীতি প্রধানতঃ সর্বসাধারণের কল্যাণ-অভিসারী; অপরপক্ষে ম্যাকিয়াভেলীর নীতি রাজা ও রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে বেশী যত্নবান। সে যাই হোক, নিজাম-উল-মুল্‌কের রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে পরিচয় যে বর্তমানকালেও আমাদের রাষ্ট্রনীতিমূলক চিন্তাকে সমৃদ্ধ করবে, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা এর অনুবাদ কার্যে হাত দিয়েছি।

'সিয়াসতনামা'র অনুবাদ করেছেন যাহিদ হোসেন গ্রন্থটি পাঠকদের সমাদর পেলে আমরা খুশী হব।

কবীর চৌধুরী

ঢাকা : ৩০শে জুলাই, '৬৯ — পরিচালক : বাংলা একাডেমী

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

১। আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ ও তাঁর অজস্র প্রশংসা, কারণ তিনিই বেহেশ্‌ত ও দোযখের স্বষ্টিকর্তা, স্বষ্ট জীবকে খাদ্য প্রদানকারী, গোপন-অগোপন সকল বিষয়ে জ্ঞাত এবং গোনাহ্‌ মাফকারী। আর হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ও শান্তি, কারণ তিনি দুনিয়ার আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, শ্রেষ্ঠতম নবী, কুরআনের মহান বাণী বহনকারী এবং তিনিই কেয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর বংশধর ও সহচরদের প্রতি বর্ষিত হোক আশীর্বাদ।

২। রাজকীয় গ্রন্থাগারের নকলনবিসের মতে সুলতান মালিক শাহ্‌ ৪৮৯ হিঃ সালে (খ্রীঃ ১০৮৬) কয়েকজন সম্ভ্রান্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখতে আদেশ দিলেন যে, 'আমাদের সময়ে দেওয়ান, দরবার, রাজপ্রাসাদ বা হল-কক্ষের কোন কিছু অকেজো পড়ে আছে কিনা---এ সমস্ত জিনিসের কোন কিছুর নীতি বা কার্যরীতি আমাদের দ্বারা অবহেলিত হচ্ছে কিনা অথবা আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে কিনা। আমাদের পূর্ববর্তী রাজারা পালন করতেন এমন কোন বিধান আমরা অমান্য করছি কিনা, পূর্ববর্তী রাজাদের আইন ও রীতি কিরূপ ছিল, সেগুলোর সমন্বয়ে একটা বিধান তৈরী করা দরকার আমাদের বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য। সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই যেন আমরা এর পরের সব ধর্ম সম্বন্ধীয় ও পার্থিব কা´ সমাধা করতে পারি যাতে প্রতিটি কার্যই ন্যায়ভাবে সম্পন্ন হয় এবং অন্যায় প্রথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ্‌ আমাদের যে-কোন রকম বিরূপ শক্তির মোকাবেলা করার ক্ষমতা দিয়েছেন, এরপর থেকে আমাদের কোন কিছুই অসৎ উপায়ে করা উচিত নয় এবং কোন কিছুই আমাদের নজরের বাইরে হওয়া উচিত নয়।' যাঁদেরকে সুলতান মালিক শাহ্‌ এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নিজামুল মুল্‌ক, শরফুল মুল্‌ক ও মজিদুল মুল্‌কও ছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বক্তব্য সুলতানের কাছে পেশ করেছিলেন। সুলতান শুধুমাত্র উজির নিজামুল মুল্‌কের বক্তব্যই গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান মন্তব্য করেছিলেন, 'এ অধ্যায়গুলো একদম আমার মনের মত করে লেখা হয়েছে। এটা এত নিখুঁত হয়েছে যে এতে কিছুই

সংযোগ করার প্রয়োজন নাই। এটাকে আমি পথ-নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করব এবং এর বিধিগুলো মেনে চলব।' তারপর থেকে সুলতান সর্বদাই এ পুস্তকের বিধান অনুসারে চলতেন, পুস্তকের নির্দেশ অনুযায়ীই তিনি আদেশ দিতেন এবং সন্ধিপত্র লিখতেন।

এখন আমি, মোহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ্, বিনীতভাবে নিজের বক্তব্য ও নতুন অঙ্গীকারপত্র পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরগায় পৌঁছিয়ে দেবার নিমিত্ত এ পুস্তকের একখানি কপি মহতী রাজকীয় গ্রন্থাগারে উপস্থাপিত করতে চাই। আমার এ নগণ্য উপহার যেন আল্লাহ্ গ্রহণ করেন।

৩। প্রত্যেক রাজা বা সম্রাটের জন্য এ পুস্তকখানি রাখা এবং এ সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন—বিশেষ করে বর্তমান যুগে। কারণ পুস্তকখানি যতই পড়া যায়, ততই স্বর্গীয় ও পার্থিব বিষয় সম্পর্কে জানা যায়, ততই বন্ধু ও শত্রুর ধরন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। এ পুস্তকখানি পড়লে শুধু সদাচরণ এবং কল্যাণকামী সরকারের পথই প্রসারিত হয় না, বিচারালয়, দেওয়ান, রাজপ্রাসাদ এবং সৈনিক প্রদর্শন মাঠের ব্যবস্থা বিধান এবং কর আদায়ের, ব্যবসা বাণিজ্যের এবং জনসাধারণ-সৈনিক সম্বলিত সমস্যাসমূহ সমাধানের পথও সহজ হয়ে যায়। এক কথায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ এবং দূর-নিকটের যে-কোন সমস্যাই আর অজ্ঞাত থাকে না (আল্লাহ্‌র রহমতে)।

৪। এ পুস্তকখানি ৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অংশ

(১) ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন এবং সুলতানের প্রশস্তি---আল্লাহ্ তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করুন।

(২) সুলতানের প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম কৃপার স্বীকৃতি।

(৩) অন্যায় অবিচার দূর করার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য দরবার করা প্রসঙ্গে।

(৪) কর আদায়কারী এবং মন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্পর্কীয় অনুসন্ধান প্রসঙ্গে।

(৫) ভূমি স্বত্বাধিকারী প্রসঙ্গ এবং কৃষকদের প্রতি তাদের ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান।

(৬) বিচারক, ধর্মপ্রচারক ও পরিদর্শক এবং তাদের কার্যাবলীর গুরুত্ব।
(৭) কর আদায়কারী, বিচারক, পুলিশ-প্রধান এবং নগরাধ্যক্ষদের আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের উপর নজর রাখা।
(৮) ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং তথ্য সংগ্রহ।
(৯) উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা ও তাঁদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা।
(১০) গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী ও তাদের কাজের গুরুত্ব প্রসঙ্গে।
(১১) শাহী দরবার থেকে জারীকৃত নির্দেশাবলী এবং রাজাজ্ঞার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
(১২) জরুরী কার্যে দরবার থেকে হুকুম জারী করা বা পেয়াদা পাঠান।
(১৩) দেশের ও জনগণের মঙ্গলার্থে গুপ্তচরদের ব্যবহার করা।
(১৪) বার্তাবহদের সর্বদা কর্মব্যস্ত রাখা।
(১৫) সুরামত্ত অবস্থায় মৌখিক আদেশে সতর্কতা।
(১৬) গৃহনবিস ও তার গুরুত্ব ও দায়িত্ব।
(১৭) সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে।
(১৮) বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ।
(১৯) বিশেষ রক্ষীদের প্রয়োজনীয় বস্তু ও তাদের পরিচালন ব্যবস্থা।
(২০) মূল্যবান পাথর খচিত বিশেষ অস্ত্রের রীতি ও ব্যবহার।
(২১) রাজ্য-প্রতিনিধি (দূত) এবং তাঁদের প্রতি ব্যবহার।
(২২) পশুর খাদ্য মওজুদ রাখা।
(২৩) প্রতিটি সৈনিকের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া।
(২৪) বিভিন্ন জাতের সৈন্য রাখা।
(২৫) জামিন-ব্যক্তিদের শাহী দরবারে রাখা।
(২৬) চাপরাসী ধরনের কাজে তুর্কীদের নিয়োগ।
(২৭) ক্রীতদাসদের কাজের সংবিধান করা—যাতে তাদের কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।
(২৮) সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের অভিযোগ শ্রবণ প্রসঙ্গে।
(২৯) মদ্যপায়ীদের রীতি-নীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে।
(৩০) কার্যরত ক্রীতদাস ও ভৃত্যদের দাঁড়ানোর নিয়ম।
(৩১) যুদ্ধ ও যুদ্ধাভিযানের জন্য অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরী করা।

(৩২) সৈনিক, ভৃত্য এবং অনুচরদের অনুরোধ ও অভিযোগ সম্পর্কে।
(৩৩) ভুলের বা অন্যায়ের জন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তিরস্কার করা।
(৩৪) নৈশপ্রহরী, রক্ষী এবং মুটে প্রসঙ্গে।
(৩৫) লোকদের ভালভাবে খাওয়ান তথা আতিথেয়তা প্রসঙ্গে।
(৩৬) উপযুক্ত ভৃত্য ও ক্রীতদাসদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া।
(৩৭) জায়গীর অধীনস্থ জমি এবং কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন।
(৩৮) কোন ব্যাপারে রাজার হঠাৎ কিছু করে না বসা প্রসঙ্গে।
(৩৯) রক্ষী-প্রধান, দণ্ড-ধারী এবং শাস্তিদানের অস্ত্র প্রসঙ্গে।

দ্বিতীয় অংশ

(৪০) আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন এবং রাজ্যের সব ব্যাপার ও রীতি-নীতিতে শৃঙ্খলা আনয়ন প্রসঙ্গে।
(৪১) একজনকে দুই পদে নিয়োগ না করা : বেকার লোকদের চাকরি দেওয়া এবং তাদেরকে অভাবগ্রস্ত না করা : অন্ধবিশ্বাসীদের এবং যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন গোঁড়া মতাবলম্বীদের চাকরি দেওয়া প্রসঙ্গে এবং বিকৃত সম্প্রদায় ও অসৎ নীতিবাদীদের চাকরি না দিয়ে দূরে রাখা।
(৪২) অবগুণ্ঠনবতীদের তাঁবেদার হওয়া প্রসঙ্গে।
(৪৩) দেশ ও ইসলামের শত্রু ও বিধর্মীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।
(৪৪) মাজদাকের বিদ্রোহ, তার গোত্রের নীতি এবং যে অবস্থায় নওশেরওয়াঁর হাতে তার মৃত্যু হয়েছিল।
(৪৫) পারসিক পুরোহিত সিনবাদের বিদ্রোহ এবং খুররামিয়াদের আবির্ভাব।
(৪৬) কোহিস্তান, ইরাক ও খোরাসানের কারমাতিয়ান ও বাতিনীদের উত্থান।
(৪৭) ইস্পাহান ও আজারবাইজানে খুররামিয়াদের উত্থান।
(৪৮) রাজকোষ এবং সেগুলো দেখাশুনা করার রীতি-নীতি প্রসঙ্গে।
(৪৯) অভিযোগকারীদের প্রতিবিধান ও ন্যায়বিচার করা।
(৫০) প্রদেশসমূহের রাজস্বের হিসাব রক্ষণ-প্রণালী প্রসঙ্গে।

৫। নিজামুল মুল্‌ক প্রথমে পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতীতই এ পুস্তকের উনচল্লিশটি অধ্যায় রচনা করে সুলতান মালিক শাহের কাছে পেশ করেন। পরে তিনি এটা সংশোধন করেন এবং তাঁর মনে এ রাজবংশের শত্রুদের শঙ্কা থাকাতে তিনি আরো এগারটি অধ্যায় সংযুক্ত করে প্রতি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় যুক্ত করে দেন। বিদায়ের সময় তিনি পুস্তকখানা আমার কাছে দিয়ে যান। পরে বাগদাদে যাবার পথে তাঁর প্রতি বাতিনীরা বিদ্রোহ করে তাঁকে হত্যা করার দরুন আমি আর পুস্তকখানা প্রকাশ করতে সাহস করি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান সময়ে ন্যায়বিচার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।- - - - - - - -

প্রথম অধ্যায়

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন ও সুলতানের প্রশস্তি—আল্লাহ্ তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করুন।

প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্ তায়ালা এক একজন মানুষকে বেছে নেন এবং তাঁকে মহৎ গুণের অধিকারী করে সারা দুনিয়ার মানুষের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। তাঁর উপরই আল্লাহ্ দুর্নীতি, আত্মকলহ ও বিশৃঙ্খলার দ্বার বন্ধ করার দায়িত্ব দেন। তাঁর মধ্যে আল্লাহ্ এমন কতকগুলো গুণের সমাবেশ ঘটান যে, তাঁর ন্যায় শাসনে সকলেই সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারে এবং সকলেই চায় যেন তাঁর রাজত্ব আরো বেশী দিন চলে।

যখনই আল্লাহ্র বান্দা কোন পবিত্র আইনকে অমান্য করে বা শ্রদ্ধা করে না অথবা আল্লাহ্র বাণীর প্রতি যখনই কোন তাচ্ছিল্য দেখান হয়, তখনই তিনি শাস্তি দ্বারা তা সংশোধন করতে চান এবং পাপীকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। আল্লাহ্র বাণীর অবমাননা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ অমান্যকারীদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পরিত্যাগ করেন। অরাজকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বিভিন্ন দলের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব, তার থেকে রক্তপাত। যে বেশী শক্তিশালী সে তার ইচ্ছামত যা খুশী করে—যতদিন পর্যন্ত দুনিয়া কলুষমুক্ত না হয়, পাপীরা যতদিন না দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়। এমন কি, অনেক নিরীহ লোক এ স্বার্থদ্বন্দ্বের খোরাকে পরিণত হয়—যেমনি করে নল-খাগড়ার বনে আগুন ধরলে শুকনা পাতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কাঁচা পাতাও পুড়ে যায়।

এমনি পরিস্থিতিতে স্বর্গীয় আদেশে এমন একজন অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব হয়, যিনি আল্লাহ্র বাণীর অধিকারী হয়ে সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞতার গুণে গুণান্বিত হন। তার ফলে তিনি তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের যার যার গুণাগুণ ও মেধা অনুসারে কাজে নিয়োগ করতে সক্ষম হন এবং যোগ্যতা অনুসারে তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা উপভোগ করার সুযোগ দেন। তিনি জনগণের মধ্য থেকেই তাঁর মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকের ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যে পূর্ণ আস্থা রাখেন। প্রজারা যদি অনুগত হয়ে কাজ করে

এবং নিজেদেরকে কাজের মধ্যে নিমগ্ন করে রাখে, তাহলে তিনি ঐ সমস্ত প্রজার যাতে কষ্ট না হয় এবং তারা যাতে ন্যায় বিচার উপভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা তিনি করেন। যদি তাঁর কোন কর্মচারী বা মন্ত্রী অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় বা অত্যাচার শুরু করে, তবে তিনি ঐ কর্মচারী বা মন্ত্রীকে তার পদে বহাল রাখবেন শুধুমাত্র উপদেশ বা শাস্তির মাধ্যমে ভুল সংশোধনের জন্য ; হয়ত বা পরে সে তার অজ্ঞতা বুঝতে পারে। কিন্তু যদি সে অপরিবর্তিত থেকে যায়, তাহলে সুলতান তাকে পদচ্যুত করে দিবেন এবং তার স্থলে কোন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন। আবার যখন প্রজারা অকৃতজ্ঞ হয় এবং স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছন্দতা পছন্দ না করে পক্ষান্তরে প্রতারণা করার কথা চিন্তা করে অদম্য হয়ে উঠে, তখন সুলতান তাদের কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করবেন এবং তাদের কৃতকর্মের সমপরিমাণ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এভাবেই তিনি দুষ্টলোকদের তাদের বদ কাজের জন্য শাস্তি দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। তা ছাড়া তিনি এমন সব কাজও করবেন যা মানব সভ্যতাকে আরো এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি মাটির নীচ দিয়ে খাল খনন করবেন, বর্তমান খালগুলোকে আরো প্রশস্ত করবেন, পুল নির্মাণ করে বড় বড় নদীকে সংযুক্ত করবেন, গ্রামসমূহ ও কৃষিকার্যের পুনঃব্যবস্থা করবেন, বড় বড় তাঁবু এবং আবাস গৃহ নির্মাণ করে নতুন নতুন শহর গড়ে তুলবেন। তিনি বড় বড় রাস্তার পাশে সরাইখানা নির্মাণ করবেন এবং বিদ্যার্থীদের জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ করবেন। ঐ সমস্ত মহৎ কাজের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং তাঁর কৃতকর্মের ফল তিনি উপভোগ করবেন পরজগতে।

আল্লাহ্‌র আদেশ এমন ছিল যে, বর্তমান যুগে বিগত সমস্ত যুগের কীর্তি লিপিবদ্ধ থাকবে এবং পূর্বতন সুলতানদের কার্যাবলীরও একটা তালিকা থাকবে যাতে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের এমনভাবে পুরস্কৃত করতে পারেন যা পূর্বে কখনও হয় নি। আল্লাহ্‌ এমন সব লোকদের সুলতান হবার উপযুক্ত মনে করেন, যাঁদের মধ্যে রাজধর্ম ও মহত্ত্ব এ দু'টি গুণের সমাবেশ আছে যা আদি যুগ থেকে, এমন কি, মহান আফ্রাসিয়াবের (ইরানের আদি সুলতান) সময় থেকে চলে আসছে। আল্লাহ্‌ সুলতানের মধ্যে এমন ক্ষমতা ও গুণের সন্নিবেশ করেছেন যা পূর্ববর্তী রাজাদের মধ্যে ছিল না। শান্ত চেহারা, দানশীল স্বভাব, পূর্ণতা, পৌরুষ, সাহসিকতা, অশ্বশিক্ষা, পারদর্শিতা, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান, দয়া-দাক্ষিণ্য, ওয়াদা

করার ও তা পালন করার ক্ষমতা, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র উপাসনায় মত্ত, নৈশ উপাসনা (৫ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও) প্রভৃতি মহৎ গুণে গুণান্বিত, অতিরিক্ত রোযা পালন, কুরআন-হাদীসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ধর্মনিষ্ঠ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখান, জ্ঞানী ও গুণীদের সমাবেশে যাওয়া, নিয়মিত ভিক্ষা দেওয়া, গরীবের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখান, চাকর বাকর ও অন্যান্য অধস্তন ব্যক্তিদের প্রতি সহৃদয় হওয়া এবং অত্যাচার থেকে লোকদের রক্ষা করা ইত্যাদি রাজকীয় গুণে আল্লাহ্ সুলতানকে গুণান্বিত করেন। তারপর আল্লাহ্ সুলতানকে তাঁর যোগ্যতা ও বিশ্বাস অনুযায়ী ক্ষমতা ও রাজ্যের অধিকারী করতেন। এ ভাবেই তাঁকে সমস্ত দুনিয়ার শাসনকর্তা করে দিতেন এবং তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতা দুনিয়ার সব দেশে ছড়িয়ে পড়ত। ফলে দুনিয়ার সকলেই সুলতানের করদাতায় পরিণত হোত এবং যতদিন তারা সুলতানের সাহায্যপ্রার্থী হোত, তিনি তাদের রক্ষা করতেন।

খলীফাদের কারো কারো আমলে যখন কোন নতুন রাজ্য জয় করা হোত বা রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করা হোত, তখন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও রাজদ্রোহিতা লেগেই থাকতো। কিন্তু সে সময় কেউ ঘূণাক্ষরেও বিরোধিতা করার কথা চিন্তা করত না বা খলীফার আদেশ অমান্য করত না। আল্লাহ্ যেন বর্তমান সাম্রাজ্য কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন এবং দুশ্চরিত্র লোকদের দমন করে ইহার পবিত্রতা রক্ষা করেন---যাতে প্রজারা এ অপক্ষপাত কর্তৃত্বে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে।

এটাই হোল এ দুনিয়ার বড় বড় রাজ্যের নিয়ম। রাজ্যের বিশালতার পরিমাণেই রাজ্য জ্ঞানী ব্যক্তি ও মহৎ প্রতিষ্ঠানে ভূষিত হয়। শাসকের বিজ্ঞতা হোল একটা মোমবাতির মত—যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে অনেকগুলো জ্ঞানের আলো। তাঁর কোন উপদেষ্টা বা পথ-প্রদর্শক থাকে না কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ একা ন'ন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর কর্মচারীদের পরীক্ষা করেন, তাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞতার পরিমাণ যাচাই করেন। তাই সুলতান তাঁর অধীনস্থদের যখনই ঐ সমস্ত রাজকীয় গুণাবলী সম্পর্কে (যা তিনি আগে পালন করলেও এখন আর পারছেন না, আর সেটা প্রশংসনীয় হোক আর অপ্রশংসনীয়ই হোক) লিখতে আদেশ দিতেন, তারা তখন যা দেখেছে, যা শিখেছে, পড়েছে বা শুনেছে সেটা সম্পর্কে ইচ্ছানুসারে লিখে রাজাদেশ পালন করত। এ সমস্ত অধ্যায় তারই সংক্ষিপ্তসাররূপে লেখা হয়েছে এবং যেটা যে অধ্যায়ে প্রযোজ্য, সেটা সেখানে সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতানের প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপার স্বীকৃতি

রাজার আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান করা উচিত। দানশীলতা ও আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি ন্যায়বিচারেই নিহিত আছে আল্লাহ্‌র বাণীর মর্মকথা। জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরই নির্ভর করে রাজ্যের স্থায়িত্ব, সম্প্রসারণ আর রাজার ক্ষমতা ও উন্নতি। এ দুনিয়ায় তিনি পাবেন সুখ্যাতি আর পরকালে পাবেন মুক্তির পথ। মহৎ ব্যক্তিদের মতে 'ধর্মহীন রাজ্য চলতে পারে কিন্তু অত্যাচারিত রাজ্য চলবে না।'

কথিত আছে যে, হযরত ইউসুফ নবীর (আঃ) মৃত্যুর পর তাঁকে যখন তাঁর পিতৃপুরুষদের পার্শ্বে কবর দেওয়ার জন্য হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) কবরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন জিব্রাঈল এসে বলেছিলেন, 'থামো, তোমরা কোথায় যাচ্ছ---এ জায়গা তার জন্য নয় কারণ কেয়ামতের দিন তাকে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।' এখন ইউসুফ নবীর অবস্থাই যদি এরূপ হয়ে থাকে তবে অন্যান্য সকলের অবস্থা কেমন হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর একটি হাদীসে আছে যে, কেউ যদি ক্ষমতা উপভোগ করে থাকে এবং আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি আদেশ দিয়ে থাকে, তবে কেয়ামতের দিন তার হাত বাঁধা হবে। যদি সে ন্যায়নীতিপরায়ণ হয়ে থাকে তবে তার ন্যায়নীতিই তাকে মুক্ত করবে এবং তাকে বেহেশ্‌তে পাঠিয়ে দিবে। আর যদি সে অন্যায় পথ অবলম্বন করে থাকে তবে তার কৃতকর্মই তাকে হাত-বাঁধা অবস্থায় দোযখে নিক্ষেপ করবে।

আর একটি হাদীসে আছে যে, যদি কেউ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি কর্তৃত্ব করে থাকে, এমন কি, তার পরিবারের বা তার তাঁবেদার কারো উপর কর্তৃত্ব করে থাকে, তবে তাকেও তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এমন কি, মেষপালককে তার মেষপালনের জন্য কেয়ামতের দিন জবাবদিহি হতে হবে।

কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ইবনে আল খাত্তাব তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে পিতা! কোথায় এবং কখন আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে?' ওমর উত্তর দিয়েছিলেন,

'পরকালে'। 'আমার মনে হয় দেখাটা খুব শীঘ্র হবে'— আবদুল্লাহ্ আবার তাঁর পিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন। পিতা জবাব দিয়েছিলেন, 'তুমি আমাকে আজ কাল অথবা তার পরের রাত্রে স্বপ্নে দেখবে।' দীর্ঘ বার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল তবুও আবদুল্লাহ্ স্বপ্নে তাঁর পিতাকে দেখলেন না। তারপর এক রাত্রে হঠাৎ তিনি তাঁর পিতাকে স্বপ্নে দেখে বললেন, 'হে পিতা, আপনি কি বলেছিলেন না যে তিন রাত্রের মধ্যেই আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখবো।' পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'প্রিয় পুত্র, আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। কারণ বাগদাদের নিকটবর্তী রাজ্যে একটা সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সরকারী কর্মচারীরা তা সারে নি। ফলে একদিন একটা ভেড়ার সামনের পা'টি ভাঙ্গা সেতুর একটা ছিদ্র দিয়ে পড়ে ভেঙ্গে যায়। এতদিন আমাকে তারই জবাবদিহি করতে হয়েছে।'

সারা বিশ্বের শাসনকর্তার (খোদা যেন তাঁর রাজত্ব স্থায়ী করেন) নিশ্চিত জানা উচিত যে, কেয়ামতের দিন তাঁকে তাঁর অধীন দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সকলের পক্ষ থেকে উত্তর দিতে হবে। যদি তিনি তাঁর দায়িত্ব অন্য কারো উপর ন্যস্ত করতে চান তবে আল্লাহ্ তাঁর কথা শুনবেন না। ব্যাপারটা যখন এরূপ, তখন সুলতানের পক্ষে এমনি একটা জরুরী জিনিস অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না এবং উচিত হবে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের কাউকে অবিশ্বাস করা। তাঁর সাধ্যমত সকলের অবস্থার সঙ্গে জড়িত হবার চেষ্টা করা উচিত—সেটা গোপনেই হোক আর প্রকাশ্যেই হোক। অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করা উচিত এবং রক্ষা করা উচিত নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারীর কবল থেকে যাতে এ সমস্ত মহৎ কার্যের পুরস্কারগুলো তাঁর সময়েই আসে।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যায় অবিচার দূর করা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য দরবার করা সম্বন্ধে

সুলতানের সপ্তাহে দুই দিন নিজে আদালতে বসে অন্যায়ের বিচার করা, অত্যাচারীদের থেকে জরিমানা আদায় করা এবং প্রজাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী শোনা একান্ত প্রয়োজন। বেশী জরুরী বিষয়গুলোর জন্য সুলতানের কাছে আগেই লিখিত দরখাস্ত দিলেই ভাল হয়—যাতে তিনি প্রত্যেকটাতেই তাঁর রায় দিতে পারেন বা মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। কারণ সমস্ত রাজ্যে যখন এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে যে সুলতান নিজে সপ্তাহে দুই দিন বিচারে বসে বাদী-আসামী সকলের মতামত শুনেন, তখন সব অত্যাচারী ভয়ে তাদের অত্যাচার কমিয়ে দিবে এবং কেউ তখন শাস্তির ভয়ে অসাধুতা অবলম্বন করতে বা অন্যায়ভাবে কিছু অপহরণ করতে সাহস করবে না।

আমি প্রাচীন গ্রন্থে পড়েছি যে, অ-আরব (পারসিক) রাজাদের প্রায় সকলেই একটি উন্নত মঞ্চ সংস্থাপন করে সেখানে অশ্বপৃষ্ঠে বসে বিচার করতেন যাতে তিনি বাদী-বিবাদী উপস্থিত সকলকেই দেখতে পান। রাজা মনে করতেন যে তিনি তোরণ, তালা, দেউড়ি এবং পর্দার অন্তর্নিহিত কোন স্থানে বসলে স্বার্থান্বেষী অত্যাচারী ব্যক্তিরা বাদীদের পিছনে রাখবে এবং রাজার সামনে যেতে দিবে না।

আমি একজন কানে-খাট রাজার কথা শুনেছি। বিচারের সময় তিনি খুব চিন্তিত থাকতেন এই ভয়ে যে পাছে যদি বর্ণনাকারী বাদীর কথা সঠিকভাবে শুনতে না পান এবং সত্য কাহিনী না জেনে তিনি এমন একটা রায় দিয়ে দেন যা ঐ নালিশের বেলায় প্রযোজ্য নয়। সেজন্য তিনি সব বাদীকে লাল কাপড় পরার হুকুম দিয়েছিলেন যাতে তিনি সকলকে চিনতে পারেন। রাজা নিজে অরঞ্জিত পোশাকে হাতীর পিঠে চড়ে আসতেন এবং লাল পোশাকে কাউকে দেখলেই তাদের একত্র জমায়েত হতে আদেশ দিতেন। তখন তিনি দূরে এক জায়গায় বসতেন এবং বাদীদেরকে ডাকতেন। প্রত্যেকে জোরে জোরে রাজার কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করত এবং রাজা তাদের ন্যায়বিচার করতেন।

লোকেরা এ সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে এজন্য যে, পরকালে সবকিছুর জবাবদিহির সময়ে যেন অজ্ঞ না থাকতে হয়।

ন্যায়পরায়ণ আমীর ও সাফ্‌ফারীদের গল্প

সামানী বংশের একজন রাজা ছিলেন ইসমাঈল ইবনে আহ্‌মদ। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁর কতকগুলো সদ্‌গুণ ছিল। তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং গরীবদের প্রতি তাঁর ছিল উদার মন। তিনি বোখারাতে থাকতেন। খোরাসান, ইরাক এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের করতলে।

ইয়াকুব ইবনে লাইস সিস্তান (জরাঞ্জ) নগর থেকে বিদ্রোহ করে সমগ্র সিস্তান এবং খোরাসান দখল করে নেয়। পরে ইরাকও তার করায়ত্তে চলে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে প্ররোচিত করে এবং সে গোপনে ইসমাঈলীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাগদাদের খলীফার বিরুদ্ধে তার খুব ক্ষোভ ছিল, তাই সে খোরাসান ও ইরাকের সৈন্য-সামন্ত দলবদ্ধ করে বাগদাদে গিয়ে খলীফাকে মেরে ফেলতে এবং আব্বাসীদের ক্ষমতাচ্যুত করার প্রস্তুতি নিল।

এদিকে ইয়াকুবের বাগদাদ অভিমুখে রণসজ্জায় যাত্রার কথা খলীফার কানে গিয়ে পোঁছল। তিঁনি একজন দূতের মারফৎ খবর পাঠালেন, 'বাগদাদে এসে তোমার কোন লাভ নেই। কোহিস্তান, খোরাসান এবং ইরাকে থেকে সেখানকার অবস্থা তদারক করা তোমার উচিত যাতে কোনরকম বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি না হয়। তাই, তুমি ফিরে যাও।' সে খলীফার আদেশ অমান্য করে বলে পাঠাল, 'যতদিন পর্যন্ত আমি নিজে গিয়ে খলীফার দরবারে হাজির হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতে না পারি, ততদিন আমি ফিরব না।' খলীফা যে সমস্ত দূত পাঠিয়েছিলেন সকলকেই এই একই উত্তর দিয়েছিল। এরপর ইয়াকুব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাগদাদের দিকে ধাবিত হয়। এদিকে খলীফার মনে সন্দেহ জাগল, তিনি সভাসদদের ডেকে বললেন, 'ইয়াকুব ইবনে লাইস এখন অবাধ্য হয়ে উঠেছে, আমি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে দুরভিসন্ধি নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাকে যেভাবেই আমরা বিচার করি না কেন, তার মধ্যে একটা অসৎ উদ্দেশ্য জমাট বেঁধেছে। আর আমার মনে হয়, সে বাতিনীদের (সাধারণতঃ সুন্নীরা শী'আদের এবং ইসমাঈলীদের বেলায় ব্যবহার করে) সঙ্গে জোট

বেঁধেছে, তা সে এখানে না আসা অবধি প্রকাশ করবে না। তবে আমাদের কোন মতেই তার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনে গাফলতি করা ঠিক না এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা এখনই ঠিক করা উচিত।' সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হোল যে, খলীফা শহর থেকে গ্রাম অঞ্চলে চলে যাবেন এবং বাগদাদের সকল পাত্র-পারিষদও খলীফার সঙ্গে থাকবে। ইয়াকুব এসে যখন খলীফাকে তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একটা গ্রামের মধ্যে দেখবে, তখন তার উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে খলীফার বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্রও প্রকাশ হয়ে পড়বে। তারপর সকলে এদিক ওদিক গিয়ে এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে ছড়িয়ে পড়বে, কারণ ইয়াকুব বিদ্রোহ করতে চাইলেও ইরাক ও খোরাসানের সকল পাত্র-পারিষদ একমত হবে না, তার হুকুম তামিল করবে না। আর যদি সে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে মোকাবিলা করবে তাদের সর্বস্ব দিয়ে, তবে যদি তাতে হেরে যায় তাহলে তাদের জন্য যে-কোন দিকে পালিয়ে যাবার রাস্তা খোলা থাকবে; তারা চারদেওয়ালের মধ্যে বেষ্টিত আসামীর মত ধরা পড়বে না। খলীফা এ ফন্দিটা গ্রহণ করেছিলেন এবং সকলে ঐ মোতাবেক কাজ করেছিল। আর আল-মুতামিদ আলা আল্লাহ্ ই ছিলেন এই খলীফা।

ঠিক সময়মত ইয়াকুব এসে পোঁছল এবং খলীফার তাঁবুর উল্টো দিকে তার তাঁবু গাড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'দলের লোকেরা একত্রে মিলে গেল। ঠিক সেদিনই ইয়াকুব খলীফার বশ্যতা অস্বীকার করে খলীফার কাছে এক দূত পাঠিয়ে বলে পাঠাল, 'বাগদাদ ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।' খলীফা দুই মাসের সময় চাইলেন কিন্তু ইয়াকুব তাঁর প্রার্থনা না-মঞ্জুর করে দিল। রাত্রিবেলা খলীফা একজনকে ইয়াকুবের অফিসারদের কাছে বলে পাঠালেন, 'ইয়াকুব সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করে শী'আদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার উদ্দেশ্য, আমাদের পদচ্যুত করে আমাদের শত্রুদের আমাদের স্থলে বসান। আপনারাও কি তার সঙ্গে আছেন এবং তার এটা সমর্থন করেন?' একদল বলল, 'যেহেতু তাঁর খেয়েই আমরা বাঁচি, তাঁর বদৌলতেই আমাদের পদমর্যাদা ও পদোন্নতি, সেহেতু তিনি যা বলবেন তাই আমরা করব।' কিন্তু বেশীর ভাগ লোক বলল, 'খলীফা যা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ এবং আমাদের মনে হয় না যে ইয়াকুব খলীফাকে অমান্য করবে। তবে এরপরে যদি সে

আবার সরাসরি বিদ্রোহ করে তবে আমরা তাকে সমর্থন করব না এবং যুদ্ধে আমরা খলীফার পক্ষ নিব,' এ দলে খোরাসানের সেনাপতিও ছিল।

ইয়াকুবের প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে এরূপ উক্তি শুনে খলীফা আনন্দিত হলেন। পরদিনই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ইয়াকুবকে বলে পাঠালেন; 'যেহেতু তুমি সরাসরি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ এবং আমার শত্রুর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, তোমার-আমার মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। তোমার সৈন্যসংখ্যা আমার চেয়ে বেশী হলেও আমি এতটুকু ভীত নই। কারণ আল্লাহ্ সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষে থাকেন এবং আমি ন্যায় পথেই আছি। তোমার যে সমস্ত সৈন্য আছে তারা সত্যিকারভাবে আমার পক্ষে যুদ্ধ করবে।' তিনি যুদ্ধের আদেশ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা নিজেরাই তৈরী হয়ে নিল, আর যুদ্ধের দামামাও বেজে উঠল। সৈন্যরা তাঁবু ছেড়ে সামনে গিয়ে কাতার ধরে দাঁড়াল।

ইয়াকুব খলীফার কড়া নির্দেশ পেয়েই বলে উঠল, 'আমি এখন আমার উদ্দেশ্য লাভ করতে চলেছি।' সেও যুদ্ধের আদেশ দিল, যুদ্ধের ঢোল এদিকে-ওদিকে বেজে উঠল। সৈন্যরা কাতার ধরে খলীফার সৈন্যের সামনে এসে দাঁড়াল। একদিকে খলীফা আর অন্যদিকে ইয়াকুব ইবনে লাইস। তখন খলীফা উচ্চকণ্ঠবিশিষ্ট একজনকে দুই দলের মধ্যে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে বললেন, 'হে মুসলমানগণ, আপনারা জেনে নিন যে, ইয়াকুব একজন বিদ্রোহী এবং আব্বাসী বংশকে উচ্ছেদ করতে খলীফার মহদ্দীয়াহ হতে (ফাতিমীদের---ইসমাঈলী---খলীফার উত্তর আফ্রিকাস্থ রাজধানী যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৯১৫ খ্রীঃ; ইয়াকুবের বিদ্রোহ হয়েছিল ৮৭৫ খ্রীঃ) শত্রুকে সেখানে বসানই তার উদ্দেশ্য। সে সুন্নীদের সরিয়ে দিয়ে গোলমাল আরো পাকাতে চায়। আল্লাহ্‌র নবীর খলীফার বিরোধিতা করা মানেই স্বয়ং নবীর বিরোধিতা করা। আর নবীর প্রতি অশ্রদ্ধ হওয়ার অর্থই হোল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস হারান এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা যা আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন (কুরআন ৪ : ৬২), ''আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন, তাঁর নবীকে মান্য কর এবং খলীফার আদেশ পালন কর।'' এ অবস্থায় আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যে দোযখের আগুনে না পুড়ে বেহেশ্‌তে যেতে চান এবং সত্যকে রক্ষা করতে রাযী আছেন ? তাহলে আসুন, আমার সঙ্গে আসুন ; আমার শত্রুর সঙ্গে নয়।'

ইয়াকুব ইবনে লাইসের সৈন্যদের যখন এ কথা বলা হোল, খোরাসানের সেনাপতিরা তখন খলীফার সমীপে এসে বলল, 'আমরা জানতাম যে ইয়াকুব আপনার আদেশ পালন করতে এখানে এসেছে। কিন্তু এখন যখন সে আপনার বিরোধিতা করছে এবং আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, তখন আমরা আপনার সাথে আছি এবং আপনার পক্ষ হয়েই যুদ্ধ করব।'

এভাবে শক্তিশালী হয়ে খলীফা তাঁর সমস্ত সৈন্যকে আক্রমণ করার আদেশ দিলেন। আক্রমণের শুরুতেই ইয়াকুব ইবনে লাইস পরাজিত হয় এবং পরে খুজিস্তানের দিকে পলায়ন করে। তার টাকা-পয়সা, রসদ এবং তাঁবু সবকিছুই লুট হয়ে যায় এবং খলীফার সৈন্যরা লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়েই ধনী হয়ে পড়ল। খুজিস্তানে পৌঁছেই সে চারদিক থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাল। সে তার সেনাপতিদের ডেকে ইরাক এবং খোরাসানের ধনাগার থেকে পুনরায় টাকা-পয়সা এবং রসদ আনার জন্য হুকুম করল।

ইয়াকুব খুজিস্তানে বসবাস করতে শুরু করেছে জানতে পেরে খলীফা দূত মারফত বলে পাঠালেন, 'আমরা জানতাম যে তুমি একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি। তুমি আমাদের বিরোধীদের চক্রান্তে পড়েছ এবং তোমার কৃতকর্মের কি ফল হতে পারে সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা ছিল না। এখন দেখলে ত আল্লাহ্‌র কি মহিমা! তিনি তোমার নিজের সৈন্য দিয়েই তোমাকে পরাজিত করেছেন এবং আমাদের বংশমর্যাদা রক্ষা করেছেন। এটা কিছুই না, শুধু তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে। আশা করি, তুমি এখন ভুল বুঝতে পেরেছ এবং তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করছ। ইরাক এবং খোরাসানের আমীর হবার জন্য তোমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত আর কেউ নেই। তোমার উপরে ওখানে আর কেউ থাকবে না, কারণ কৃতকর্মের জন্যই তুমি আমাদের কাছে অনেক পুরস্কার পাবার উপযুক্ত। তোমার এত সমস্ত গুণাবলী একটিমাত্র ভুলের তুলনায় অনেক বেশী প্রশংসনীয়।' খলীফা মনে করেছিলেন, যেহেতু তিনি ইয়াকুবের সব অবাধ্যতা মাফ করতে রাযী আছেন এবং তার সবকিছু ভুলে যাচ্ছেন, তার উচিত সবকিছু ভুলে আবার ইরাক ও খোরাসানে গিয়ে নব উদ্যমে প্রদেশ দুটোর শাসনভার পরিচালনা করা।

খলীফার চিঠি পড়ে ইয়াকুবের আত্মা এতটুকু বিগলিত হয় নি বা সে কৃতকর্মের জন্য কোন অনুশোচনাও করে নি। সে বরং কাঠের ট্রেতে

করে কতকগুলো শাক, পেঁয়াজ এবং মাছ এনে তার সামনে রাখতে হুকুম করল। সে তখন খলীফার দূতকে ডেকে এনে সামনে বসাল এবং তাকে বলল, 'যাও তোমার খলীফাকে গিয়ে বল যে আমি একজন জন্মগত তাম্রকার এবং এ-শাস্ত্র আমি আমার পিতার কাছেই শিখেছি। আমার খাদ্য ছিল যবের রুটি, মাছ, পেঁয়াজ ও শাক। আমার যে সার্বভৌমত্ব, সম্পদ এবং সঞ্চয় আছে তা আমি নিজের চেষ্টায়ই করেছি, এটা আমি আমার পিতার থেকেও পাই নি বা খলিফার থেকেও পাই নি। যতদিন না আমি তার শির মহদ্দীয়াহ্‌তে পাঠাতে পারব এবং তার বংশকে ধ্বংস করতে পারব, ততদিন আমি শান্তি পাব না। হয় আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করব নতুবা আমি আমার যব-রুটি, মাছ ও শাকের জীবনে ফিরে যাব। মনে রাখবেন, আমি আমার সঞ্চয়াগার খুলে দিয়েছি এবং সৈন্যদেরকেও জানিয়ে দিয়েছি এবং আমি তাঁর দূতের পিছু পিছুই আসছি।' সে দূতকে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিল। খলীফা আবার অনেকগুলো দূতকে চিঠি দিয়ে পাঠালেন কিন্তু ইয়াকুব কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করতে রাযী হোল না। সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করে সে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হোল, কিন্তু তিন মনযিল যেতেই তার ভীষণ শূলবেদনা আরম্ভ হয় এবং এটা এমন চরম আকার ধারণ করে যে সে বুঝতে পারে যে, এ যাত্রায় তার মুক্তি নাই। সে তার ভাই আমর ইবনে লাইসকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তার হাতে ধনাগারের ভার অর্পণ করে এবং তারপর মারা যায়।

আমর ইবনে লাইস কোহিস্তানে ফিরে কিছুদিন থাকার পর খোরাসানে চলে যায় এবং সেখানে গিয়েই খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে রাজপদ থেকে পদত্যাগ করে। জনসাধারণ ইয়াকুবের চেয়ে আমরকে বেশী পছন্দ করত, কারণ সে ছিল উদারচেতা, দয়ালু, শিক্ষিত এবং মোটামুটি একজন রাজনীতিজ্ঞ। তার মনুষ্যত্ববোধ এবং উদারতাবোধ ছিল অসাধারণ।

যাই হোক, খলীফা আমর সম্বন্ধে ভীতিগ্রস্ত হয়েই চললেন, কারণ পিছে সে আবার তার ভাইয়ের পন্থা অবলম্বন করে—যদিও আমরের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মাঝে মাঝে গোপনে খলীফা বোখারাতে ইসমাঈল ইবনে আহ্‌মদের কাছে দূত মারফত বলে পাঠাতেন, 'আমর ইবনে লাইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর এবং তার কবল থেকে রাজ্য কেড়ে লও। খোরাসান এবং ইরাক শাসন করার অধিকার তোমার বেশী, কারণ

এগুলো তোমার পূর্বপুরুষদের রাজত্ব ছিল এবং "সাফরীরা" জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। প্রথমতঃ তোমার অধিকার আছে, দ্বিতীয়তঃ তোমার আচরণ অধিক গ্রহণীয় এবং তৃতীয়তঃ আমার আশীর্বাদ তোমার পিছে আছে। এগুলোর ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস যে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমরের বিরুদ্ধে তোমার সহায় হবেন। তোমার কত সৈন্য ও রসদ আছে সেকথা চিন্তা করো না, দেখ আল্লাহ্ কোরআনে কি বলেছেন : অনেক ক্ষুদ্র দলও আল্লাহ্‌র রহমতে অনেক বড় দলকে পরাজিত করে গেছে। আল্লাহ্ স্থির-সংকল্প ব্যক্তির সাথেই থাকেন (কোরআন ২ : ২৫০)।'

(১৬) খলীফার উপদেশে ইসমাইল বেশ বিগলিত হয়ে গেল। সে আমর ইবনে লাইসের বিরোধিতা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোল। সে সাধ্যমত সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করে অক্সাস আমুদরিয়া নদীর দক্ষিণ দিক অতিক্রম করল এবং তারপর সৈন্যদের গণনা করে দেখল। মোট সংখ্যা ছিল ২,০০০ অশ্বারোহী, তার মধ্যে প্রতি দু'জনে একটি করে ঢাল, প্রতি ২০ জনে একটি করে সাঁজোয়া এবং প্রতি ৫০ জনে একটি করে বল্লম। তাছাড়া অনেকে ছিল যারা ঘোড়ার অভাবে নিজেরাই তাদের সাঁজোয়া চামড়ার পেটি দিয়ে পিঠে বেঁধে বহন করছিল। তখন সে আমুই (আমাল) থেকে রওয়ানা হয়ে মার্ভ নগরীতে এসে পেঁৗছল।

(১৭) আমর ইবনে লাইসকে জানান হোল যে, ইসমাইল ইবনে আহমদ অক্সাস পার হয়ে মার্ভ নগরীতে এসে পেঁৗছেছে এবং সেখানকার শাসনকর্তা পালিয়ে গেছে। ইসমাইল এখন প্রদেশটি দখল করার কথা চিন্তা করছে। আমর ইবনে লাইস নিশাপুরে ছিল। খবর শুনে সে রেগে উঠল। সে তখন ৭০,০০০ অশ্বারোহীকে অস্ত্রশস্ত্র এবং পূর্ণ রসদ দিয়ে পাঠিয়ে দিল এবং নিজে বলখের দিকে রওয়ানা হোল। দুই পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ বেধে গেল। বলখেই আমর ইবনে লাইস পরাজিত হোল এবং তার ৭০,০০০ অশ্বারোহীই পালিয়ে গেল। তার মধ্যে কেউ আহত হয়নি বা কাউকে বন্দী করা হয়নি। শুধুমাত্র আমরকেই বন্দী করা হয়েছিল। আমরকে ইসমাইলের সামনে আনা হলে সে তাকে তার প্রহরীদের হাতে ছেড়ে দিতে হুকুম করল। আর এটা ছিল দুনিয়ায় অনেক আশ্চর্যের একটি।

(১৮) জোহরের নামাযের পর দেখা গেল যে, আমর ইবনে লাইসের একটি সহিস তাঁবুর মধ্যে ঘুরাঘুরি করছে। সে আমরকে দেখে মর্মাহত হোল এবং তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। আমর তাকে বলল, 'আজ

রাত্রে আমার সাথে থাক কারণ সম্পূর্ণ একা আছি। মানুষ যতদিন বেঁচে আছে, খাবার তার লাগবেই। তাই কিছু খাবারের বন্দোবস্ত কর।' সহিস তখন যোদ্ধাদের কাছ থেকে সের খানেক মাংস এবং গরম করার একটা লোহার কড়াই যোগাড় করল। তারপর সে এদিক-ওদিক থেকে কিছু শুকনা গোবর আনল এবং মাংসগুলো শুকনা করে ভাজবার জন্য কতকগুলো মাটির খণ্ড একত্র করল। মাংসগুলো কড়াইয়ে চড়িয়ে দিয়ে সে কিছু লবণ আনতে গেল। সন্ধ্যা তখন প্রায় ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় একটা কুকুর এসে কড়াইতে মুখ লাগিয়ে মাংস থেকে এক খণ্ড হাড় তুলে নিল। এতে কুকুরের মুখ পুড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখ তুলতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়াইয়ের আংটা তার গলায় আটকে গেল। কিন্তু আগুনের তাপ পেয়ে কুকুরটা লাফ মেরে উঠল এবং কড়াইটা শুদ্ধ পালিয়ে গেল। আমর ইবনে লাইস এই সব দেখে সৈন্যদের এবং প্রহরীদের দিকে ফিরে বলল, 'সাবধান হও, আমিই সেই লোক যার রান্না-ঘরের সরঞ্জাম বইতে সকালে চার হাজার উটের দরকার হয়েছিল। আর বিকেলেই একটা কুকুর তা নিয়ে চলে গেল। আমি সকালে ছিলাম একজন আমীর আর বিকেলে হলাম একজন আসীর (কয়েদী)। আর এটাও দুনিয়ার একটা আশ্চর্য।'

(১৯) আমীর ইসমাইল ও আমর ইবনে লাইস সংক্রান্ত এই দু'টি ঘটনা ছাড়া আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। আমর বন্দী হবার পর আমীর ইসমাইল তার পারিষদবর্গ ও সেনাপতিদের সম্বোধন করে বলল, 'আল্লাহ্‌র রহমতেই আমি কৃতকার্য হয়েছি এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে আমি কৃতজ্ঞ নই।' তারপর সে বলল, 'আমর ইবনে লাইসের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল এবং সে বড় উদারচেতা লোক ছিল। তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই ছিল এবং তার সরঞ্জামাদিও ছিল প্রচুর। তাছাড়া সে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ছিল। কার্যনির্বাহে সে সদাসর্বদা সতর্ক ছিল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সে ছিল খুব উদার। আমি মনে করি সে যেন কোন কষ্ট না পায় এবং তাকে আমার আয়ত্ত থেকে মুক্ত করে দেওয়া দরকার।' পাত্র-পারিষদরা বলল, 'আমীরের যুক্তিই সর্বোত্তম এবং তাঁর উপদেশানুসারে আদেশ করা হোক।' আমীর তখন একজনকে আমর ইবনে লাইসের কাছে বলে পাঠাল, 'ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবার উদ্দেশ্যেই খলীফার কাছে লোক পাঠাচ্ছি। তোমার যাতে মারাত্মক কোন ক্ষতি না হয় এবং বাকী জীবনটা যাতে নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পার সেজন্য আমি এমন কি আমার সমস্ত অর্থশালাও শূন্য করতে রাযি আছি।'

(২০) এ-কথা শুনে আমর ইবনে লাইস বলল, 'আমি জানি যে এ বন্ধন থেকে আমি কখনও মুক্তি পাব না কিন্তু তবুও ইসমাইলের কাছে অনুরোধ করছি যেন একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে দেয় কারণ আমার কিছু বক্তব্য আছে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি যেন আমি যা বলব তা হুবহু তোমাদের কাছে পেশ করে।' লোকটা ফিরে এসে ইসমাইলকে সব খুলে বলল। ইসমাইল সঙ্গে সঙ্গেই একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে দিল। আমর তাকে বলল, 'ইসমাইলকে বল যে আমি তার কাছে পরাজিত হইনি; আমি পরাজিত হয়েছি তার ধর্মপরায়ণতা, বিশ্বাস ও চরিত্রবল এবং সর্বোপরি খলীফার অসন্তুষ্টির কাছে। আল্লাহ্ এ রাজ্য আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে দিয়েছে, কারণ সে তার সদ্‌গুণের জন্য আমার চেয়ে বেশী উপযুক্ত ও যোগ্য। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি এবং তাঁর মঙ্গল ছাড়া কিছুই চাই না। এরি মধ্যে সে একটা নতুন রাজ্য দখল করে নিয়েছে কিন্তু তার তেমন কোন সম্পদ বা শক্তি নাই। আমার ও আমার ভাইয়ের অনেক সম্পদ এবং মাটির নীচে রাখা গচ্ছিত ধন আছে যার তালিকা এখন আমার কাছে আছে। ঐগুলো সবই আমি তাকে দিয়ে দিচ্ছি যাতে সে ক্ষমতা ও সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে। তার এখন সরবরাহ ও খাদ্য ভাণ্ডার ঠিক করে সঞ্চয়টা পূরণ করা উচিত।' এই বলে সে সঞ্চয় তালিকা বের করে ইসমাইলকে দেবার জন্য সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে দিল।

(২১) বিশ্বস্ত লোকটি এসে যখন সব কিছু খুলে বলল এবং সঞ্চয় তালিকাটা ইসমাইলের সামনে রাখল, সে (ইসমাইল) তখন পারিষদদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই আমর ইবনে লাইস এত চালাক যে সে মনে করে আমাদের ধূর্ত চক্ষুকে সে ফাঁকি দিতে পারে এবং সে আমাদের চিরন্তন ধ্বংসের ফাঁদে ফেলতে চায়।' সে সঞ্চয় তালিকাটি তুলে নিল এবং সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তির সামনে এই বলে ছুঁড়ে ফেলে দিল 'তার কাছে এই সঞ্চয় তালিকা ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ে তাকে বল, 'তুমি মনে কর যে তোমার ছল দ্বারা তুমি সবকিছু থেকেই রেহাই পেতে পার। তোমার এবং তোমার ভাইয়ের কাছে সঞ্চয় থাকা স্বাভাবিক, কারণ তোমার পিতা ছিল একজন তাম্রকার আর সে তোমাদের ঐ ব্যবসাই শিখিয়েছে। কোন স্বর্গীয় সুযোগে তুমি রাজ্য দখল করে নিয়েছিলে এবং উদ্দামহীন প্রচেষ্টার ফলে উন্নতি করেছ। এই সম্পদ এবং ইহার দিরহাম ও দীনার তুমি অবৈধ জুলুম করে লোকের থেকে আদায় করেছ, এই সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে বৃদ্ধ

পুরুষ ও বিধবা মেয়েলোকের হাতে-কাটা সুতার মূল্য থেকে, আগন্তুক ও পথিকদের খাদ্যসংগ্রহ থেকে এবং দুর্বল ও এতিমদের সম্পদ থেকে। পরকালে আল্লাহ্র কাছে তোমাকে এর জবাবদিহি করতে হবে, তাই তুমি তাড়াতাড়ি অন্যায়ের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছ যাতে মহাবিচারের দিন ঋণদাতারা তোমাকে আঁকড়ে ধরে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে চাইলে তুমি বলবে, "আমরা যা-কিছু নিয়েছিলাম সবই ইসমাইলকে দিয়ে দিয়েছি এবং তার থেকে নিয়ে নাও।" তুমি সবই আমার কাছে হস্তান্তর করবে আর আমি ঋণদাতাদের জবাব দিতে এবং আল্লাহ্র ক্রোধ এবং প্রশ্নোত্তর দিতে অক্ষম হয়ে যাব।' যাই হোক, তার কর্তব্যবোধ এবং ধর্মভীরুতা এরূপ ছিল যে, সে সম্পদ তালিকা ত রাখেই নাই বরং তা আমরকে ফেরত দিয়ে দিয়েছে। তাই সে পার্থিব সম্পদে প্রতারিত হয়নি।

(২২) ইহা কি বর্তমান আমীরদের মধ্যে পাওয়া যাবে না, যারা অসৎ উপায়ে অর্জিত এক দীনারের জন্য দশটি অন্যায়কে উপেক্ষা করার কথা চিন্তা করে? তারা সত্যকে বিকৃত করে এবং ফলাফলের উপর তাদের কোন শ্রদ্ধাই নাই।

(২৩) ইসমাইল ইবনে আহমদের সময় প্রচলিত রীতি ছিল যে, যখন ভীষণ ঠাণ্ডা অনুভূত হোত এবং ভীষণ বরফ পড়ত তখন আমীর ঘোড়ায় চড়ে নিজেই সদরের (বোখারা) দিকে যেয়ে সেখানে জোহরের নামাজের ওয়াক্ত পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতেন। তিনি বলতেন, 'হয়ত কোন ব্যক্তি নালিশ নিয়ে আদালতে আসতে পারে কিন্তু তার খরচের টাকা না থাকতে পারে বা থাকার জায়গা না থাকতে পারে। আমরা যদি শীত এবং বরফের অজুহাতে হাযির না থাকি তবে তাদের পক্ষে হাযির থেকে আমাদের কাছে আসা খুব কঠিন হবে। যদি সে জানে যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে এখানে আসবে, তার কাজ সমাধা করবে এবং শান্তিতে ঘরে ফিরে যাবে।'

এই ধরনের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শুধুমাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হোল। পরকালে প্রশ্নোত্তরের জন্যই এতসব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব আদায়কারী এবং মন্ত্রীদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে

(১) রাজস্ব আদায়কারীদের যখন কোন রাজস্ব সম্বন্ধীয় জেলার ভার অর্পণ করা হয় তখন তাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত, তারা যেন কিছুতেই তাদের অধীনস্থ লোকদের সংগে খারাপ ব্যবহার না করে এবং শুধু পাওনা রাজস্বটাই যেন আদায় করে। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ের সময় তারা যেন সর্বদা ভদ্রতা ও শিষ্টাচার মেনে চলে এবং যতদিন পর্যন্ত কৃষকদের রাজস্ব দেবার উপযুক্ত সময় না আসে ততদিন তাদের কাছে রাজস্ব চাওয়া উচিত নয়। কারণ রাজস্ব আদায়কারীরা উপযুক্ত সময়ের পূর্বে রাজস্ব চাইলে বিপদটা আসে কৃষকদের উপরই। এমন কি, তখন তারা রাজস্ব দিবার জন্য নিজেদের ফসল (উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করলে যা পেত তার) অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তার ফলে তারা সঙ্কটাবস্থায় পতিত হয় এবং দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কৃষকরা যদি অসহায় অবস্থায় পড়ে এবং তাদের যদি গরু অথবা বীজ কেনার প্রয়োজন হয়, তবে তাদেরকে ঋণ দিয়ে তাদের বিপদের বোঝা কমিয়ে স্বাচছন্দ্যে রাখা উচিত—যাতে তাদের পরে দেশ ছেড়ে চলে যেতে না হয়।

(২) আমি শুনেছিলাম যে, কোবাদ বাদশাহ্‌র সময়ে একবার সাত বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ লেগে ছিল এবং আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (বৃষ্টি হোত না)। বাদশাহ্ তখন রাজস্ব আদায়কারীদের শস্য বীজ বেচে দেবার হুকুম করলেন। এবং কিছু অংশ, এমন কি, দান করেও দিতে বললেন। রাজ্যের সব গরীব লোকদের কেন্দ্রীয় সম্পদাগার ও স্থানীয় সম্পদাগার থেকে সাহায্য করা হয়েছিল তার ফলে ঐ সাত বছরে একটি লোকও মারা যায়নি। এই কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল যে, বাদশাহ্ তাঁর অফিসারদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

(৩) রাজস্ব আদায়কারীদের কীর্তিকলাপ সর্বদাই তদন্ত করা উচিত। যদি সে উপরিউক্তভাবে তার কাজ করে তবে রাজস্ব-জেলাটা তার হাতে রাখা চলে কিন্তু যদি তা না করে, তবে তাকে বদল করে একটা উপযুক্ত লোক দেওয়া উচিত। যদি সে কৃষকদের থেকে প্রাপ্যের চেয়েও বেশী নিয়ে থাকে তবে তার কাছ্ থেকে সেটা আদায় করে কৃষকদের ফিরিয়ে

দেওয়া উচিত। তারপরেও যদি তার কোন সম্পত্তি থাকে তবে তা ছিনিয়ে এনে সরকারী সম্পদাগারে রাখা উচিত। কর্মচারীটিকে বরখাস্ত করা উচিত এবং কোনদিনই তাকে পুনরায় চাকরিতে নেওয়া উচিত নয়। এতে অন্যেরা সাবধান হয়ে যাবে এবং অবৈধ জুলুম করা ছেড়ে দেবে।

(৪) মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ করে উজিরদের কার্যকলাপও গোপনে তদন্ত করে দেখা উচিত যে, সে তার কার্যনির্বাহ ঠিক ঠিকভাবে করেছে কিনা। কারণ রাজ্যের ভাল-মন্দ তাদের উপর নির্ভর করে। উজির যখন চরিত্রবান এবং নির্ভীক বিচারক রাজ্যের উন্নতি তখন নিশ্চিত, সৈনিক ও কৃষক সম্প্রদায় তখন উৎফুল্ল, শান্তি এবং সরবরাহ বিরাজমান এবং বাদশাহ্ তখন চিন্তামুক্ত। কিন্তু উজির খারাপ হলে রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বাদশাহ্ হয়ে যান হতবুদ্ধি আর প্রদেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে।

বাহ্‌রাম গুর ও রাস্তরাভিশনের গল্প

(৫) কথিত আছে যে, বাহ্‌রাম গুরের একজন উজির ছিল যাকে লোকে রাস্ত রাভিশন (ভাল ব্যবহার) বলতো। বাহরাম গুর সমস্ত রাজ্যের ভার তার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার উপর খুব আস্থাশীল ছিলেন। তিনি তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বিশ্বাস করতেন না। বাহ্‌রাম নিজে দিন-রাত আমোদ ফূর্তি, শিকার ও মদ নিয়ে পড়ে থাকতেন। রাস্ত রাভিশন কোন একজন লোককে—যাকে সাধারণতঃ বাহ্‌রাম গুরের সহচর বলা হোত, বলল, 'কৃষক সম্প্রদায় আমাদের অবিচারের জন্য অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তাদেরকে শাস্তি দিয়ে সংশোধন না করলে একটা দুর্যোগ দেখা দিবে। বাদশাহ্ মদ নিয়ে ব্যস্ত এবং প্রজাদের দিকে তার কোন খেয়াল নাই। একটা-কিছু দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই তাদের শাসন করা উচিত। তবে জেনে রাখ, শাস্তির দ্বারা সংশোধনের দুটো দিক আছে—অসৎ দিকটা থেকে দূরে থাকা আর ভাল জিনিসটা ছেঁটে ফেলে দেওয়া। আমি যাদের গ্রেফতার করতে বলি তাদের ধরে ফেল।' বাহ্‌রাম গুরের সহচর কর্তৃক যে কয়জনকে ধরে জেলে দেওয়া হয়েছিল রাস্ত রাভিশন প্রত্যেকের থেকে কিছু ঘুষ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য 'সহচরকে' বলে দিল। এইভাবে চলতে থাকল যতদিন না দেশের সমস্ত সম্পদ সেটা বাড়ী ইহোক, উদ্‌পিরা বালক ভৃত্যই হোক, সুন্দরী মেয়েই হোক, ভূ-সম্পত্তিই

হোক আর কল-কারখানাই হোক তার হাতে চলে গেল। কৃষক সম্প্রদায় গরীব হয়ে গেল, পদমর্যাদা দেশ থেকে বিদায় নিল আর রাজস্বশালায়ও কিছুই জমা রইলো না।

(৬) এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর বাহ্‌রামের বিরুদ্ধে একজন শত্রু মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। বাহ্‌রাম তাঁর সৈন্যদের টাকা পয়সা এবং রসদ দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। তাই তিনি ধনাগারে গেলেন। কিন্তু তিনি সেখানে কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং নগরাধ্যক্ষের কাছে খোঁজ খবর নিলেন। সকলে বলল, 'কয়েক বছর হোল অমুক অমুক লোক দেশ ত্যাগ করে অমুক অমুক দেশে চলে গেছে।' তিনি জানতে চাইলেন, 'কেন?' তারা উত্তর দিল, 'আমরা কিছুই জানি না।' উজিরের ভয়ে কেউ কিছু বলল না। সারাদিন সারারাত বাহ্‌রাম গুর চিন্তা করলেন কিন্তু তবু বুঝতে পারলেন না অসুবিধার কি কারণ থাকতে পারে। পরের দিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে একাই মরুভূমির দিকে রওয়ানা হলেন। চিন্তা করতে করতে তিনি সারাদিন পথ চললেন। এত চিন্তামগ্ন ছিলেন যে, তিনি জানতেও পারলেন না যে সাত ফারলং রাস্তা অতিক্রম করেছেন। গরমের মাত্রা বেশী ছিল তাই তাঁর পিপাসা লেগে গেল। তিনি চারদিকে তাকিয়ে কোন এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে বললেন, 'নিশ্চয়ই ওখানে মানুষ আছে।' তিনি ধোঁয়া লক্ষ্য করে চলতে লাগলেন। নিকটে পোঁছে দেখলেন এক পাল ভেড়া ঘুমাচ্ছে, একটা তাঁবু খাটানো হয়েছে এবং একটা কুকুরকে ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বাহ্‌রাম দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং তাঁবুর নিকটে গেলেন। একটি লোক এসে তাঁকে সম্বোধন করল এবং তার সাহায্যে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে কিছু খাবার পেলেন। লোকটা কিন্তু জানত না যে আগন্তুকটি বাহ্‌রাম। বাহ্‌রাম বললেন, 'রুটি খাওয়া শুরু করার পূর্বে প্রথমেই আমি জানতে চাই যে, এই কুকুরটির কি হয়েছে।'

(৭) অল্পবয়স্ক লোকটি বলল, 'কুকুরটি আমার এই ভেড়াগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে কুকুরটি এত চালাক যে সে দশটি নেকড়ে বাঘেরও মোকাবেলা করতে পারে এবং কোন নেকড়ে বাঘই তার ভয়ে ভেড়াগুলোর কাছ দিয়ে ঘুরাঘুরি করবে না। অনেকবার আমি কাজে শহরে চলে গেছি এবং পরের দিন ফিরেছি। কুকুরটি ভেড়াগুলোকে মাঠে চড়াতে নিয়ে যেত এবং নিরাপদে ফিরে নিয়ে আসত। একদিন

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর আমি ভেড়াগুলোকে গুণে দেখি কয়েকটা কম। এখানে কিন্তু কোন চোর আসে না। আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে কি করে ভেড়ার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমার ভেড়ার পালের সংখ্যা এমনভাবে কমতে থাকল যে, যখন যাকাত আদায়কারী এসে আমার কাছে আমার পুরা ভেড়ার পালের জন্য পুরো যাকাত চাইল, তখন অবশিষ্ট ভেড়াগুলো দিয়ে তা শোধ করতে হয়েছে। সেইজন্য এখন আমি সেই আদায়কারীর পক্ষে এখানে মেষ পালকের কাজ করছি।'

(৮) 'এখন কুকরটি একটি নেকড়ে বাঘীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার সঙ্গে সহবাস করেছে। আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞ এবং অসাবধান ছিলাম। একদিন আমি জ্বালানী কাঠের খোঁজে মাঠে যাই। কিন্তু আমি যখন একটা পাহাড়ের পেছন দিয়ে ফিরছিলাম তখন দেখি যে একপাল ভেড়া ঘাস খাচ্ছে আর একটা নেকড়ে বাঘ তাদের দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে। আমি একটা ঝোপের আড়ালে বসে গোপনে লক্ষ্য করতে থাকলাম। কুকুরটি নেকড়ে বাঘটিকে দেখে তার কাছে গেল এবং লেজ নাড়তে লাগল। নেকড়ে বাঘ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কুকুরটি তখন তার উপরে উঠল, সঙ্গম করল। তারপর সে এক পার্শ্বে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নেকড়ে বাঘটি তখন ভেড়ার পালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সে একটা ভেড়াকে টেনে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। কুকুরটা একটু শব্দও করল না। নেকড়ে বাঘ এবং কুকুরের এই কীর্তি আমি যখন দেখলাম, তখন আমি বুঝলাম এবং জানতে পারলাম যে আমার এই সম্পদ ধ্বংসের কারণ কুকুরটির স্বেচ্ছাচারিতা।'

(৯) এই গল্প শুনে বাহ্‌রাম গুর অবাক হয়ে গেলেন। ফিরবার পথে তিনি শুধু এই চিন্তাই করতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর মনে হল, 'প্রজারাই আমাদের ভেড়ার পাল আর তত্ত্বাবধায়ক হোল উজির। আমার মনে হচ্ছে যে দেশটা এবং জনগণ এখন ছন্নছাড়া এবং জর্জরিত এবং আমি যখন তাদেরকে প্রশ্ন করি তারা সত্যকে গোপন করে রাখে। আমার এখন উজির এবং জনগণের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান তা তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন।'

(১০) তিনি ফিরে এসে প্রথমেই দৈনিক কয়েদীদের তালিকা চেয়ে পাঠালেন। প্রথম থেকে শেষ অবধি শুধু রাস্ত রাভিশনের কুকীর্তিই দেখতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, রাস্ত লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে এবং তাদের উপর অত্যাচার করেছে। তিনি বললেন, 'এটা

ও রাস্ত রাভিশন (সৎ ব্যবহার) নয় .বরং মিথ্যা অন্ধকার, ডাহা জুয়াচুরি।' তখন তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের মূল্যবান প্রবাদটি পুনরাবৃত্তি করলেন 'যে ব্যক্তি সুনামের দ্বারা প্রত্যারিত হয় সে হারায় তার জীবিকা আর যে সুনামকে ব্যবহার করে প্রতারণা করার জন্য, সে হারায় তার জীবন।' 'যতদিন আমি উজিরের ক্ষমতাই শুধু বাড়িয়েছি এবং যতদিন জনসাধারণ তার এই মহিমান্বিত ও মর্যাদাব্যঞ্জক রূপ দেখবে ততদিন তার ভয়ে সত্য কথা বলবে না। আমার ইচ্ছা, আগামী কল্য যখন সে আদালতে আসবে, আমি তাকে পারিষদদের সামনে অপমান করব। আমি তাকে গ্রেফতার করব এবং তার পায়ে ভারী শিকল বাঁধার আদেশ দিব। তখন প্রত্যেক আসামীকে তার সামনে ডেকে এনে তাদেরকে যার যার বক্তব্য পেশ করতে বলব। আমি এই বলে একটা আদেশ জারী করে দিব, আমরা রাস্ত রাভিশনকে তার উজিরি পদ থেকে বরখাস্ত করেছি এবং তাকে কয়েদ করার হুকুম দিয়েছি। আমরা তাকে পুনরায় আর কর্মে বহাল করব না। যদি তার থেকে কোন লোক কোন অবিচার পেয়ে থাকে এবং তার বিরুদ্ধে কোন দাবী থেকে থাকে তবে তার নিজের আমাদের তা জ্ঞাত করা উচিত— যাতে তার প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারি। এই কথা লোকে শুনলে তারা নিজেরাই বলে দিবে যে সত্যিকার ভাবে কি অবস্থা বিদ্যমান। সে যদি জনগণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে থাকে, ও কোন অবৈধ যুলুম করে না থাকে এবং লোকে যদি তাকে ভাল বলে তবে আমরা তার প্রতি সহায়ক হব এবং তাকে তার পদে আবার বহাল করব। কিন্তু যদি তার ব্যবহার অন্যরূপ হয়ে থাকে, তবে আমরা তাকে শাস্তি দেব।'

(১১) পরের দিন যখন বাহ্‌রাম গুর তাঁর পাত্র-পারিষদ এবং উজিরকে নিয়ে যথারীতি দরবারে বসেছেন তখন বাহ্‌রাম উজিরের দিকে ফিরে বললেন, 'রাজ্যে তুমি এ কি অনাসৃষ্টি করেছ ? তুমি সৈন্যদের সরবরাহ বজায় রাখতে পারনি এবং কৃষকদের ধ্বংস করে দিয়েছ। আমরা চেয়েছিলাম, তুমি সবসময় জনগণের খোরাক যোগাড় করে দাও যাতে দেশ আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে যেতে পারে আর কৃষকদের কাছ থেকে পাওনার চেয়ে বেশী খাজনা নেবে না। তোমার উচিত ছিল ধনাগারকে সরবরাহ দিয়ে পূণ করে রাখা। কিন্তু দেখা যাচেছ, ধনাগার খালি, সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল এবং কৃষকরা ঘরছাড়া। তুমি ভাবতে পার যে, আমি মদ ও শিকার নিয়েই আছি তাই রাজ্য শাসন ব্যাপারে মাথা ঘামাই না এবং জনগণের অবস্থার দিকেও তাকাই না।' বাহ্‌রাম রাস্ত রাভিশনকে অতি অসম্মানের

সঙ্গে পদচ্যুত করে তাকে একটা বাড়ীতে আটক রাখার হুকুম করলেন। তার পায়ে ভারী শৃঙ্খল পরান হোল এবং রাজপ্রাসাদের দ্বারে ঘোষণা করে দেওয়া হোল, 'বাদশাহ্ রাস্ত রাভিশনকে পদচ্যুত করেছেন। তার প্রতি এত রাগান্বিত যে তাকে আর বহাল করা হবে না। যদি কেউ তার থেকে কোন আঘাত পেয়ে থাকে এবং তার যদি কোন নালিশ থেকে থাকে, তবে সে নিরাপদে দরবারে এসে তার বক্তব্য পেশ করতে পারে যাতে বাদশাহ্ তার প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারেন'। তক্ষণই বাহ্রাম জেলখানার দ্বার খুলে দিয়ে কয়েদীদের তাঁর সামনে হাযির করতে হুকুম করলেন। তিনি এক একজন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কারণে তোমাকে জেলে আনা হয়েছিল?'

(১২) একজন উত্তর দিল: আমার এক ভাই খুব ধনী ছিল; তার অনেক টাকা পয়সা ও সম্পত্তি ছিল। রাস্ত রাভিশন তাকে গ্রেফতার করে তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেয় এবং পরে তাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলে। লোকে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল কেন সে লোকটাকে মেরে ফেলল। সে জবাব দিয়েছিল, 'তার বাদশাহ্র শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে।' তাই সে আমাকে জেলে পুরেছে যাতে আমি বাদশাহ্র কাছে নালিশ না করতে পারি এবং বিষয়টা গোপন থেকে যায়।

(১৩) অন্য একজন বলল: আমি আমার পিতার থেকে উত্তরাধিকার বলে একটি মনোরম ও উন্নতিশীল বাগান পেয়েছিলাম। এর পার্শ্বেই রাস্ত রাভিশনের একটি ভূ-সম্পত্তি ছিল। একদিন সে আমার বাগানে আসলে তার খুব পছন্দ হোল এবং সে এটা কিনতে চাইল। কিন্তু আমি বিক্রি করতে রাযী হইনি। তাই সে আমাকে গ্রেফতার করে এই বলে জেলে দিল যে, 'তুমি অমুক লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ এবং এটা পরিষ্কার যে তুমি অন্যায় করেছ। তাই এই বাগানটা ছেড়ে দাও এবং এই বলে একটা দলীল করে দাও যে তুমি বাগানটা ছেড়ে দিয়েছো; এতে তোমার কোন দাবী নাই এবং রাস্ত রাভিশনের এটা সৎ ভাবে অর্জিত সম্পত্তি।' যেহেতু আমি এইরূপ দলীল দিতে অস্বীকার করি তাই আজ পাঁচ বছর ধরে আমি জেলে আছি।

(১৪) অপর একজন বলল: আমি একজন ব্যবসায়ী, তাই আমার মাঝে মাঝে স্থলে ও সমুদ্রে সফরে যেতে হয়। আমার মূলধন খুব কম। এক বন্দর থেকে পছন্দমত জিনিস কিনে অন্য বন্দরে নিয়ে বিক্রি করি আর আমি অল্প লাভেই সন্তুষ্ট। ঘটনাক্রমে আমার একটা মুক্তার হার ছিল।

এই নগরে যখন আমি ওটা বিক্রি করার জন্য আসি, খবরটা তখন উজিরের কাছে যায়। সে তখন একজনকে পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নেয় এবং উজির আমার থেকে ঐ হারটি কিনতে চায়। কিন্তু আমাকে কোন পয়সা না দিয়েই সে ওটাকে ধনাগারে পাঠিয়ে দেয়। আমি কয়েকদিন তার কাছে যেতে থাকি। কিন্তু সে আমাকে উহার দামও দেয়নি আমার হারটিও ফেরত দেয়নি। আমি তারপর আর অপেক্ষা করতে পারি নাই, কারণ আমি অভাবগ্রস্ত ছিলাম। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হারটা আপনার পছন্দ হলে আমাকে দাম দিয়ে দিতে আদেশ করুন নতুবা আমাকে ওটা ফেরত দিন, কারণ আমি নিঃস্ব।' তখন সে কোন উত্তর দেয়নি। কিন্তু আমি আমার তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি যে চারজন সিপাহীসহ একজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাঁবুতে ঢুকে আমাকে বলল, ''আমাদের সঙ্গে এস, উজির তোমাকে ডাকছে।'' আমি সানন্দে বলে উঠলাম, ''তিনি হয়ত আমাকে আমার হারের দাম দিবেন।'' আমি হাষ্ট হয়ে সিপাহীদের সঙ্গে চললাম। তারা আমাকে জেলের দরজার সামনে নিয়ে জেলওয়ালাকে বলল, 'আদেশ রইল, লোকটাকে জেলে পুরে তার পায়ে ভারী শিকল পরিয়ে দাও।' তারপর দেড় বছর হোল, আমি জেলের শৃঋলে বাঁধা পড়ে আছি।

(১৫) অন্য একজন বলল : আমি অমুক জেলার কর্তা। আমার বাড়ীতে সর্বদাই অতিথি, পথচারী এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাগম হোত। আমি সব সময়েই দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করতাম এবং সর্বদাই আমি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের দান খয়রাত ও ভিক্ষা দিতাম আর এই স্বভাবটা আমি আমার পূর্বপুরুষদের থেকেই পেয়েছিলাম। আমার পৈতৃক সম্পত্তির যে আয় ছিল তার সবটাই আমি অতিথিসেবায়, দানশীলতায় এবং উদারতায় খরচ করতাম। আমি গুপ্ত সম্পদের সন্ধান জানি, এই অজুহাতে বাদশাহ্‌র উজির আমাকে বন্দী করে জেলে নিল এবং আমার প্রতি অনুসন্ধান চালাল ও অত্যাচার করল। আমার যে বিষয়-সম্পত্তি ও ক্ষেত-খামার ছিল তা অর্ধেক দামে বিক্রি করে তাকে দিতে হোল। এই চার বছর যাবৎ আমি জেলের মধ্যে আছি এবং আমার এখন একটা দিরহামও নাই।

(১৬) আরেকজন বলল : আমি অমুক সর্দারের ছেলে। বাদশাহ্‌র উজির আমার পিতাকে অর্থ জরিমানা করে এবং তাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করে মেরে ফেলে। তারপর আমাকে জেলে নেয় এবং এই সাত বছর যাবৎ আমি জেলের মধ্যে পড়ে আছি।

(১৭) পরের জন বলল : আমি একজন সেনাবাহিনীর লোক। অনেক বছর ধরে বাদশাহ্‌র পিতার খেদমত করেছি এবং তাঁর সঙ্গে সামরিক অভিযানে গিয়েছি। তাছাড়া অনেক বছর ধরে আপনারও গোলামি করছি। আমি সরকার থেকে সামান্য বেতন পাই। গত বছর কোন টাকা পাইনি তাই এ বছর উজিরের কাছে দরখাস্ত করে বললাম, "আমার সংসার আছে কিন্তু গত বছর আমাকে বেতন দেওয়া হয়নি। দয়া করে এ বছর আমার বেতন পরিশোধ করা হোক যাতে তার থেকে কিছু দিয়ে আমি ঋণ শোধ করতে পারি আর বাকীটা দিয়ে সংসার চালাতে পারি।" তিনি বললেন, "বাদশাহ্‌র আপাততঃ কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই যে সেজন্য সৈন্যদের দরকার হবে। সেজন্য তুমি এবং তোমার মত সৈনিকদের চাকরি থাকুক না থাকুক তাতে কিছুই আসে যায় না। তোমার টাকার প্রয়োজন হলে যাও মজুরের কাজ করে খাও।" আমি বললাম, "এই সরকারের জন্য আমি অনেক করেছি আর আমার যা পাওনা আছে তা পেলে মজুরের কাজ করার প্রয়োজন হবে না। আপনার শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু জানা দরকার, কারণ সেনাবাহিনীর কাজে আমি যত পারদর্শী আপনি লেখার কাজে তত পারদর্শী ন'ন। যুদ্ধের সময় বাদশাহ্‌র কারণে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেই এবং তাঁর আদেশের বাইরে ফিরেও দেখি না। কিন্তু বেতনের বেলায় আপনি তা আটকে রাখেন এবং বাদশাহ্‌র আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হন। আপনি কি জানেন না যে, বাদশাহ্‌র কাছে আপনি যেমন একজন কর্মচারী আমিও তেমনি একজন? তিনি আপনাকে রেখেছেন এক কাজের জন্য আর অন্য কাজের জন্য আমাকে। আপনার-আমার মধ্যে পার্থক্য আমি তার বাধ্যগত, আপনি তা ন'ন। আমাদের মত সৈনিকদের বাদশাহ্‌র প্রয়োজন না হলে আপনাদের মত লোকেরও তাঁর প্রয়োজন নাই। আপনার কাছে যদি কোন আদেশ থেকে থাকে যে বাদশাহ বেতনের খাতা থেকে আমার নাম কেটে দিয়েছেন তবে আমাকে তা দেখান নতুবা বাদশাহ্‌র আদেশ অনুসারে আমার বেতন দিতে হবে।" তখন সে বলল, "দূর হও! আমিই বাদশাহ্‌ ও তোমাদের দেখাশুনা করি এবং আমি যদি না হতাম তাহলে শকুন অনেক আগেই তোমাদের শেষ করে দিত।" তার দুই দিন পরে উজির আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেয় এবং এই চার মাস যাবত আমি জেলে আছি।

(১৮) সাত শতেরও বেশী কয়েদী ছিল। তার মধ্যে বিশ জনেরও কম ছিল হত্যাকারী, চোর ও জালিয়াত। বাকী সকলকেই উজির ধনলিপ্সার জন্য

নিষ্ঠুরতা করে জেলে পুরেছে। শহরের এবং আশে-পাশের জেলাগুলোর লোকেরা যেদিন এই রাজকীয় ঘোষণা শুনতে পেল তার পরের দিন এতলোক নালিশ নিয়ে দরবারে এলো যে, সেগুলো পরিমাপ করবার মত নয়।

(১৯) বাহ্‌রাম গুর যখন জনগণের অবস্থার কথা এবং উজিরের অনাচার, বেআইনী ও নৃশংস কীর্তি-কলাপের কথা শুনলেন, তখন মনে মনে বললেন, 'এই লোকটা দেশে যে পরিমাণ দুর্নীতি এনেছে তা বর্ণনাতীত। সে আল্লাহ্, তাঁর বান্দা ও আমার বিরুদ্ধে যে অবাধ্যতা করেছে তা কল্পনাতীত। ব্যাপারটা আরো তালিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন।' তিনি তৎক্ষণাৎ রাস্ত রাভিশনের বাড়ীতে কাগজের নথিপত্রগুলো আনতে লোক পাঠাতে এবং বাড়ীর সব দরজাগুলো সীল মেরে রাখবার হুকুম দিলেন। বিশ্বাসী লোক দ্বারা কাজটা করানো হোল। নথিপত্র এনে তারা দেখতে লাগল। তারমধ্যে একটি নথিতে তারা রাস্ত রাভিশনের কাছে এক রাজা কর্তৃক পাঠানো অনেকগুলো প্রস্তাব লিপিবদ্ধ পেলেন। রাজা বিদ্রোহ করছিল এবং বাহ্‌রাম গুরের রাজ্য জোরপূর্বক দখল করবার চেষ্টা করেছিল। তার মধ্যে রাস্ত রাভিশনের ঐ রাজাকে লেখা একটি পত্রও পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'তোমার গতি এত মন্থর কেন? জ্ঞানীরা বলে গেছেন যে অলসতা রাজ্যের দুশমন। তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমি কয়েকজন সামরিক অফিসারদের হাত করেছি এবং তোমার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেছি। বেশীর ভাগ সৈন্যদেরই আমি অস্ত্রহীন করে দিয়েছি এবং কিছু সংখ্যককে কোন এক ঘাটিতে পাঠিয়ে কোন এক কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। জনগণকে আমি ক্ষুধার্ত, নিঃস্ব ও ঘরহীন করে দিয়েছি এবং এতদিনে আমি যা কিছু অধিকার করেছি তা দিয়ে তোমার জন্য এমন একটা ধনাগার করেছি যা আজকালকার কোন রাজারই নেই। তাছাড়া আমি মুকুট, কটিবন্দ এবং স্বর্ণ ও মুক্তাখচিত পাত্রেরও যোগাড় করেছি যা এর পূর্বে কেউ দেখে নাই। এই লোকটা থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। ময়দান এখন শূন্য এবং শত্রুরা এখন অসাবধান আছে তাই সে সাবধান হবার পূর্বেই যত শীঘ্র পার এসে যাও।'

(২০) এই কাগজপত্রগুলো দেখে বাহ্‌রাম গুর বললেন, 'বেশ! তাহলে সেই শত্রুদের উত্তেজিত করে এবং প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং শত্রুরা এখন আমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। এখন তাহলে এই লোকটার দুষ্টামি ও প্রতারণা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইল না।'

তিনি তখন আদেশ করলেন যে লোকটার যা-কিছু আছে, সবই সরকারী ধনাগারে আনা হোক এবং তার দাসদাসী ও প্রাণী যা কিছু ছিল সব এনে যার যার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিল অথবা জোরপূর্বক কেড়ে এনেছিল তাদেরকে ফেরত দেওয়া হোক। তার ভূ-সম্পত্তি এবং জমি-জমা বিক্রি করে দেওয়া হোল অথবা বিলিয়ে দেওয়া হোল আর তার বাড়ী ঘর দুয়ার ধূলিসাৎ করা হোল। তিনি তখন রাজপ্রাসাদের সামনে একটি এবং তার সামনে আরো তিরিশটি ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করার হুকুম দিলেন। প্রথমে রাস্ত রাভিশনকে ফাঁসি দেওয়া হোল যেমনি করে ঐ লোকটা কুকুরটাকে দিয়েছিল এবং তারপর রাস্ত রাভিশনের সঙ্গে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদেরও এক এক করে ঐ একই পথের পথিক হতে হোল।

বাদশাহ্ তখন সাত দিন ধরে পড়ার জন্য এই বলে একটা নির্দেশ জারী করলেন, 'এটা হোল এমন একটা লোকের শাস্তি, যে বাদশাহ্র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তার শত্রুদের সাথে মেলামেশা করে, যে বাধ্যতার পরিবর্তে প্রতারণাকে বেশী পছন্দ করে, জনগণের প্রতি করে অত্যাচার আর আল্লাহ্ ও তাঁর সর্বভৌমত্বকে করে অস্বীকার।'

(২১) এই শাস্তি দেওয়ার ফলে অপরাধী যারা ছিল সকলেই বাহ্রাম বাদশাহ্র নামে ভীত হয়ে উঠল। রাস্ত রাভিশন কর্তৃক নিয়োজিত সকল কর্মচারীকেই তিনি পদচ্যুত করে দিলেন এবং পুনরায় আর নিয়োগ করলেন না। বাকী কর্মচারীদের দিলেন বদলী করে। যে রাজা বাহ্রাম গুরের রাজ্য আক্রমণ করেছিল তার কাছে যখন এই খবর পৌঁছল, সে তখন সোজাসুজি ফিরে পূর্বের যায়গায় চলে গেল এবং তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে লাগলো। সে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং প্রচুর অর্থ ও মূল্যবান উপহারসহ বাদশাহ্কে এই বলে আনুগত্য জানালো, 'আমি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা চিন্তাই করতে পারতাম না। কিন্তু আপনার মহামান্য উজির বহু চিঠি এবং সংবাদদাতার মাধ্যমে আমাকে বাধ্য করেছে এই পথ অবলম্বন করতে। আপনার এই সেবকের সব সময়ই সন্দেহ হোত যে সে একজন অপরাধী তাই একটা আশ্রয়স্থল খুঁজছে।' বাহ্রাম বাদশাহ্ তার যুক্তিতে বিশ্বাস করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উজিরের পদটা তখন একজন আল্লাহ্ভীরু, গাঢ় বিশ্বাসী ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে দেওয়া হোল। সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ সম্পর্কীয় শাসন ব্যবস্থা আবার শৃঙ্খলার সাথে চলতে থাকল এবং কাজকর্মও আবার

চালু হোল। সমৃদ্ধির দিকে যাত্রা শুরু হোল আর জনগণ রেহাই পেল অত্যাচার ও অবিচারের হাত থেকে।

যে ব্যক্তি কুকুরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল, সে তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁবুর ভিতরে যাবে এমন সময় বাহ্‌রাম গুর তাঁর তূণীরের ভেতর থেকে একটা তীর বের করে তার সামনে এই বলে রাখলেন, 'আমি তোমার রুটি ও নিমক খেয়েছি, তোমার যে ক্ষতি হয়েছে তাও জানতে পেরেছি। আমি তোমার কাছে ঋণী। জেনে রাখ, আমি বাহ্‌রাম বাদশাহ্‌র একজন রাজকীয় তত্ত্বাবধায়ক এবং দরবারের সব পারিষদ এবং তত্ত্বাবধায়করা আমার পরিচিত ও তারা আমাকে ভাল ভাবে চেনে। তোমাকে অবশ্যই এই তীর নিয়ে বাহ্‌রাম বাদশাহ্‌র দরবারে আসতে হবে। এই তীরসহ যে-ই তোমাকে দেখুক না কেন, সে আমার কাছে পেঁ াছে দিবে। আমি তখন এমন ভাবে আমার ঋণ পরিশোধ করব যা তোমার কিছুটা ক্ষতি পূরণ করবে।' এই বলে বাহ্‌রাম বিদায় হলেন।

(২২) কয়েকদিন পরে ঐ লোকটার স্ত্রী তাকে বলল, 'উঠ, ঐ তীরটাসহ শহরে যাও, কারণ ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন ধনী ও সম্মানী ব্যক্তি। এমন কি, ঐ ব্যক্তি যদি সামান্য উপকারও করে তবে তা এখন খুব কাজে আসবে। কালবিলম্ব না করে চলে যাও, কারণ ঐ জাতীয় লোকের কথা মিথ্যা হবে না।' লোকটা শহরে এসে পেঁ াছল। ঐ রাত্রি ঘুমানোর পর পরদিন সে বাহ্‌রামের দরবারে গেল। এদিকে বাহ্‌রাম গুর তাঁর পাত্র-পারিষদদের এবং তত্ত্বাবধায়কদের বলে রেখেছেন যে 'ঐ ধরনের কোন একটি লোক আমার তীর সঙ্গে নিয়ে দরবারে আসলে, কালবিলম্ব না করে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

(২৩) তত্ত্বাবধায়করা ঐ তীরওয়ালা লোকটাকে দেখে বলল, 'হুযূর, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আমরা কয়েকদিন যাবৎ আপনার অপেক্ষায় আছি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আপনাকে আমরা তীরের মালিকের কাছে নিয়ে যাব।' কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর বাহ্‌রাম গুর দরবারে বসলেন। তত্ত্বাবধায়করা লোকটাকে দরবার-কক্ষে নিয়ে গেল। লোকটা যখন বাহ্‌রাম বাদশাহ্‌কে দেখে চিনতে পারল, তখন সে বলল, 'হায়! আমাকে হয়ত মেরে ফেলবে। ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তিই বাহ্‌রাম বাদশাহ্‌। তাঁর সঙ্গে আমার যেরূপ উচিত ছিল সেরূপ ব্যবহার আমি করি নাই বরং রুক্ষ মেজাজে কথা বলেছিলাম। আমার ভয় হচ্ছে, তিনি আমার প্রতি বিরাগ হয়েছেন কিনা।'

(২৪) তত্ত্বাবধায়করা তাকে সিংহাসনের সামনে আনলে সে বাদশাহ্ কে অভিবাদন জানাল। বাহ্ রাম গুর পারিষদদের দিকে ফিরে বললেন, 'এই লোকটার জন্যই আমি রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়েছি।' তখন তিনি পারিষদদের কাছে কুকুরের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, 'লোকটাকে আমি সৎ বলে মনে করি।' বাদশাহ্ র হুকুম পেয়ে তারা তখন লোকটিকে একটা খেতাবে ভূষিত করল এবং তাকে সাতশত ভেড়া ও যতগুলো তার খুশী ভেড়ী উপহার দিল। তাছাড়া বাহ্ রাম গুর হুকুম দিলেন যে, সে যতদিন জীবিত থাকবে, কেউ লোকটার কাছ থেকে কোন অবশ্য-দেয় খাজনা (compulsory alms) আদায় করতে পারবে না।

(২৫) এটা সকলেরই জানা আছে যে, সিকান্দার কিভাবে দারাকে পরাজিত করেছিলেন। পরাজয়ের কারণ ছিল, সিকান্দারের সঙ্গে দারার উজিরের গোপন চুক্তি। দারাকে যখন হত্যা করা হয়েছিল তখন সিকান্দার বলেছিলেন, 'আমীরের অবহেলা ও উজিরের প্রতারণাই তার রাজ্যচ্যুতির মূল কারণ।'

(২৬) সর্বদাই রাজার তাঁর কর্মচারীদের সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার। সব সময়ই তাদের আচরণ ও চরিত্র সম্পর্কে তদন্ত করা উচিত এবং যখনই তাদের কারো মধ্যে কোন অসংযত আচরণ বা প্রতারণার লেশ পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাকে পদচ্যুত করে তার অপরাধের অনুপাতে তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার, যাতে অন্যান্য কর্মচারীরাও সজাগ হয়ে যায়। এবং যখনই কোন একজনকে একটা বড় পদে নিয়োগ করা হয়, রাজার উচিত গোপনে (যাতে লোকটা জানতে না পারে) কারও দ্বারা তার দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের খোঁজ-খবর নেওয়া।

(২৭) সেই জন্যই এরিস্টটল রাজা আলেকজাণ্ডারকে বলেছিলেন, 'যদি তুমি কখনও ওদের কারো একজনকে পীড়া দাও, যারা জনগণের নিমিত্ত লেখনীর কাজ করে, তবে তাকে আর কখনও কাজে নিয়োগ করো না, কারণ সে তাহলে তোমার শত্রুদের একত্র করে তোমাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে।'

(২৮) রাজা পরবজ সেইজন্যই বলেছিলেন, 'চার প্রকারের লোক আছে যাদের অন্যায় রাজার উপেক্ষা করা উচিত নয়। প্রথমতঃ যারা নিজ রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, দ্বিতীয়তঃ যারা তাঁর অন্তঃপুর সম্বন্ধে অভিসন্ধি করে, তৃতীয়তঃ যারা নিজেদের গোপনত্ব বজায় রাখে না এবং চতুর্থতঃ যারা মুখে মুখে রাজাকে সমর্থন করে কিন্তু মনে-প্রাণে শত্রুদিগকে সমর্থন করে এবং তাদের নীতি পালন করে চলে।

(২৯) একটা মানুষের কর্মের থেকেই তার গোপন তথ্য বের করা যায়। বাদশাহ্ যদি সবকিছু সম্পর্কে সজাগ থাকেন, তবে তাঁর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি স্বত্বাধিকারী প্রসঙ্গ এবং কৃষকদের প্রতি তাদের ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান।

ভূমি স্বত্বাধিকারীদের জানা উচিত যে, কৃষকদের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। তাদেরকে যে পরিমাণ খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছে সেটাই সৌজন্যের সাথে আদায় করার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু খাজনা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধন, জন, স্ত্রী-পুত্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, আসবাবপত্র ও ক্ষেত খামারের অধিকার তাদের অলংঘনীয় থাকবে আর সেখানেই শেষ হবে অফিসারদের দৌরাত্ম্য। যদি কৃষকরা তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য দরবারে আসতে চায়, তবে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। কোন প্রতিনিধি যদি অন্যরূপ ব্যবহার করে তবে তাকে দমন করতে হবে। তার তত্ত্বাবধান করার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে সরকারীভাবে তিরস্কার করতে হবে যাতে অন্যান্য কর্মচারীরা সতর্ক হয়ে যায়। তাদের জানা দরকার যে, দেশ এবং কৃষক সম্প্রদায় শাসন কর্তৃপক্ষের অধীন এবং প্রতিনিধিরা, শাসনকর্তারা ঐ অঞ্চলের কৃষকদের শাসনকর্তার মত---যেমন বাদশাহ নিজে সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়ের শাসনকর্তা। এইভাবে কৃষকরা শান্তিতে থাকবে এবং বাদশাহ পরকালের শাস্তি ও উৎ-পীড়ন থেকে রেহাই পাবে।

ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্‌র কাহিনী

কথিত আছে যে, কুবাদ বাদশাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুবিচারক নওশেরওয়াঁ সিংহাসনে বসেন। তাঁর বয়স ১৮ বছর হলেও তিনি রাজার ন্যায়ই রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি যুবক হলেও ছোটবেলা থেকে তাঁর চরিত্র ন্যায় নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভাল মন্দ বিচার করতে জানতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার পিতা দুর্বলচেতা ও সরল লোক তাই তিনি অল্পতেই প্রতারিত হন। তিনি কর্মচারীদের উপর রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে গেছেন আর তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে, ফলে দেশটা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, ধনাগার হচ্ছে খালি। তাঁরা

অন্যায়ভাবে রাজস্ব আত্মসাৎ করছে কিন্তু আমার পিতাই এর জন্য লজ্জিত ও দায়ী হবেন।' কোবাদ মাজদাকের ছেলের কাছে একেবারে নত হয়ে পড়েছিলেন যেমনি করে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন একজন গবর্নর এবং একজন রাজস্ব আদায়কারীর দ্বারা—যারা দু'জনে মিলে তাদের প্রদেশ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে কৃষকদের দুর্বল করে দিয়েছিল। তাঁর অর্থলালসা এত বেশী ছিল যে, তারা যখন তাঁকে স্বেচ্ছায় একটা দিনারের থলি দিয়ে দিত, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়তেন। তাঁর ততটুকু বিচক্ষণতা ছিল না যে তিনি তাদের একজনকে প্রশ্ন করে বলবেন, 'তুমি এই প্রদেশের শাসনকর্তা ও নির্দেশদাতা। প্রদেশের রাজস্বের এমন একটা অংশ তোমার নিমিত্ত দিয়েছি যা তোমার এবং অনুচরবর্গের বেতন, খোরাক এবং কাপড়-চোপড়ের জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তুমি জনগণের থেকে পুরা অঙ্কটাই আদায় করেছ। কিন্তু তুমি এই উদ্বৃত্ত টাকাটা কোথায় পেলে যা আমার জন্য এনেছ। আমি জানি যে তুমি এটা পৈতৃক উত্তরাধিকার হিসাবে পাওনি। এগুলো সবই অন্যায়ভাবে জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত।' তেমনি ভাবে তিনি রাজস্ব আদায়কারীকেও বলেননি, 'এই প্রদেশের রাজস্ব এত বেশী যে কিছু অংশ তুমি খরচ করেছ বিভিন্ন চুক্তিপত্রে আর বাকীটা ধনাগারে জমা দিয়েছ। এটা কি তোমার অন্যায়ভাবে অর্জিত অঙ্কের কিছুটা নয় যে উদ্বৃত্তটা আমার জন্য এনেছ? এটা তুমি কোথায় পেলে?' এই জাতীয় ব্যাপার তিনি কখনও তদন্ত করেন নাই বা অন্যায়কারীকে শাস্তি দেবারও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই যাতে অন্যরা একটা সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারত।

তিন চার বছর রাজত্বকাল অতিবাহিত হবার পরও যখন প্রতিনিধিরা এবং কর্মচারীরা তাদের স্বাভাবিক অত্যাচার অব্যাহত রাখতে লাগল তখন নালিশকারিগণ খোদ রাজ-দরবারে গিয়ে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে লাগল। ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়াঁ অন্যায় বিদূরিত করার জন্য দরবারে বসে পারিষদদের ডাকলেন। দরবারে বসে তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র শোকরিয়া জানালেন এবং পরে বললেন, 'তোমরা জান যে আল্লাহ্‌ আমাকে এই রাজ্যের অধিকারী করেছেন। পরন্তু এটা আমি আমার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি; তৃতীয়তঃ আমার চাচা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তখন সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে আমাকে তরবারি ধরতে হয়েছে। আল্লাহ্‌ রাজ্যের ভার আমার উপরে অর্পণ করেছেন, আমি আবার এটা তোমাদের সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি এবং

প্রত্যেককেই আমি ক্ষমতা দিয়েছি। যারা যোগ্য তাদের প্রত্যেককেই আমি কিছু না কিছু অংশ দিয়েছি। যে সমস্ত পারিষদ আমার পিতার সময়ে উচ্চ পদ ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল আমি তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে রেখেছি এবং তাদের ভাতা একটুও কমাই নাই। আমি সর্বদাই তোমাদেরকে জনগণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে ও তাদের থেকে পরিমাণ মতন খাজনা আদায় করতে অনুরোধ করেছি। আমি তোমাদের স্বার্থ দেখেছি কিন্তু তোমরা কিছুই সমীহ্ কর নাই বা কোন কথাই শোন নাই। তোমরা আল্লাহ্কেও ভয় কর না, তাঁর বান্দাদেরও রেহাই দাও না। যেখানেই আমি কুকর্মের শাস্তির ভয় করি না কেন, আমি ভাবতে পারি না যে তোমাদের পাপ ও অবিচার আমার রাজ্যে কলঙ্ক আনবে। দুনিয়াতে কোন শত্রু নাই এবং তোমাদের জীবনেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে। সেইজন্য তোমাদের আল্লাহ্র প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত, যেহেতু তিনি তোমাদের ও আমাদের মঙ্গল বিধান করেছেন। কারণ অবিচার রাজ্যের পতন আনে আর অকৃতজ্ঞতা থামিয়ে দেয় আল্লাহ্র আশীর্বাদ। যাই হোক, এর পর থেকে আল্লাহ্র বান্দার প্রতি কখনই কোন অবিচার হতে পারবে না। তোমাদের সজাগ থাকা উচিত যে, কৃষকদের প্রতি যেন বেশী কর চাপিয়ে দেওয়া না হয়, দুর্বলদের প্রতি যেন অত্যাচার করা না হয়। জ্ঞানীদের সম্মান কর ও সৎ লোকের সঙ্গে সাহচর্য কর, খারাপ লোকদের পরিত্যাগ করে চল এবং যারা নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের কোন ক্ষতি কোর না। আমি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, 'যদি কোন ব্যক্তি এই নির্দেশের ব্যতিক্রম করে তবে আমি তাকে আর বরদাশ্ত করব না।' সকলে বলল, 'আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব এবং আপনার আদেশ মেনে চলব।'

কয়েকদিনের মধ্যেই সকলে যার যার জায়গায় ফিরে গেল। পূর্বের অবিচার ও অত্যাচার আবার শুরু হোল। তারা নওশেরওয়াঁকে একটা সামান্য বালক মনে করে প্রত্যেকেই ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে মনে করতে লাগল যে, সে-ই নওশেরওয়াঁকে সিংহাসনে বসিয়েছে এবং সে তার ইচ্ছামত তাঁকে রাজা হিসাবে মানতেও পারে আবার নাও মানতে পারে। নওশেরওয়াঁ শান্তি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন। এইভাবে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল।

তবে একজন সম্পদশালী ও সমৃদ্ধশালী সেনাপতি ছিল যাকে ন্যায়-পরায়ণ নওশেরওয়াঁ আজারবাইজানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সমস্ত

রাজ্যে তার মত শক্তিশালী সেনাপতি আর ছিল না এবং অস্ত্রে, ঘোড়ায় এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে তার তুল্য আর কেউ ছিল না। এই লোকটাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে শহরে সে বাস করত সেখানে একটি বাড়ী ও একটি বাগান করা। শহরতলীতে এক বৃদ্ধার এমন একখণ্ড জমি ছিল যার আয় থেকে বৃদ্ধার রাজস্ব ও চাষকারীর অংশ দিয়েও যা থাকত তা দিয়ে তার সারা বছরে দৈনিক চারটা করে রুটি হয়ে যেত। একটা রুটি দিয়ে সে খাবারের অন্যান্য জিনিস কিনত, একটা দিয়ে বাতি জ্বালানোর তেল কিনত আর একটা সকালে খেত ও অন্যটা খেত রাত্রিবেলা। লোকে সহৃদয় হয়ে তাকে কাপড়-চোপড় দিত। সে কখনও ঘরের বাইরে যায় নাই এবং জীবনটা নির্জনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে দিত। সেনাপতির ঐ জায়গাটা খুব পছন্দ হোল এবং সে তার সম্পত্তির সঙ্গে এটাও সংযুক্ত করে দিতে চাইল। তাই সে কোন একজনকে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির কাছে বলে পাঠাল, 'জমিটা বিক্রি করে দাও, কারণ এটা আমার দরকার।' বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বলল, 'এটা আমি বিক্রি করতে পারি না, কারণ এটার প্রয়োজন আমার খুব বেশী। সারা দুনিয়াতে আমার এই জমিখণ্ডই আছে। এটাই আমার জীবিকা নির্বাহ করার একমাত্র সম্বল এবং কেউ তার জীবিকা বিক্রী করে না।' লোকটি উত্তরে বলল, 'আমি এটার জন্য তোমাকে টাকা দিব অথবা এর পরিবর্তে তোমাকে অন্য একখণ্ড জমি দেব যার থেকে তোমার সমপরিমাণ আয় হবে।' বৃদ্ধাটি আবার বলল, 'জমিটা আমার ন্যায্য সম্পত্তি। এটা আমি আমার পিতা-মাতা থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি; এটা পানির খুব নিকটে এবং প্রতিবেশীরা আমার প্রতি খুব সহৃদয়। আপনি যে জমি দিবেন সেটাতে এতগুলো সুবিধা থাকবে না, দয়া করে আমাকে রেহাই দিন।' সেনাপতি কিন্তু বৃদ্ধার কথায় কর্ণপাত না করে ইচ্ছানুসারে জোরপূর্বক জমিটা দখল করে নিয়ে তার বাগানের প্রাচীরটা এত প্রসারিত করল যে জমিটা তারই বিশাল সম্পত্তির একটা অংশ হিসাবে পরিগণিত হোল। অসহায় বৃদ্ধা নিরুপায় অবস্থায় আরো গরীব হয়ে গেল। সেনাপতি জমিটার দাম অথবা তার বদলা দিতে অসম্মতি জানাল। বৃদ্ধা নিজেই সেনাপতির সামনে গিয়ে বলল, 'আমার জমির মূল্য দাও অথবা তার বদলা জমি দাও।' সেনাপতি তার কথায় কর্ণপাত করল না, এমন কি তার দিকে তাকালও না। অসহায় বৃদ্ধা নিরাশ হয়ে চলে গেল এবং তারপর আর তাকে ঐ বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এরপর যখনই সেনাপতি

ঘোড়ায় চড়ে প্রমোদ ভ্রমণে অথবা শিকারে যেত, বৃদ্ধা তার পথে বসে থাকত। যখনই সেনাপতি তার নিকটে পেঁাছত, সে চীৎকার করে তার জমির দাম চাইত। কোন উত্তর না দিয়ে সেনাপতি চলে যেত। যদি সে সেনাপতির সঙ্গীদের, অধীনস্থদের অথবা তত্ত্বাবধায়কদের জিজ্ঞাসা করত তবে তারা বলত, 'বেশ ত, আমরা এ বিষয়ে তার কাছে বলব।' কিন্তু কেউ কোনদিন তা বলে নি, এমনি করে দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেল।

অসহায় বৃদ্ধা একেবারে গরীব হয়ে পড়ল। সে কোন বিচার পেল না এবং কোনদিন পাবে সে ভরসাও ছেড়ে দিল। সে নিজেই নিজের কাছে বলল, 'কতদিন আর আমি ঠাণ্ডা লৌহ-খণ্ডকে আঘাত করব। সব ক্ষমতার উপরেই আল্লাহ্ একটা উচ্চতর ক্ষমতা রেখেছেন। এত অত্যাচারী হওয়া সত্ত্বেও এই লোকটি ন্যায়পরায়ণ রাজা নওশেরওয়াঁর একজন ভৃত্য এবং খয়েরখা মাত্র। আমাকে যত কষ্টই ভোগ করতে হোক না কেন আমি মাদাইনে পেঁাছানোর পথ বের করবই। সেখানে গিয়ে আমি নিজে রাজা নওশেরওয়াঁর কাছে হাযির হয়ে আমার বক্তব্য পেশ করব। হয়ত বা তাঁর কাছে আমি সুবিচার পেতে পারি।' বৃদ্ধা কারো কাছে তার মনের কথা ব্যক্ত করল না এবং গোপনে গোপনে বহু দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে আযারবাইজান থেকে মাদাইনে গিয়ে পৌছল। নওশেরওয়াঁর রাজপ্রাসাদ দেখতে পেয়ে সে মনে মনে ভাবল, 'আমাকে তারা ভিতরে ঢুকতে দেবে না। আযারবাইজানের শাসনকর্তা যে এই রাজার একজন ভৃত্য মাত্র তার বাড়ীতেই ঢুকতে দেয় নাই আর এ-ত সারা দুনিয়ার বাদশাহ্‌র বাড়ী। এখানে কেন তারা আমাকে ঢুকতে দেবে? তার চেয়ে ভাল হবে রাজপ্রাসাদের আশে পাশে কোথাও একটা থাকার জায়গা ঠিক করে জেনে নেই কখন রাজা ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যায়। তার পা'য়ে পড়ে হয়ত আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে পারব।'

যে সেনাপতি বৃদ্ধার জমি কেড়ে নিয়েছে সে হঠাৎ রাজ-দরবারে এসে হাযির হোল। এদিকে রাজাও শিকারে যেতে মনস্থ করলেন। বৃদ্ধা জানতে পারল যে, রাজা অমুক দিন কোন এক জায়গায় শিকারে যাচ্ছেন। বৃদ্ধা অনবরত জিজ্ঞাসা করে বহু কষ্টে শিকারের জায়গায় এসে পৌঁছল। সে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল এবং রাত্রিটা ওখানেই কাটাল। পরের দিন রাজা নওশেরওয়াঁ এসে পৌঁছলেন। পারিষদরা ও অধীনস্থরা জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ল এবং শিকার তাড়াতে লাগল। নওশেরওয়াঁর

সঙ্গে ছিল মাত্র একজন অস্ত্রবহনকারী। তিনি ঘোড়ায় চড়ে কেবল শিকারের দিকে এগোচ্ছেন, এমনি সময়ে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি রাজাকে একা দেখে ঝোপের মধ্য থেকে রাজার দিকে আসতে লাগল। বৃদ্ধা রাজার হাতে দরখাস্তখানা দিয়ে বলল, 'হে রাজা, আপনি সারা দুনিয়ার মালিক আর এই অসহায় বৃদ্ধা আপনার বিচার প্রার্থী। দয়া করে দরখাস্তখানা পড়লে বৃদ্ধার কাহিনী জানতে পারবেন।' নওশেরওয়াঁ বৃদ্ধাকে দেখে আর তার বক্তব্য শুনে বুঝতে পারলেন যে নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই বৃদ্ধা শিকারের স্থানে এসে হাযির হয়েছে। তিনি তখন বৃদ্ধার দিকে অগ্রসর হয়ে তার দরখাস্তখানা নিয়ে পড়লেন। পড়ে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, 'তুমি আর চিন্তা কোর না। এতদিন এটা ছিল তোমার ব্যাপার আর এখন যেহেতু আমরা এটা সম্পর্কে জানি এটার সমাধান করা আমাদের কর্তব্য। আমরা তোমার দাবী আদায় করব তারপর তোমাকে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিব। যেহেতু তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, তোমাকে কয়েকদিন এখানে থাকতে হবে।' তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা সহিসকে ঘোড়ায় চড়ে তার দিকে আসতে দেখে তাকে বললেন, 'ঘোড়া থেকে নেমে এই মহিলাকে ঘোড়ায় তোল এবং তাকে এক গ্রামে নিয়ে গ্রামের মোড়লকে বল তার প্রতি যত্ন নেবার জন্য। তারপর শীঘ্র ফিরে আসবে। আমরা যখন শিকার থেকে ফিরব, তখন ঐ স্ত্রী-লোককে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে যাবে এবং তোমার বাড়ীতে রাখবে। তাকে প্রত্যহ দুই সের রুটি এবং এক সের মাংস দিবে খেতে। যতদিন না আমি ডেকে পাঠাব, তাকে রাজস্ব তহবিল থেকে মাসে পাঁচ স্বর্ণ দিনার দিবার ব্যবস্থা করবে।' সহিস রাজার হুকুম মতই কাজ করল।

শিকার থেকে ফেরার পথে নওশেরওয়াঁ সারাদিন চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, কি করে রাজ-সভাসদদের না জানিয়ে বৃদ্ধার মামলার তদন্ত করা যায়। একদিন বিকাল বেলা যখন সকলেই ঘুমে মগ্ন ছিল এবং রাজপ্রাসাদে নির্জনতা বিরাজমান ছিল তখন রাজা একটা চাকরকে হুকুম করলেন অমুক তাঁবু থেকে জনৈক ভৃত্যকে ডেকে আনতে। চাকরটি যথারীতি গিয়ে সেই ভৃত্যকে ডেকে আনল। তখন রাজা বললেন, 'ওহে তুমি জান আমার অনেক যোগ্য ভৃত্য আছে তবুও আমি বিশেষ করে তোমাকে ডেকে এনেছি একটা কাজের ভার দেবার জন্যে। তোমাকে ধনাগার থেকে তোমার খরচের জন্য কিছু টাকা তুলে আযারবাইজানে যেতে হবে। তোমাকে কোন এক বিশিষ্ট শহরের একটা বিশিষ্ট বাড়ীতে বিশ দিনের জন্য

থাকতে হবে। ওখানকার অধিবাসীদের কাছে তোমার ভান করতে হবে যে তুমি একজন পলাতক ভৃত্যের খোঁজে ওখানে গিয়েছ। ওখানে তোমার সব জাতীয় লোকের সাথে মিশতে হবে এবং তুমি যখন মাতাল অবস্থায় ও গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে তাদের সাথে মিশে আলাপ আলোচনা করতে থাকবে তখন অনু নামের একজন বৃদ্ধার খোঁজ নিবে যে বৃদ্ধা ঐ জেলায় বাস করত এবং সম্ভবতঃ এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বের করবে ঐ বৃদ্ধা কোথায় কোথায় যেত এবং তার এক খণ্ড জমি ছিল, তা দিয়ে সে কি করত। সকলে কে কি বলে শুনবে এবং তা মনে রেখে একটা সঠিক সংবাদ আনবে। এটাই তোমাকে পাঠানোর সত্যিকার উদ্দেশ্য কিন্তু আগামীকল্য আমি তোমাকে পারিষদদের সামনে দরবারে ডেকে সকলকে শুনানোর জন্য জোরে জোরে বলব, 'যাও ধনাগার থেকে টাকা তুলে আযারবাইজানে গিয়ে ঘুরে এস। যে সমস্ত জেলা ও শহর হয়ে তুমি যাবে সবখানেই খোঁজ নিবে এ বছর খাদ্যশস্য ও ফলফলাদি কেমন হয়েছে। দেখবে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র কোন দুর্যোগ পড়েছে কিনা। চারণভূমি এবং শিকারের স্থানগুলোর অবস্থাও তদারক করে দেখবে।'' দেরী করো না। ফিরে এসে আমাকে জানাও, কি দেখলে যাতে অন্যেরা জানতে না পারে যে কিজন্য আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।' বালক ভৃত্য বলল, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

পরের দিন নওশেরওয়াঁ ঠিক তাই করলেন। ভৃত্য বিদায় হয়ে সেই শহরে চলে গেল। বিশদিন সেখানে অবস্থান করে সে সকলের কাছ থেকে বৃদ্ধা সম্পর্কে জেনে নিল। সকলেই বলল, 'ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি সদ্বংশের ও সৎস্বভাবী ছিল। আগে তাকে আমরা তার স্বামী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাস করতে দেখতাম কিন্তু স্বামী ও বাচচাগুলো মরে যাবার পর খুব নিঃস্ব অবস্থায় একা একা বাস করত। পৈতৃক একখণ্ড জমিই ছিল তার একমাত্র সম্বল। সে জমিখানা একজন কৃষককে দিয়ে চাষ করাত এবং তার থেকে যা পেত তা দিয়ে সহজেই সে রাজকর ও কৃষকের অংশ দিয়ে দিতে পারত। আর বাকীটা দিয়ে পুরা এক বছরের জন্য তার দিনে চারটি রুটি হয়ে যেত। একখণ্ড রুটি দিয়ে সে খাবারের অন্যান্য জিনিস কিনত, অন্য এক খণ্ড দিয়ে বাতি জ্বালানোর জন্য তৈল কিনত আর বাকী দুটোর একটা সকালে খেত আর অন্যটা খেত রাত্রে। শাসনকর্তা আচ্ছাদন দিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করে একটা বাগান তৈরী করতে চাইল। তাই সে জোরপূর্বক বৃদ্ধার জমিখণ্ড নিয়ে নিজের সম্পত্তির সঙ্গে সংযুক্ত করে নিল। তার জন্য বৃদ্ধাকে টাকাও দেয়নি বা

জমির পরিবর্তে জমিও দেয়নি। এক বছর ধরে বৃদ্ধা শাসনকর্তার বাড়ীতে গিয়ে কেঁদে কেঁদে টাকা চাইতে থাকে কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাকে আর দেখা যায় না। আমরা জানি না সে কোথায় গিয়েছে, মরে গেছে বা জীবিত আছে।'

ভৃত্য রাজধানীতে ফিরে এল। ন্যায়পরায়ণ রাজা নওশেরওয়াঁ দরবারে বসেছেন, এমন সময় ভৃত্য ঢুকে তাঁর কাছে মাথা নত করে সালাম করল। তাকে দেখে নওশেরওয়াঁ বললেন, 'তুমি এসেছ! বল ওখানে কি দেখলে।' সে বলল, 'আপনার মেহেরবানীতে এ বছর সব জায়গায়ই ফসল ভাল ; কোন দুর্যোগ দেখা দেয় নি ; চারণভূমি সতেজ আছে আর শিকারের স্থানও পূর্ণ।' রাজা বললেন, 'আল্লাহ্‌র শোকরিয়া যে তুমি ভাল খবর এনেছ।' লোকজন চলে গেলে এবং রাজপ্রাসাদ জনশূন্য হলে ভৃত্য রাজার কাছে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির কাহিনী যা জেনে এসেছে তা বর্ণনা করল। নওশেরওয়াঁর দৃঢ় বিশ্বাস হোল যে, বৃদ্ধা যা বলেছে তা সব সত্য। দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় সারা দিন রাত তাঁর ঘুম হয় নি। পরের দিন সকালেই তিনি প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে ডেকে হুকুম করলেন যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে যদি ঐ বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি আসে তবে তাকে আগমন-কক্ষে বসিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকে কি করতে হবে সে আদেশ না দেন।

সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ও ধর্মযাজকরা দরবার কক্ষে এসে পৌঁছলেন। তত্ত্বাবধায়ক ও নওশেরওয়াঁ রাজার হুকুমানুযায়ী কাজ করলেন। নওশেরওয়াঁ দরবারে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি পদস্থ ব্যক্তিদের ও ধর্মযাজকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনাদের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে আমাকে সত্যিকারভাবে জবাব দিন।' তাঁরা বললেন, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য।' তখন তিনি বললেন 'আযারবাইজানের সেনাপতির (অমুক নাম) সম্পত্তির পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রায় কত হবে?' তাঁরা বললেন, 'সম্ভবতঃ তার ২০,০০,০০০ দিনার আছে যা তার দরকার নাই।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তার অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কত?' তাঁরা বললেন, 'স্বর্ণ এবং রৌপ্যের জিনিস মিলে ৫,০০,০০০ দিনারের মত হবে।' তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মণিমাণিক্যের পরিমাণ কত হবে?' তাঁরা বললেন, '৬,০০,০০০ দিনারের মূল্যের সমান হবে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'জমিজমা ও ভূসম্পত্তি ও কারখানার পরিমাণ কত?' তাঁরা বললেন, 'খোরাসান, ইরাক, পার্স ও আযারবাইজানে এমন কোন জেলা

বা শহর নাই যেখানে তার এক ডজন কল-কারখানা, ভূ-সম্পত্তি, সরাইখানা, মিঠা পানির গোছলখানা ও কৃষিক্ষেত্র নাই।' তিনি বললেন, 'তার কতগুলো ঘোড়া ও খচ্চর আছে?' তারা বললেন, 'তিরিশ হাজার।' তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তার ভেড়ার সংখ্যা কত?' তাঁরা বললেন, 'দুই লক্ষ।' তিনি বললেন, 'উটের সংখ্যা কত?' তাঁরা বললেন, 'তিরিশ হাজার।' তিনি বললেন, 'ক্রীতদাস ও ঠিকা লোকের সংখ্যা কত?' তাঁরা বললেন, তার ১৭০০ শত তুর্কী, রুমি ও আবিসিনিয়ান ক্রীতদাস আছে আর ৪০০ শত আছে ক্রীতদাসী।' তখন তিনি বললেন, 'এখন একজন লোকের এতসব সম্পত্তি আছে যে প্রত্যেক দিন মেষশাবক, মিষ্টান্ন ও প্রচুর বিভিন্ন খাদ্য সংমিশ্রণের তিরিশ রকমের খাবার খায়, অন্যদিকে একজন ধর্মনিষ্ঠ, দুর্বল, বন্ধুহীন, অসহায় লোক যার সারা দুনিয়ায় শুধুমাত্র খাবার জন্য দুই টুকরো শুকনো রুটি আছে যার একটি সে সকালে খায় আর অন্যটি খায় রাত্রে। এই অবস্থায় ধনী লোকটি যদি অন্য লোক-টির রুটি দুইখানা অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয় এ ং তার একমাত্র সম্বল থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তবে তার কি শাস্তি পাওয়া উচিত?' সকলেই বলল, 'তাকে সব রকমের শাস্তি দেওয়া উচিত। আর তাকে সম্ভাব্য সব রকমের শাস্তি দিলেও সেটা পুরা ন্যায় বিচার হবে না।' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'আপনাদের মত লোক আমি এখনই চাই ঐ লোকের গায়ের ছাল তুলে ফেলার জন্য। তার গায়ের মাংস কুকুরকে দিয়ে দাও আর তার চামড়া খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাজ প্রাসাদের দ্বারে টাঙিয়ে রাখ। তারপর এক সপ্তাহের জন্য রাজ-দরবারে ঘোষণা করে দাও যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচার করে এমন কি যদি এক বোঝা খড়, একটা মুরগী অথবা কিছু পরিমাণ ঘাসও অন্যের কাছ থেকে না বলে নিয়ে যায় এবং তার থেকে যদি দরবারে কোন নালিশ আসে, তাহলে তার এই লোকটার দশাই হবে।' তারা নওশেরওয়াঁর আদেশ মত কাজ করল।

তিনি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে আনার জন্য সহিসকে আদেশ দিলেন এবং সম্ভ্রান্তদের তখন বললেন, 'এই হোল বাদী পক্ষ আর অত্যাচারী ত তার কৃতকর্মের শাস্তি পেয়েছেই।' তখন যে ভৃত্যকে আযারবাইজানে পাঠান হয়েছিল তাকে বললেন, 'হে ভৃত্য, তোমাকে আমি কিজন্য আযার-বাইজানে পাঠিয়েছিলাম?' ভৃত্য বলল, 'এই বৃদ্ধা মহিলার ঘটনা তদন্ত করে তার নালিশ সম্পর্কে সত্যিকার খবর আনার জন্যে।' তখন নও-শেরওয়াঁ বললেন, এর উদ্দেশ্য হল 'যাতে তোমরা জানতে পারো যে আমি

খেয়াল-খুশী মাফিক শাস্তি দেই নাই। এরপরে শুধু অস্ত্র দিয়েই অত্যাচারীদের শাস্তি দিব, নেকড়ে বাঘের হাত থেকে ভেড়া-ভেড়ীদের রক্ষা করব, অর্থলোভীদের দমন করব। আমি দুনিয়া থেকে পাপীদের বিদূরিত করে দিব এবং ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করব। আর একাজ সমাধা করার জন্যইত আমার জন্ম। মানুষের ইচ্ছামতই যদি কাজ চলতে পারত তাহলে আর আল্লাহ্ মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য রাজা-বাদশাহ্‌দের সৃষ্টি করতেন না। তাই তোমরা এখন থেকে আর এমন কাজ কোর না যাতে তোমাদেরও এই পাপী লোকটার মত ফল ভোগ করতে হয়।' বাদশাহ্‌র বিচার দেখে উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। বাদশাহ্ তখন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'তোমার প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করেছিল তাকে আমি শাস্তি দিয়েছি এবং যে বাসগৃহ ও বাগানের মধ্যে তোমার জমিখণ্ড সংলগ্ন আছে তার মালিক এখন তুমি। আমি তোমাকে নিরাপদে তোমার বাড়ীতে পৌঁছাবার জন্য সঙ্গে প্রাণী ও টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তবে আমি আশা করি তুমি নামাযের সময় আমার নাম স্মরণ করবে।' তিনি সঙ্গীদের সম্বোধন করে তখন বললেন, 'কেন আমার প্রাসাদের দ্বার অত্যাচারিতদের জন্য বন্ধ থাকে আর অত্যাচারীদের জন্য থাকে খোলা? সৈনিকরা এবং কৃষক সম্প্রদায় সকলেই আমার অধীনস্থ কর্মচারী; শ্রমজীবী তথা কৃষক সম্প্রদায় দাতা আর সৈনিকরা গ্রহীতা। সুতরাং গ্রহীতাদের চেয়ে দাতাদের জন্য পথ প্রশস্ত হওয়া উচিত। কোন ব্যক্তি নালিশ নিয়ে আসলে তাকে আমার কাছে এসে তার বক্তব্য পেশ করতে না দেওয়ার রীতির অন্যায় এখন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বৃদ্ধাকে যদি আমার কাছে রাজ-দরবারে ঢুকতে দেওয়া হোত তাহলে তার শিকার-ক্ষেত্রে যাবার প্রয়োজন হোত না।' তখন বাদশাহ্ হুকুম দিলেন যে একটা ঘণ্টার সঙ্গে শিকল লাগিয়ে এমন ভাবে বেঁধে রাখতে হবে যে তা যেন সাত বছরের একটা ছেলেও নাগাল পেতে পারে যাতে এর পরে কোন লোক রাজ-দরবারে নালিশ নিয়ে আসলে কোন তত্ত্বাবধায়ককে না ডেকে শিকল টেনে ঘণ্টা বাজালেই চলে। বাদশাহ্ ঘণ্টা শুনবেন এবং বিচারপ্রার্থীদের বিচার করবেন। পরে তাই করা হয়েছিল।

আমীর ও সেনাপতিরা রাজপ্রাসাদ থেকে বাড়ী ফিরেই যার যার নায়েবদের ও অধীনস্থদের ডেকে বলে দিল, 'দেখ এই দু'বছর তোমরা অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক লোকের ক্ষতি করেছ, তাদের রক্তপাত ঘটিয়েছ

যা মাতাল হয়ে বা সুস্থ অবস্থায় তাদের প্রতি কত যুলুম করেছ। কিন্তু আমাদের সকলের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং অত্যাচারিতদের রাজদরবারে গিয়ে নালিশ করবার পূর্বেই সন্তুষ্ট করতে হবে।' সকলেই সম্মত হয়ে বিনীতভাবে অত্যাচারিতদের ডেকে পাঠাল অথবা তাদের বাড়ীতে গিয়ে প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের সন্তুষ্ট করল।

তারা ওদের কাছ থেকে লিখিত ওয়াদাপত্র নিল এই মর্মে যে, অমুক লোক অমুক লোক থেকে সন্তোষজনক ব্যবহার পেয়েছে এবং ওদের আর কোন দাবী নাই। একমাত্র ঐ একটা বিচার দ্বারা নওশেরওয়াঁ সমস্ত রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন, সব অত্যাচার বিদূরিত করলেন এবং সমগ্র রাজ্যে এত শান্ত পরিবেশ ছিল যে সাত বছর ধরে রাজ-দরবারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন নালিশ আসে নাই।

সাত বছর পরে একদিন বিকালে যখন রাজপ্রসাদ খালি, সকলে বিদায় নিয়েছে এবং প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময়ে ঘণ্টা বেজে উঠল। নওশেরওয়াঁ ঘণ্টা শুনেই দু'জন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলেন দেখতে কে নালিশ নিয়ে এসেছে। তারা প্রাসাদ-তোরণে এসে দেখল একটি বৃদ্ধ এবং মামড়ি-পড়া গাধা তার পিঠ দিয়ে শিকল ঘষছে। ভৃত্যরা তখন রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'নালিশ নিয়ে কেউ আসে নি। একটা মামড়ি-পড়া গাধা এসে তার পিঠে শিকল ঘষছে।' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'হে বোকারা, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ভালভাবে দেখলে বুঝতে পারবে যে গাধাটাও বিচার প্রার্থী হয়ে এসেছে। আমার মনে হয় তোমরা দু'জনে গাধাটাকে নিয়ে বাজারের মাঝে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ কর এবং পরে আমাকে জানাও।' ভৃত্যরা গাধাটাকে নিয়ে বাজারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে কেউ গাধাটা সম্পর্কে কিছু জানে কিনা। সকলেই বলল, 'আল্লাহ্‌র রহমতে এই শহরে খুব কম লোক আছে যারা এই গাধা সম্পর্কে জানে না।' তারা বলল, 'গাধাটা সম্পর্কে তোমরা কি জান?' লোকে জবাব দিল, 'গাধাটা একজন ধোপার এবং প্রায় বিশ বছর ধরে দেখছি যে সে প্রত্যেক দিন গাধার পিঠে করে লোকের কাপড় বহন করে আনত এবং বৈকালে সেগুলো আবার ফেরত দিয়ে আসত। যতদিন পর্যন্ত গাধাটা জোয়ান ছিল এবং কাজ করতে পারত ততদিন মালিক তাকে খাবার দিত। কিন্তু এখন গাধাটা বৃদ্ধ হওয়ায় আর কাজ করতে পারে না তাই সে এর দাবী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে।

প্রায় দেড় বছর হতে চলল সে গাধাটাকে ছেড়ে দিয়েছে। গাধাটা রাত-দিন শহরের রাস্তাঘাট, বাজার ও বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। লোকে দয়া করে ওটাকে খেতে দেয়। কিন্তু দুই দিন যাবৎ ওটা কোন খাবার না পেয়ে এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করছে।'

যেহেতু ভৃত্যদ্বয় সকলের কাছ থেকেই ঐ একই কথা শুনল তারা কালবিলম্ব না করে রাজার কাছে গিয়ে সব খুলে বলল। নওশের-ওয়াঁ বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে গাধাটা বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছে? আজ রাত্রে গাধাটার দেখা-শোনা কর এবং আগামীকাল ঐ ধোপাকে তার বাড়ীর আরো চার জন মুরব্বি ধরনের লোকসহ আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি প্রয়োজন মত তাকে শাস্তি দিব।' পরের দিন ভৃত্যরা আদেশমত কাজ করল। তারা গাধাটাকে এবং ধোপাকে চারজন মুরুব্বি ধরনের লোকসহ রাজ-দরবারে এনে হাযির করল। নওশেরওয়াঁ তখন ধোপাকে বললেন, 'যতদিন এই গাধাটা জোয়ান ছিল এবং তোমার কাজ করতে পারত ততদিন তুমি ওকে খেতে দিতে এবং ওর দেখাশুনা করতে আর এখন যেহেতু ওটা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তোমার কাজ করতে পারে না তুমি তার খাবার বন্ধ করে দিয়ে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু তার বিশ বছরের কাজের পুরস্কার কোথায়?' বাদশাহ্ তখন লোকটাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, 'যতদিন এই গাধাটা জীবিত থাকবে প্রত্যহ এই চারজন লোকের সামনে তোমাকে সে যতটা খড় এবং বালি খেতে পারে তা দিতে হবে। তুমি যদি তা না দাও এবং তা আমি জানতে পারি তাহলে আমি তোমাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে যে রাজারা সবসময়ই দুঃস্থদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং তার কর্মচারী, জমির তত্ত্বাবধানকারী এবং ভৃত্যের কাজের উপর লক্ষ্য রাখেন যাতে তাঁরা এই দুনিয়ায় সুনাম পান এবং পরকালে পান মুক্তি।'

প্রতি দুই তিন বছর অন্তর রাজস্ব আদায়কারী এবং জমির তত্ত্বাবধায়কদের বদল করা উচিত যাতে তারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে ত্রাসের সৃষ্টি করতে না পারে। তাহলে তারা কৃষকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রদেশ উন্নত থাকবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিচারক, ধর্মপ্রচারক ও পরিদর্শক এবং তাদের কার্যাবলীর গুরুত্ব

দেশের প্রত্যেক বিচারক সম্পর্কেই পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ সকলেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করার উপযুক্ত নয়। শুধুমাত্র বিদ্বান, ধর্মভীরু ও অর্থলোভহীন ব্যক্তিদেরই বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত রাখা উচিত। আর যে সমস্ত বিচারকদের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ নাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই করে যোগ্যতর ব্যক্তিদের দ্বারা শূন্যপদগুলো আবার পূরণ করা উচিত। যোগ্যতা অনুসারে বিচারক-দের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিলে অসৎ পথ অবলম্বনের তাদের আর কোন অজুহাত থাকবে না। বিচারকদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী, কেননা মুসলমানদের জীবন ও বিষয় সম্পত্তি তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। যদি কোন বিচারক তাদের খেয়াল খুশিমত বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে কোন বিচারে রায় দেয় অথবা কাউকে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে অন্যান্য বিচারকদের উচিত তখনই রাজ্য-প্রধানকে ঐ বিচারক সম্পর্কে জ্ঞাত করে দেওয়া। ঐ বিচারককে অবশ্যই চাকরি থেকে বরখাস্ত এবং শাস্তিদান করতে হবে।

দরবারের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে অন্যান্য কর্মচারীদেরও বিচারকের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। যদি কোন কর্মচারী তার পদমর্যাদার দোহাই দিয়ে অথবা অন্য কোন অজুহাত দেখিয়ে দরবারে হাযির না হয় তবে তাকে জোরপূর্বক দরবারে হাযির হোতে বাধ্য করতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সময়ে সাহাবীরাও অন্য কারও উপর ভার না দিয়ে নিজেরা ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থেকে ন্যায়বিচারে সাহায্য করতেন। ফলে আইনের বরখেলাফ বা অন্যায় কিছু হতে পারত না। হযরত আদমের (আঃ) সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগে সকল দেশ ও জাতিই ন্যায়নীতি, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছে। আর এপথে যারা সফল হতে পেরেছে তারা কালের গতিতে ততবেশী স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

শোনা যায় পারস্য দেশে অনেক সময় এই প্রথা চালু ছিল যে মিহিরজান (শারদীয় উৎসব) ও নওরোয (নববর্ষ উৎসব) উৎসবে রাজা

জনসাধারণের আবেদনাদি শোনার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। সেই বিচারে কোন নগণ্যতম ব্যক্তিও বাদ পড়ত না। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্বেই জনসাধারণকে ঘোষণা জারী করে ঐ নির্দিষ্ট দিনের কথা জানিয়ে দেওয়া হোত যাতে তারা যার যার নালিশের জন্য সবকিছু যোগাড় করে ঠিকমত নির্দিষ্ট দিনে তা রাজ-দরবারে পেশ করতে পারে। যখন বিচারের দিনটি আসত, রাজঘোষক বাজার-তোরণে দাঁড়িয়ে সজোরে ঘোষণা করতো, 'আজ যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার অভিযোগ পেশ করতে বাধা দেয় তাহলে রাজা তার প্রাণ নিতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না'। রাজা তখন প্রত্যেকের নালিশ সামনে রেখে এক এক করে দেখতে থাকতেন। তিনি যখনই নিজের বিরুদ্ধে কোন নালিশ পেতেন তখনই আসন ছেড়ে সামনে এসে মুবাদ মুবাদান (প্রধান বিচারপতি)-এর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলতেন, 'মহামান্য বিচারক, সকলের আগে আমার ও এই ব্যক্তির বিচার পক্ষপাতহীনভাবে ও নির্ভিকচিত্তে সম্পন্ন করুন।' তখন যাদের নালিশ রাজার বিরুদ্ধে তাদের এক পার্শ্বে বসবার নির্দেশ দেওয়া হোত, কারণ তাদের বিচার সকলের আগে সম্পন্ন হোত।

তখন রাজা বিচারপতিকে বলতেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে রাজার পাপের চেয়ে বড় পাপ আর নাই। রাজার জন্য আল্লাহ্‌র মহিমা স্মরণ করার উপযুক্ত উপায় হোল তার প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে নযর দেওয়া, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা এবং অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা। যখন রাজা নিজেই স্বেচ্ছাচারী হয় তার রাজ্যে পারিষদদের সকলেই তখন নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করে।. তারা তখন আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়, ভুলে যায় আল্লাহ্‌র অপরিসীম দানকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি নারায হন এবং পৃথিবীও তাদের পাপে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। ধর্মভীরু মুবাদ (বিচারপতি), সাবধান তোমার বিবেকের বাইরে যেও না, আমার প্রতি অনুগ্রহ কোর না। যদি কর, তাহলে আমার কোন কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হতে হলে আমি তোমাকেই দায়ী করব।' মুবাদ তখন দুই পক্ষের মতামত শুনে বিচারের পূর্ণ রায় দিতেন। যদি কেউ রাজার বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করত এবং তার পক্ষে যদি কোন প্রমাণ না থাকত তবে তাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হোত। এবং ঘোষণা করে দেওয়া হোত যে তাকে রাজা ও রাজ্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করার দুঃসাহসের জন্যই শাস্তি দেওয়া হোল। রাজার বিচারের পালা শেষ হলে রাজা আবার তাঁর সিংহাসনে গিয়ে বসতেন এবং তাঁর পাত্র-মিত্রদের

সম্বোধন করে বলতেন, 'এই কারণেই আমি নিজেকে দিয়ে বিচার কার্য শুরু করেছি যে তোমাদের মধ্যে কারো যদি কোন দুরভিসন্ধি থেকে থাকে তবে তা দমন করা দরকার। এখন তোমাদের মনে কোন অশান্তি থাকলে তার সন্তোষজনক প্রতিকার করার চেষ্টা করা যাক।' ঐদিন রাজার কাছে সর্বাপেক্ষা আপনজনও পর এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও দুর্বল বলে গণ্য হোত।

আর্দাসির বাবাকান থেকে শুরু করে ইয়াজদিজিরদ পর্যন্ত এই প্রথা বলবৎ ছিল। কিন্তু ইয়াজদিজিরদই তাঁর পূর্বপুরুষের আইন অমান্য করতে শুরু করেন। তাঁর সময় থেকেই দুনিয়াতে অবিচার শুরু হয় এবং তিনিই প্রথম কালাকানুনের প্রবর্তন করেন। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যায় এবং রাজার প্রতি তাদের অভিশাপও বাড়তে থাকে। অতি নাটকীয়ভাবে এই অবস্থার অবসান ঘটে। হঠাৎ একদিন একটা চালকহীন ঘোড়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে। ঘোড়াটার আকৃতি এত সুন্দর ছিল যে রাজপ্রাসাদের অমাত্যবর্গ সকলেই মুগ্ধ হয়ে ওটাকে ধরতে চেষ্টা করে কিন্তু কেউ সক্ষম হয়নি। অবশেষে ঘোড়াটা ইয়াজদিজিরদের সামনে এসে থেমে যায়। ইয়াজদিজিরদ্ ঘোড়াটাকে দেখে বললেন, 'তোমরা সবাই নিরস্ত হও; এটা হয়ত আল্লাহ্ আমাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। ইয়াজদিজিরদ্ সিংহাসনে ছেড়ে আস্তে আস্তে ঘোড়াটার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং এক সময় ঘোড়াটার কেশর ধরে বসলেন। তিনি ঘোড়াটার মাথায় হাত বুলালেন ও পিঠে আদর করলেন। ঘোড়া মোটেই নড়ল না বরং শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা তখন লাগাম ও জিন দিয়ে আনতে বললেন। তিনি ঘোড়ার লাগাম বেঁধে বেল্টটা একটু কষে আসনটা পেতে দুমচিটা লেজের কাছে স্থাপন করেছেন এমন সময় ঘোড়াটা হঠাৎ সোজা রাজার হৃদপিণ্ডের উপর একটা লাথি মারল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে তখনই মারা যান। আর ঘোড়াটাও কালবিলম্ব না করে কেউ তাকে থামানোর পূর্বেই দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। কোথা থেকে ঘোড়াটা এসেছিল এবং কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানতে পারেনি। তবে সকলের ধারণা যে, এটি ছিল তাদেরকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত ফেরেশতা।

কথিত আছে, 'উমারা ইবনে হামজা বিচারের দিন আবু দাওয়ানিকের (খলীফা আল মনসুরের ডাকনাম) সঙ্গে বসেছিলেন। অত্যাচারিতদের একজন উঠে নালিশ করল, 'উমারা জোরপূর্বক তার জমি

দখল করেছে।' খলীফা তখন উমারাকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে তোমার বিপক্ষকে মোকাবেলা করে তোমার পক্ষে তোমার যুক্তি পেশ কর।' উমারা বললেন, 'আমি এই লোকটির বিপক্ষ নই। জমিটা যদি আমার হয় তবে আমি তাকে এটা উপহার দিচ্ছি। খলীফা সসম্মানে আমাকে যেখানে বসিয়েছেন সেখান থেকে আমি উঠতে চাই না বা একখণ্ড জমির জন্য আমি আমার সম্মানকে বিসর্জন দিতে চাই না।' তাঁর মহানুভবতায় উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হোল।

এটা জানা দরকার যে, রাজার নিজেরই বিচারের রায় দেওয়া উচিত এবং বিরোধীদলের বক্তব্যও তাঁর নিজেরই শোনা উচিত। রাজা যদি তুরস্কদেশের বা পারস্যদেশের হন অথবা এমন একজন হন যিনি আরবী পড়তে পারেন না এবং মুসলিম আইনের আদেশপত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহলে তাঁর বিচারকার্য পরিচালনা করবার জন্য একজন প্রতিনিধি অবশ্যই দরকার। আর বিচারকরাই রাজার প্রতিনিধি এবং এই কারণেই রাজার বিচারকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত। তাছাড়া বিচারকদের মান-মর্যাদা ভর্ৎসনার ঊর্ধ্বে থাকা উচিত, কারণ তারাই খলীফার সহচর এবং তাঁর সমগোত্রীয়। আর তারা ত রাজার দ্বারাই নিযুক্ত এবং তাঁর প্রতিনিধি।

এমনিভাবে যে সমস্ত ধর্মপ্রচারকরা মসজিদে মসজিদে নামায পড়ায় তাদেরও তাদের আল্লাহ্-ভক্তি ও জ্ঞানের জন্য রাজার দ্বারা নিযুক্ত হওয়া উচিত। মুসলমানদের নামাযের দিক দিয়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ইমামের (নেতা) উপরই নির্ভর করে নামায। ইমামের নামায না হলে পুরা জামাতের সকলের নামাযই বৃথা হয়ে যায়।

প্রত্যেক শহরে একজন করে পরিদর্শক নিযুক্ত করা উচিত যার কর্তব্য হবে বাজার দর যাচাই করে দেখা এবং ব্যবসা বাণিজ্য সৎপথে এবং সৎভাবে চলছে কিনা, তা দেখা। তার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, দূরবর্তী জেলাসমূহ থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্র আনা হয় সেগুলোতে কোন প্রবঞ্চনা বা অসততা অবলম্বন করা না হয়, ঠিক ওজনে বেচাকেনা হয় এবং ধর্মীয় অনুশাসনগুলো মেনে চলা হয়। রাজা এবং তাঁর অন্যান্য কর্মচারী দ্বারা পরিদর্শকদের ক্ষমতা মজবুত করে তুলতে হবে কারণ এটাও রাজ্যের একটি ভিত্তিভূমি এবং ন্যায় বিচারের একটা দিক। অন্যদিকে রাজা যদি এটাকে অবহেলা করেন তাহলে গরীবদের দুঃখ বেড়ে যাবে, কারণ ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামত কিনবে ও বিক্রি করবে, কম ওজনে বিক্রি হরদম চলবে, অবিচার বেড়ে যাবে তার ফলে খোদার আইনের কোন

গুরুত্ব থাকবে না। পরিদর্শকের পদটা সর্বসময়ই উচ্চবংশীয় কাউকে অথবা কোন খোজাকে অথবা কোন বৃদ্ধ তুরস্কদেশীয় লোককে দেওয়া উচিত—যার কোন মানুষের প্রতি কোন বিশেষ সহানুভূতি না থাকায় সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোক সবাই তাকে একই ভাবে ভয় করে চলবে। এই ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ন্যায়নীতির সঙ্গে চলবে এবং ইসলামের অনুশাসনগুলোও মেনে চলা হবে। নিম্নোক্ত গল্প থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলী নুস্তগীনের মাতলামির গল্প

কথিত আছে যে, সুলতান মাহ্‌মুদ তাঁর সম্ভ্রান্তদের ও স্ফূর্তিবাজ সঙ্গীদের নিয়ে সারারাত মদ খাচ্ছিলেন। মাহমুদের দুই সেনাপতি আলী নুস্তগীন ও মহম্মদ আরবীও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরাও মদ খেয়ে মাহ্‌মুদের সঙ্গে সারারাত জেগেছিলেন। প্রাতঃরাশের সময় আলী নুস্তগীন নিদ্রাহীনতা ও বেশী মদ খাওয়ার দরুন খুব অস্থিরতা অনুভব করছিলেন। তিনি বাড়ী যাবার অনুমতি চাইলেন। মাহমুদ বললেন, 'এ অবস্থায় দিবালোকে তোমার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। এখানেই ভিতরে আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে স্থিরমস্তিক হলে যাবে। তোমাকে এই অবস্থায় পরিদর্শক দেখলে বন্দী করে কশাঘাত করবে। তুমি খুব লজ্জা পাবে এবং আমিও তোমাকে সাহায্য করতে খুব অসুবিধায় পড়ব।' আলী নুস্তগীন ৫০,০০০ সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন এবং ঐ সময়ের সব-চেয়ে জাঁদরেল সেনাপতি ছিলেন। এমনকি তাঁকে এক হাযার সৈন্যের সমতুল্য মনে করা হোত। তাই তিনি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারলেন না যে, পরিদর্শক ঐরূপ কিছু করতে পারে। তিনি অস্থির হয়ে বললেন, 'আমি এই অবস্থায়ই যাচ্ছি।' মাহমুদ বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও, সে চলে যাক।' আলী নুস্তগীন ঘোড়ায় চড়ে অনুচর, ভৃত্যের একটা বিরাট দলসহ রওয়ানা হলেন।

ঘটনাক্রমে পরিদর্শক যখন অশ্বারোহী ও পদাতিক সম্বলিত এক শত লোক নিয়ে বাজারের মধ্যস্থলে উপস্থিত, তখন তিনি আলী নুস্তগীনকে ঐরূপ মাতাল অবস্থায় দেখে লোকজনকে তাঁকে ঘোড়া থেকে নামাতে আদেশ দিলেন। তখন তিনি নিজে ঘোড়া থেকে নেমে নিজ হাতে নিজের দণ্ড দিয়ে আলী নুস্তগীনকে চল্লিশ কশাঘাত মারলেন।

কোনরূপ সম্মান বা শ্রদ্ধা না দেখিয়ে তিনি যখন কশাঘাত করছিলেন, তখন নুস্তগীনের সঙ্গীরা ও ভৃত্যগণ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। কারো কিছু বলবার সাহস ছিল না। ঐ পরিদর্শকটি একজন তুরস্কদেশীয় খোজা ছিলেন। বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ পরিদর্শকটি বহু দিন কাজ করে অনেক অধিকার সঞ্চয় করে নিয়েছিলেন।

পরিদর্শক চলে যাবার পর সঙ্গীরা আলী নুস্তগীনকে তাঁর বাড়ীতে বহন করে নিয়ে চলল। রাস্তায় তিনি বার বার বলতে থাকলেন, 'সুলতানের কথা অমান্য করলে তার শাস্তি এইরূপই হয়।' পরের দিন তিনি রাজ-দরবারে উপস্থিত হলে মাহ্‌মুদ বললেন, 'কিহে, পরিদর্শকের হাত এড়াতে পেরেছিলে?' আলী নুস্তগীন পিঠ ফিরিয়ে তাঁর বেত্রাঘাত-জর্জরিত স্থানটি মাহ্‌মুদকে দেখালেন। মাহ্‌মুদ হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'এখন অনুতাপ কর এবং প্রতিজ্ঞা কর যে মাতাল অবস্থায় আর বাইরে যাবে না।'

যেহেতু দেশে শাসন ও শৃঙ্খলার আইন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ন্যায়নীতির ধারা উপরোক্ত পথ নিয়েছিল।

গাজনাইনের রুটিওয়ালাদের কাহিনী

আমি শুনেছি যে, গাজনাইনের রুটিওয়ালারা একবার তাদের দোকান বন্ধ করে রাখে, ফলে রুটির দাম বেড়ে যায় এবং রুটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। পথিক ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিরুপায় হয়ে সুলতান ইব্রাহীমের নিকটে রুটিওয়ালাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে। তিনি তখন সকল রুটি-ওয়ালাকে তাঁর কাছে ডেকে আনতে হুকুম দিলেন এবং তাদের বললেন, 'তোমরা কেন রুটি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছ?' তারা তখন বলল, 'হুযূর, যে সমস্ত আটা-ময়দা শহরে আসে তার সবই এখন আপনার নিজস্ব রুটিওয়ালা কিনে নিয়ে গুদামজাত করে। সে বলে যে, এটা তার প্রতি হুকুম এবং সেই কারণে সে আমাদের এক মণও কিনতে দেয় না।' সুলতান তখনই তাঁর নিজস্ব রুটিওয়ালাকে হাতীর পায়ের তলে ফেলে মারতে হুকুম দিলেন। সে মরে গেলে তারা তাকে একটা হাতীর দাঁতের সাথে বেঁধে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে ঘোষণা করে দিল, 'কোন রুটিওয়ালা তার দোকান না খুললে আমরা তাকে এইরূপ শাস্তিই দিব।' তারা তখন সুলতানের রুটিওয়ালার ভাণ্ডারজাত আটা-ময়দা সকল রুটিওয়ালাদের বণ্টন করে দিল। মগরেবের নামাযের মধ্যেই প্রতি দোকানে পঞ্চাশ মণের মত রুটি উদ্বৃত্ত রয়ে গেল এবং সবগুলো কেনার মত প্রচুর খরিদ্দার ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

কর আদায়কারী, বিচারক, পুলিশ-প্রধান এবং নগরাধ্যক্ষদের আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের উপর নযর রাখা

প্রত্যেক শহরে কে ধর্মীয় ব্যাপারে মনোযোগী, কে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, কে স্বার্থপর নয় ইত্যাদি তদারক করার জন্য লোক থাকা দরকার। সেই সমস্ত লোকদের এইভাবে সম্বোধন করা উচিত, 'আমরা তোমাদের এই শহর ও উহার অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিযুক্ত করেছি। আল্লাহ্ আমাদের কাছে যা-কিছু চাইবেন তার জন্য আমরা তোমাদের দায়ী করব। আমরা চাই যে, তোমরা কর আদায়কারী, বিচারক, পুলিশ-কর্তা ও পরিদর্শকের জনগণের সঙ্গে আচরণের ছোট বড় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করে সদা-জ্ঞাত থেকে আমাদের সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দাও যাতে আমরা যুক্তিযুক্তভাবে আদেশ দিতে পারি। তোমরা তোমাদের তথ্য গোপন রাখ বা প্রকাশ করে দাও তাতে কিছু এসে যাবে না।' সৎ প্রকৃতির লোকেরা যদি এই প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণ করতে রাযী না হয় তবে এটা সমর্থন করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে হবে।

কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহের একজন ন্যায়পরায়ণ আমীর ছিলেন। নিশাপুরস্থ তাঁর কবর আমি দেখেছি। ওখানে সর্বদাই লোকসমাগম থাকে। সকলেই প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্ সর্বদাই তা মেনে নেন। আবদুল্লাহ ইবনে তাহের সাধারণতঃ এমন লোককে তাঁর কর্মচারী নিযুক্ত করতেন যারা ভক্তিমান, ধার্মিক এবং যাদের পার্থিব কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকত না ও নিজেদের স্বার্থ নিয়ে মগ্ন থাকত না। তার ফলে ঠিকমত রাজস্ব আদায় হোত, কৃষকদের কোন অসুবিধা হোত না এবং তাঁর নিজেরও কোন অসুবিধা হোত না।

আবূ আলী দাক্কাক (দশম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মরমী) একদিন আমীর আবূ আলী ইলিয়াসের (তাঁর সময়ে কিরমানের আমীর ছিলেন—খোরাসানের নয়) সঙ্গে দেখা করতে যান। শেষোক্ত জন খোরাসানের সেনাপতি ও গবর্নর হওয়া সত্ত্বেও খুব বেশী ধার্মিক ছিলেন। আবূ আলী দাক্কাক আবূ আলী ইলিয়াসের সামনে এসে নতজানু হলে তিনি বললেন, 'আমাকে সৎ উপদেশ দাও।' তিনি বললেন, 'হে আমীর,

আপনি কি আমার একটা প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিবেন?' আমীর বললেন, 'নিশ্চয়ই।' তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি সোনা বেশী পছন্দ করেন না আপনার শত্রুকে বেশী পছন্দ করেন?' আমীর জবাব দিলেন, 'সোনা'। তখন তিনি বললেন, 'তাহলে এটা কেমন হয় যে আপনি যেটাকে বেশী ভালবাসেন (সোনা) সেটা পিছনে ফেলে যাবেন আর যেটাকে ভালবাসেন না (শত্রু) তাকে সঙ্গে করে পরকালে নিয়ে যাবেন?' শুনে আবু আলী ইলিয়াসের চোখে পানি এল। তিনি বললেন, 'তোমার সৎ উপদেশের দ্বারা তুমি আমাকে অবহেলার তন্দ্রা থেকে জাগিয়েছ। তোমার কথাগুলো সব দর্শনের মূলকথা এবং তার দ্বারা দু'কূলেই লাভবান হব।'

সুলতান মাহমুদের কুদর্শনীয়তার গল্প

কথিত আছে যে, গযনীর সুলতান মাহ্মুদের চেহারা খুব ভাল ছিল না। তাঁর মুখাবয়ব ছিল কুঁচকানো, চামড়া ছিল শুষ্ক, ঘাড় ছিল লম্বা, নাসিকা ছিল উন্নত আর দাড়ি ছিল পাতলা। তিনি কাদামাটি খেতেন বলে তাঁর গায়ের রং ছিল পীতবর্ণ। তাঁর পিতা সবুক্তিগিনের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসেন এবং হিন্দুস্থান তাঁর অধীনে আসে। তাঁর সিংহাসনে বসার পর একদিন ভোরবেলা তিনি জায়নামাযে বসে নামায পড়ছিলেন, তাঁর সামনে ছিল আয়না ও চিরুনী এবং দু'জন ভৃত্য অপেক্ষারত ছিল। এমন সময়ে তাঁর মন্ত্রী শামস আল কুফাত আহমদ ইবনে হাসান ঘরে প্রবেশ করে মাথা নত করে সালাম জানালেন। মাহ্মুদ তাঁকে বসতে ইঙ্গিত দিলেন। নামাযের পরে তিনি টুপি, ঘড়ি ও জুতা পরে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে উল্লসিত হয়ে আহমদ ইবনে হাসানকে বললেন, 'তুমি কি জান আমার মনে এখন কি চিন্তা আছে?' তিনি বললেন, 'হুযুর আপনিই ভাল জানেন।' মাহমুদ তখন বললেন, 'আমার সন্দেহ হয় যে লোকে আমাকে পছন্দ করে না, কারণ আমার চেহারা সুন্দর নয়। লোকেরা সব সময় সুদর্শন রাজাদের পছন্দ করে।' আহমদ ইবনে হাসান বললেন, 'জাহাঁপনা, আপনি একটা কাজ করলে তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র ও তাদের নিজেদের চেয়েও আপনাকে বেশী পছন্দ করবে এবং আপনি যা হুকুম করবেন তাই করবে।' তিনি তখন জানতে চাইলেন, 'আমাকে কি করতে হবে?' আহমদ ইবনে হাসান বললেন,

'সোনাকে আপনি শত্রু বলে মনে করতে থাকুন তাহলে লোকেরা আপনাকে তাদের বন্ধু হিসাবে গণ্য করবে।' শুনে মাহ্মুদ খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এই শব্দগুলোর মধ্যে নিহিত আছে হাযারো রকমের অর্থ ও লাভ।' তারপর থেকে তিনি উদার ও দানশীল হয়ে এলেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁকে ভক্তি করতে লাগলো, লাগলো তাঁর প্রশংসা করতে এবং তাঁর দ্বারা সুসম্পন্ন হোল অনেক মহান কাজ ও বিরাট বিজয়। তিনি ভারতের সোমনাথে গিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে সঙ্গে করে নিয়ে আসলেন। তিনি সমরকন্দ পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং পরে ইরাক এসেছিলেন। তখন একদিন তিনি আহমদ ইবনে হাসানকে বললেন, 'সোনাকে ঘৃণা করার সঙ্গে সঙ্গেই ইহকাল-পরকাল আমার হাতের মধ্যে এসে গেল এবং পার্থিব জিনিসের প্রতি মোহ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দুই জাহানের কাছেই জনপ্রিয় হয়ে গেলাম।'

তার পূর্বে সুলতান পদবীটা ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে সুলতান মাহমুদই প্রথম সুলতান বলে পরিগণিত। তারপর এটা অবশ্য সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু, জ্ঞান পিপাসী, উদার, সতর্ক, ধর্মবিষয়ে গোঁড়া এবং নিজ বিশ্বাসে নির্ভীক যোদ্ধা। সেটাই ছিল একজন ন্যায়পরায়ণ রাজার রাজত্বের জন্য সর্বোত্তম সময়।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলতেন, 'ন্যায়বিচারই হোল বিশ্বাসের দীপ্তি ও সরকারের ক্ষমতা আর এর মধ্যেই নিহিত আছে ছোট-বড় সকলের উন্নতি।' এটাই সব ভাল জিনিসের মাপকাঠি। কারণ আল্লাহ্ পাক বলেছেন, (কোরআন: ৫৫.৬) 'ন্যায়বিচারই বেহেশ্তের মর্যাদা বাড়িয়েছে এবং সবকিছুর ভারসাম্য রক্ষা করেছে।' অন্যত্র বলেছেন, (কোরআন: ৪২.১৬) আল্লাহ্ সত্যের বাণী দিয়ে এবং ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কোরআন শরীফ নাযেল করেছেন।' তিনিই রাজা হবার সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত যিনি নিজে ন্যায়বিচারের সমঝদার, যাঁর বাড়ীতে জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের খুব সমাদর হয় এবং যাঁর সঙ্গীরা ও প্রতিনিধিরা পরিণামদর্শী ও ধর্মভীরু।

ফুদাইল ইবনে ইয়াদ (বিখ্যাত যোগী যিনি পুরানো অনেক কিছু বলতে পারতেন) প্রায়ই বলতেন, 'আল্লাহ্ যদি আমার প্রার্থনা গ্রহণই করেন তাহলে আমি শুধু একজন ন্যায়পরায়ণ রাজার প্রার্থনাই করব, কারণ রাজার সদগুণের উপর নির্ভর করে তাঁর প্রজাদের মঙ্গল ও দুনিয়ার উন্নতি।'

হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর হাদীসে রয়েছে, 'যাঁরা আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী হয়ে এই দুনিয়ায় ন্যায়বিচার করে, তাঁরা কেয়ামতের দিন মুক্তার আসনে বসবেন।'

ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের নিমিত্ত রাজা সর্বদা সংযমী ও ধর্মভীরু লোকদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করবেন—যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে রাজার কাছে সত্য খবর দিবেন।

তুর্কী আমীর ও আল-মু'তাসিমের কঠোরতার গল্প

আব্বাসীয় বংশীয় খলীফাদের মধ্যে আল-মু'তাসিমের যত বেশী কর্তৃত্ব, মর্যাদা ও ধনসম্পদ ছিল তা আর কোন খলীফার ছিল না। এমনকি, তাঁর যত ক্রীতদাস ছিল তাও আর কারো ছিল না। কথিত আছে যে, তাঁর ৭০,০০০ তুর্কী ভৃত্য ছিল এবং তাদের মধ্য থেকে অনেককেই তিনি আমীর পদে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, তুর্কীদের মত কর্মচারী আর কেউ নাই।

একদিন একজন আমীর তাঁর গোমস্তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি বলতে পার যে বাগদাদে এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী আছে যে আমার সঙ্গে পাঁচ শত দিনার নিয়ে ব্যবসা করতে আসতে পারে? ঐ টাকাটা আমার একান্ত জরুরী এবং ফসলের সময় তা ফেরৎ দিয়ে দেব।' গোমস্তার তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল, সে বাজারে ব্যবসা করে এবং আস্তে আস্তে সে ছয় শত দিনার সঞ্চয় করেছে। তাই সে আমীরকে বলল, 'আমার এক পরিচিত লোক আছে যার অমুক বাজারে দোকান আছে। আমি মাঝে মাঝে তার দোকানে যাই এবং তার সঙ্গে ব্যবসা করি। তার ছয় শত দিনার আছে। আপনি যদি কাউকে দিয়ে তাকে দাওয়াত করে এনে সসম্মানে এখানে রাখেন, সদা-সর্বদা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তাকে মহাসমাদরে আপ্যায়ন করেন এবং টাকার প্রসঙ্গটা তুলেন তাহলে সে আপনার সমাদরে কুণ্ঠিত হয়ে যাবে এবং অস্বীকার করতে পারবে না।' আমীর তা-ই করলেন। তিনি একজনকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'আপনার কাছে আমার বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে, কয়েক মিনিটের জন্য এলে উপকৃত হব।' লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আমীরের বাড়ীতে এসে হাযির হোল। সে কিন্তু আমীরকে আগে

লোকে চিনত না। সে ভিতরে ঢুকেই আমীরকে সালাম করল। তার সালামের জবাব দিয়ে আমীর সহচরদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ইনিই কি সেই ব্যক্তি?' তারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ইনিই সেই ব্যক্তি।' আমীর তখন উঠে লোকটাকে একটা ভাল আসনে বসালেন। তারপর তিনি বললেন, 'জনাব, আমি আপনার মহানুভবতা, নৈতিকতা, সততা এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে এত শুনেছি যে, আপনাকে না দেখেই আমি আপনার গুণে মুগ্ধ হয়ে গেছি। শুনেছি যে, বাগদাদের সমস্ত বাজারের মধ্যে আপনার মত চরিত্রবান ও নীতিবোধপূর্ণ ব্যবসায়ী আর নাই।' তিনি আরো বললেন, 'বাহ্য লৌকিকতার আর কি প্রয়োজন আছে বরং আমাকে আপনার জন্য কিছু করতে দিন। আমি চাই যে আপনি এই বাড়ীকে আপনার নিজের বাড়ী বলে মনে করুন এবং আমাকে আপনার বন্ধু ও ভাই বলে ভাবুন।' আমীরের প্রত্যেক কথায়ই লোকটি মাথা নত করছিল এবং গোমস্তা বলছিল, 'নিশ্চয়ই, এক শ' বার।' কিছুক্ষণ পরে খাবার এল। আমীর লোকটিকে নিজের পার্শ্বেই বসিয়ে তাকে এটা-ওটা ভাল খাবার তুলে দিতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ হলে হাত ধোয়ার পর বাইরের সব লোক চলে গেল। শুধুমাত্র আমীরের অনুচররা রইল। তখন আমীর লোকটির দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি কি জানেন, কি জন্য আপনাকে এখানে এনেছি?' লোকটি বলল, 'আপনিই ভাল জানেন।' আমীর তখন বললেন, 'আপনি জানেন যে এই শহরে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা আমার নগণ্যতম আদেশও অমান্য করবে না। আমি যদি তাদের কাছে পাঁচ অথবা দশ হাযার টাকা চাই, তারা ইতস্ততঃ না করে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবে। কারণ, আমার সাথে ব্যবসা করে তারা প্রচুর লাভ করেছে, কোনদিনই তাদের লোকসান হয় নি। আমি চাই, এখন থেকে আপনার-আমার মধ্যে বন্ধুত্ব হোক এবং লৌকিকতার বালাই না থাকুক। আমার অনেক ঋণদাতা থাকা সত্ত্বেও আমি চাই যে আপনি আমাকে চার-পাঁচ মাসের জন্য এক হাযার দিনার দিয়ে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে ফসলের সময় টাকাটা দিয়ে দিব এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে একটা ভাল পোশাকও উপহার দিব। আমি জানি, আপনার এর চেয়ে বেশী আছে এবং আমাকে নিরাশ করবেন না।' আমীরের কথায় লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল এবং বলল, 'আপনার যা হুকুম কিন্তু আমার ত এক হাযার বা দুই হাযার দিনার নেই। ঊর্ধ্বতনদের কাছে কারো কখনও মিথ্যা বলা উচিত না।

যা সত্য, সেটাই বলা উচিত। আমার মোট মূলধন হোল ছয় শত দিনার। ওটা দিয়েই আমি কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করি এবং বাজারে সামান্য ব্যবসা করি। আর ঐ টাকাটা সঞ্চয় করতে আমার বেশ সময় লেগেছে।' আমীর তখন বললেন, 'আমার ধনাগারে প্রচুর ভাল সোনা রয়েছে কিন্তু ওগুলো আমার বর্তমান কাজের উপযুক্ত নয়। আপনার সঙ্গে ব্যবসা করার আমার আসল উদ্দেশ্য হোল আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। আপনার সামান্য ব্যবসা থেকে আপনি কি লাভ করেন? আপনার ছয় শত দিনার আমাকে দিন আমি আপনাকে সাত শত দিনারের একটা কুপন দিচ্ছি। তাছাড়া বিশ্বাসী সাক্ষীদের সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, ফসলের সময় আমি আপনাকে আপনার পাওনা ছাড়াও একটা ভাল উপহার দিব।' এমন সময় গোমস্তা বলে উঠল, 'আপনি এখনও আমীরকে চিনতে পারেন নি। সারা রাজ্যে তাঁর মত ব্যবসায়-নীতিবাগীশ আর কেউ নেই।' লোকটি বলল, 'আমীর যা হুকুম করবেন আমি তাই করব। আমার যা আছে তা দিতে আমি মোটেই ইতস্ততঃ করব না।' যাই হোক, লোকটি আমীরকে দিনার দিয়ে একটা কুপন গ্রহণ করল।

চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার দশ দিন পরে লোকটি আমীরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মুখে সে কিছুই বলল না। সে মনে মনে ভাবল, 'আমীর আমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমি টাকার জন্য এসেছি।' এইভাবে সে আমীরের সঙ্গে দেখা করে চলল এবং চুক্তির নির্ধারিত তারিখ শেষ হয়ে যাবার দুই মাসের মধ্যে সে আমীরের সঙ্গে দশ বার দেখা করল। আমীর কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে লোকটি তাঁর কাছে কিছু চায় বা তিনি নিজে তার কাছ থেকে কিছু ধার করেছেন। লোকটি যখন দেখল যে আমীর কোন সাড়া-শব্দ দিচ্ছে না, তখন একখানা দরখাস্ত লিখে আমীরের কাছে পেশ করল। তাতে লেখা ছিল, 'আমার এখন টাকাটার প্রয়োজন। তাছাড়া চুক্তির নির্ধারিত দিন থেকে দুই মাস অতিক্রম করে গেছে। সম্ভব হলে দয়া করে গোমস্তাকে আদেশ করুন যেন আমার টাকাটা দিয়ে দেয়।' এর উত্তরে আমীর বললেন, 'আপনি কি মনে করেন যে আমি আপনার কথা ভুলে গেছি? চিন্তিত না হয়ে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন! আমি আপনার টাকা দেবার ব্যবস্থা করছি। আমি সীলমারা ব্যাগে করে একজনকে দিয়ে আপনার টাকা পাঠিয়ে দিব।' লোকটি আরো দুই মাস অপেক্ষা করল, কিন্তু টাকার কোন খোঁজ-খবর পেল না। আরেক দিন সে আমীরের বাড়ীতে গিয়ে আরেকটা দরখাস্ত দিল

এবং নিজেও বলল। আমীর লোকটাকে কিছু রসিকতা করে বিদায় দিল। লোকটা দুই তিন দিন পরে পরেই টাকার জন্য তাগাদা দিতে লাগল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হোল না। এইভাবে আট মাস গত হয়ে গেল।

—

লোকটা দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। সে শহরের লোকদিগকে ধরল তার সহায়তা করার জন্য। সে তখন কাযীর কাছে গেল এবং আমীরকে আদালতে (ইসলামী আইন) ডাকাল। এমন কোন সম্ভ্রান্ত বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিল না যে লোকটির তরফ থেকে আমীরের কাছে বলে নি। কিন্তু কোন ফলই হয় নি। এমনকি, সে কাযীর বাড়ী থেকে পঞ্চাশজন লোককে নিয়েও আমীরকে আদালতে হাযির করাতে পারে নি বা আমীরকে সম্ভ্রান্তদের কথা শোনাতে পারে নি। এমনিভাবে দেড় বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। লোকটি নিরাশ হয়ে পড়ল। সে তখন লাভের টাকাটা বাদ দিয়ে এমনকি মোট অঙ্ক থেকে এক শত দিনার কম নিতেও রাযী হোল। কিন্তু তাতেও কোন ফল হোল না। সে সম্ভ্রান্তদের থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা ত্যাগ করল এবং এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ফাযলুমান্দ মসজিদে গিয়ে কয়েক রাকাত নামায আদায় করল। সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে বলল, 'হে খোদা, তুমি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে আমাকে আমার হৃত অধিকার ফিরিয়ে দাও। অত্যাচারীর থেকে ন্যায়বিচার পেতে সহায়তা কর।' ঘটনাক্রমে এক দরবেশ ঐ মসজিদে বসেছিল। দরবেশটি ঐ লোকটির খেদোক্তি ও বিলাপ শুনতে পেয়ে সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে গেল। লোকটির আন্তরিক বিনীত প্রার্থনা শেষ হলে দরবেশ বলল, 'ওহে শেখ! তোমার কি দুঃখ যে তুমি এত উচ্চস্বরে বিলাপ করছ? তোমার কি হয়েছে আমাকে বল।' লোকটি বলল, 'আমার দুঃখ এত বেশী যে কোন লোককে বললে কোন ফায়দা হবে না। একমাত্র আল্লাহ্ আমার দুঃখ লাঘব করতে পারেন।' দরবেশ তখন বলল, 'তবু তুমি আমাকে বল। আমি নিশ্চয়ই তোমার কিছু করতে পারব।' লোকটি শুনে বলল, 'হে দরবেশ! আমি শুধু খলীফার কাছেই আমার আরযি পেশ করি নাই। তাছাড়া আমি আমীর, উযীর, কাযী সকলের কাছেই গিয়েছি, কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় নি। আমি আপনাকে বললে তাতে কি লাভ হবে?' দরবেশ বলল, 'আমাকে বললে তোমার কোন মঙ্গল নাও হতে পারে, কিন্তু তাতে কোন অমঙ্গলও হবে না। তুমি কি প্রবাদটি শোন নি? "তোমার যদি কোন অসুবিধা

থাকে তবে যার সঙ্গে দেখা হয় সকলকেই বল; হয়ত নগণ্যতম ব্যক্তির কাছ থেকে তোমার সমাধান মিলতে পারে।'' তুমি তোমার অসুবিধাটা আমাকে বললে হয়ত একটু সান্ত্বনা পেতে পার, কিন্তু না বললে ত তোমার বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে না।' লোকটি শুনে মনে মনে ভাবল, 'দরবেশ ঠিকই বলেছে।' তখন সে দরবেশকে সব খুলে বলল।

লোকটির কাহিনী শুনে দরবেশ বলল, 'যেহেতু তুমি আমার কাছে তোমার দুঃখের কথা বলেছ, সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা সমাধান হয়ে গেছে। চিন্তা কোর না। আমার কথামত কাজ করলে আজই তুমি তোমার টাকা পেয়ে যাবে।' লোকটি তখন জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কি করতে হবে?' দরবেশ বলল, 'শহরের কোন এক জায়গায় একটা মিনারওয়ালা মসজিদ আছে। মসজিদের পার্শ্বেই একটা গেট আছে এবং গেটের পিছনে একটা দোকান আছে। দোকানে দেখবে একজন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত বৃদ্ধ লোক তাঁবু সেলাই করছে। তাঁর সঙ্গে দুই তিনটা বালকও সেলাই করছে। এখনই ঐ দোকানে গিয়ে বৃদ্ধ লোককে সালাম করে তাঁর সামনে বসে তাঁকে সব খুলে বল। তোমার বাসনা পূরণ হলে নামাযের মধ্যে আমাকে স্মরণ করো। যা বললাম এখনই কর, বিলম্ব কোর না।' লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে মনে মনে ভাবল, 'এটা কি করে হয়! আমি সব আমীর ও সম্ভ্রান্তদের কাছে অনুরোধ করেছি, তাঁরাও আমার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কিছু করতে পারেন নাই, আর এই দরবেশ আমাকে একটা সাধারণ বৃদ্ধ লোকের কাছে পাঠাচ্ছে এই বলে যে, তাঁর কাছে গেলে আমি আমার কাম্যবস্তু পাব। এটা একটা তামাসার মত মনে হয়, কিন্তু কি আর করব? যাই হোক, আমি ওখানে যাবই। এতে আমার কোন মঙ্গল না হলেও কোন ক্ষতি ত আর হবে না।' সে তাই করল। মসজিদের গেট দিয়ে দোকানে ঢুকে লোকটিকে সালাম করে তাঁর সামনে বসল। বৃদ্ধ লোকটি সেলাই করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেলাই বন্ধ করে আগন্তুককে বলল, 'আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?' লোকটি তাঁকে তার কাহিনী খুলে বলল।

সব বৃত্তান্ত শুনে বৃদ্ধ দরজি বললেন, 'আল্লাহ্‌ই তাঁর বান্দাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। আমরা শুধু তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি। তাই আমিও তোমার পক্ষ থেকে তোমার খাতকের কাছে আরযি পেশ করছি। তবে আমি আশা করি যে, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করবেন আর তুমি তোমার জিনিস পাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।' তখন বৃদ্ধ দরজী শিক্ষা-

নবিশদের একজনকে বললেন, 'এখন সেলাই বন্ধ করে অমুক আমীরের বাড়ীতে যাও। আমীরের নিজস্ব কামরার দরজার সামনে অপেক্ষা করবে এবং কাউকে আসতে অথবা ভিতর থেকে বের হতে দেখলে বলবে যে, অমুক দরজীর শিক্ষানবিস আমীরকে একটা সংবাদ দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাকে ভিতরে ডাকলে আমীরকে সালাম করে বলবে, ''আমার মনিব আমাকে এই নালিশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন যে, তাঁর কাছে একটা লোক আপনার বিরুদ্ধে একটা নালিশ নিয়ে এসেছে। লোকটার কাছে আপনার সইকরা একটা সাত শত দিনারের কুপন আছে, কিন্তু নির্ধারিত তারিখের পরও এখন আঠারো মাস চলছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, লোকটির পুরা টাকাটা এখনই পরিশোধ করে দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দিন। দেরী বা অন্যথা না হয়।'' উত্তরটা আমাকে অতি শীঘ্র এনে দেবে।'

ছেলেটি দেরী না করে আমীরের বাড়ীতে চলে গেল। কিন্তু আমি (ঋণদাতা লোকটি) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, কারণ দরজী যেভাবে ছেলেটিকে দিয়ে আমীরকে খবর পাঠিয়েছে সেভাবে কোন রাজা তার ক্রীতদাসকেও পাঠায় না। কিছুক্ষণ পরে বালকটি ফিরে এসে তার মনিবকে বলল, 'আপনার আদেশ মতই আমি কাজ করেছি। আমীরের সঙ্গে দেখা করে তাকে খবরটা দিয়ে এসেছি। আমীর উঠে বললেন, 'তোমার মনিবকে আমার অভিবাদন ও সালাম জানিও এবং তাঁকে বলো যে, আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি। আর তিনি যা বলেছেন তা আমি করব। আমি টাকা নিয়ে এখন আসছি। এসে আমি আমার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাইব এবং তাঁর সামনে টাকা দিয়ে দিব।' এক ঘণ্টা যেতে না না যেতেই আমীর তাঁর সহিস ও দু'জন অনুচর সঙ্গে নিয়ে হাযির। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দোকানে ঢুকে বৃদ্ধ দরজীর হাত চুম্বন করলেন। তারপর তাঁর সামনে বসে একজন অনুচরের কাছ থেকে একটি সোনার থলি হাতে নিয়ে বললেন, 'এই টাকা নিন। অনুগ্রহপূর্বক ভাববেন না যে আমি ঐ লোকটির টাকা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলাম। সত্যিকার ভাবে দোষটা আমার নয়, আমার গোমস্তার।' বারংবার ক্ষমা চাইবার পর আমীর তাঁর একজন অনুচরকে বললেন, 'বাজার থেকে একজন ধাতু-পরীক্ষক ও একটা পাল্লা নিয়ে এস।' ধাতু-পরীক্ষককে আনা হোল। সোনা পরীক্ষিত হবার পর ওজন করা হোল এবং ওজনে সোনা হোল মোট পাঁচ শত দিনার। আমীর তখন বললেন, 'লোকটিকে আজ এই

পাঁচ শত দিনার নিতে হবে এবং আগামীকল্য দরবার থেকে ফিরে তাকে ডেকে বাকী দুই শত দিনার দিয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দিব। আগামীকল্য ফজরের নামাযের পূর্বে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য একজন লোক পাঠিয়ে দিব।' বৃদ্ধ দরজী বললেন, 'এই পাঁচ শত দিনার তাকে দিয়ে দাও এবং মনে রাখবে তোমার কথা যেন এদিক-ওদিক না হয়।' আমীর বললেন, 'নিশ্চয়ই।' আমীর তখন দিনারগুলো আমায় দিয়ে বৃদ্ধ লোকের হাত চুম্বন করে বিদায় নিল। আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে অবাক হয়ে গেলাম। আমি পাল্লা নিয়ে ওজন করে এক শত দিনার এই বলে বৃদ্ধ দরজীর সামনে রাখলাম, 'আমি আমার পুরা অঙ্কের থেকে এক শত দিনার কম নিতেও রাযী ছিলাম। কিন্তু আপনার অনুগ্রহে আমি এখন পুরা টাকাটাই পেতে যাচ্ছি। তাই আমি আপনাকে আপনার কর্মের পুরস্কারস্বরূপ নিজ ইচ্ছায় এক শত দিনার দিচ্ছি।' বৃদ্ধ লোকটি অসম্মতি জ্ঞাপন করে বললেন, 'আমি আনন্দিত যে আমার চেষ্টার ফলে একজন মুসলমান তার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু আমি যদি তোমার থেকে সামান্য অংশও গ্রহণ করি তাহলে এই তুর্কী আমীরের চেয়েও আমি অধিক অত্যাচারী বলে গণ্য হব। যাও, তোমার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে নিরাপদে বাড়ী ফিরে যাও। আর আগামীকল্য যদি তোমার বাকী দুই শত দিনার পাঠিয়ে না দেয় তবে আমাকে জানিও। তবে এরপরে কারো সঙ্গে ব্যবসা করবার পূর্বে তাকে ভালমত পরীক্ষা করে নিও।' আমি অনুনয় করা সত্ত্বেও দরবেশ কিছুই গ্রহণ করলেন না। আমি আনন্দে বাড়ী ফিরে এলাম। ঐদিন রাত্রে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারলাম।

পরের দিন সকাল বেলার দিকে আমি ঘরে বসে আছি এমন সময় আমীরের কাছ থেকে একজন লোক এসে বলল, 'আমীর আপনাকে ডেকেছেন।' আমীরের বাড়ী পৌঁছলে আমাকে সসম্মানে বসান হোল। আমীর তখন তাঁর গোমস্তাদের ভীষণ গালাগালি করতে লাগলেন এবং তাদেরকে দোষী করলেন। কারণ তিনি নিজে সব সময় রাজার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি খাজাঞ্চিকে ডেকে বললেন, 'সোনার থলি ও পাল্লা নিয়ে এস।' দুই শত দিনার মেপে আমাকে দিলেন। আমি মাথা নত করে সালাম জানিয়ে বিদায় হবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আমীর আমাকে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন।' এরপর খাবার এল। আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর আমীর একটা ভৃত্যের কানে কানে যেন কি

বললেন। ভৃত্যটি বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা অভিজাত ধরনের লম্বা পোশাক নিয়ে ফিরে এল। আমীর তখন বললেন, 'তাকে পরিয়ে দাও।' যাই হোক, তারা আমাকে একটা দামী আলখেল্লা ও পাগড়ী পরিয়ে দিল। আমীর তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি সত্যিই এখন সন্তুষ্ট হয়েছেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি তখন বললেন, 'তাহলে এখন আমার কুপন ফেরত দিন এবং এখনই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বলেন যে, আপনি আপনার সব অধিকার ফিরে পেয়েছেন এবং আমার থেকে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।' আমি বললাম, নিশ্চয়ই। এবং যেভাবেই হোক তিনি আমাকে আগামীকল্য দরবেশের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি উঠে আমীরের বাড়ী থেকে সোজা দরজীর ওখানে চলে গেলাম। আমি তাঁকে সব খুলে বললাম--কিভাবে আমীর আমাকে ডেকেছিলেন, আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন, আমার সব পাওনা শোধ করে দিয়েছেন এবং সর্বোপরি আমাকে আলখেল্লা ও পাগড়ী উপহার দেবার কথাও বললাম। তখন তাঁকে বললাম, 'এতসব আপনার কল্যাণেই পেয়েছি— তাই আপনি যদি কিছু মনে না করে দুই শত দিনার গ্রহণ করেন!' কিন্তু কিছুতেই তিনি কিছু গ্রহণ করলেন না। আমি আনন্দচিত্তে আমার নিজের দোকানে ফিরে এলাম।

পরের দিন আমি একটা মেষশাবক ও কতকগুলো মুরগী ভেজে সঙ্গে করে কিছু মিষ্টি ও পিঠা একটা পাত্রে করে বৃদ্ধ দরজীর দোকানে নিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'হে শেখ! আপনি যখন টাকা নিবেন না তখন আমার শুভেচ্ছাস্বরূপ এই খাবার জিনিসগুলো গ্রহণ করুন। এগুলো সবই আমি আমার হালাল রুযী দিয়ে তৈরী করেছি। আপনি এগুলো গ্রহণ করলে আমি খুব খুশী হব।' তিনি বললেন, 'আমি গ্রহণ করলাম।' তিনি হাত বাড়িয়ে কিছু নিয়ে নিজে খেলেন আর কিছু তাঁর শিক্ষানবিসদের দিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব।' তিনি বললেন, 'কি তোমার প্রশ্ন?' আমি বললাম, 'বাগদাদের সব আমীর এবং সম্ভ্রান্তরাই আমার পক্ষ থেকে এই আমীরকে বলা সত্ত্বেও কোন কাজ হয় নি। তিনি কারো কথায়ই কান দেন নি। এমন কি, কাযীর কথায়ও কোন কাজ হয় নি। কিন্তু আপনার কথামত কেন তিনি সবই করেছেন এবং আমার টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন? কি কারণে আমীর আপনাকে এত শ্রদ্ধা করেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তুমি কি শুন নি যে খলীফার

সঙ্গে আমার কি ঘটেছিল?' আমি বললাম, 'না শুনি নি'। তিনি তখন বললেন, 'তবে শুন আমি বলছি।'

তিনি বলতে লাগলেন: আমি তিরিশ বছর ধরে এই মসজিদের মিনার থেকে আযান দিচ্ছি। আমি দরজীর ব্যবসায়ী হলেও কোনদিন মদ স্পর্শ করি নাই, কোন জিনিসে ভেজাল দেই নি এবং কখনও অসৎ কাজে সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই। এখন এই রাস্তায়ই একজন আমীরের বাড়ী। একদিন যোহরের নামাযের পর মসজিদ থেকে আমি দোকানে আসছি এমন সময় আমীরকে মাতাল অবস্থায় আসতে দেখলাম। আমীর একজন অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোকের বোরকা ধরে জোরপূর্বক টেনে আনছিলেন আর স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে বলছিল, 'হে মুসলমানগণ, আমাকে রক্ষা কর। আমি ঐ প্রকৃতির স্ত্রীলোক নই। আমি অমুকের মেয়ে ও অমুকের স্ত্রী। আমার বাড়ী ওখানে এবং সকলেই আমার চরিত্র সম্পর্কে জানে। এই তুর্কী আমীর আমাকে জোরপূর্বক বদ কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আমার স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, কোন রাত্রে বাড়ীতে না ফিরলে আমাকে তালাক দিয়ে দিবেন।' স্ত্রীলোকটি কাঁদছিল, কিন্তু কেউ তার সহায়তায় আসে নি, কারণ ঐ আমীর ছিল অত্যন্ত গর্বিত ও অত্যাচারী। তার ১০,০০০ অশ্বারোহী ছিল। তাই কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করত না। আমি কিছুটা আপত্তি করা সত্ত্বেও কোন কাজ হয় নি। আমীর ঐ স্ত্রী-লোকটিকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। এই অবস্থায় আমার মধ্যে ধর্মীয় আবেগ ফিরে এল এবং আমি নিজেকে দমন করতে পারলাম না। আমি গিয়ে জেলার সব মুরুব্বীদের একত্র করলাম। তারপর সকলে মিলে আমীরের বাড়ীতে গিয়ে চীৎকার করে এই বলে বিক্ষোভ জানাতে লাগলাম, 'ইসলাম ডুবে যাচ্ছে, কারণ বাগদাদ শহরে খলীফার দরজার কাছেই স্ত্রীলোকদের দাম্ভিকতার সঙ্গে জোরপূর্বক রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে তাদের প্রতি বলাৎকার করা হচ্ছে। এই স্ত্রীলোককে ফেরত দিন, নচেৎ আমরা এখনই খলীফা মু'তাসিমের দরবারে গিয়ে নালিশ করব।' আমাদের চীৎকার শুনে তুর্কী আমীর একদল ভৃত্য সহ বাইরে এলো এবং আমাদের প্রহার করে প্রতিবাদের ক্ষমতা নষ্ট করে দিল।

এই ঘটনার পর আমরা সকলে পালিয়ে গেলাম। আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমি আমার রাত্রির পোশাক পরে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমি এত চিন্তিত ছিলাম যে ঘুম এল না। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সজাগ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। আমার

মনে হোল, তার কিছু হানি করার থাকলে এতক্ষণে তা করে ফেলেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগল এই ভেবে যে, স্ত্রীলোকটির স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে রাত্রে বাইরে কোথাও থাকলে তাকে তালাক দিয়ে দিবে। আমি শুনেছিলাম যে, মদখোররা খুব বেশী মদে ধরলে ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গলে তারা বলতে পারে না যে রাত্রি কতটা হয়েছে। তখনই আমি মনস্থ করলাম মিনারের উপর গিয়ে নামাযের আযান দিতে, কারণ আযান শুনে আমীর মনে করবে যে ভোর হয়ে গেছে এবং স্ত্রীলোকটিকে বাড়ী থেকে বের করে দিবে। স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই মসজিদের সামনে দিয়ে যাবে। আযান শেষে মিনার থেকে নেমে মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ালাম, যাতে স্ত্রীলোকটি মসজিদের কাছে এলে তাকে সঙ্গে করে তার স্বামীর বাড়ীতে পেঁ ৗছে দিয়ে আসতে পারি—যাতে অসহায়া স্ত্রীলোকটি তার স্বামী এবং সংসার থেকে বঞ্চিত না হয়।

যাই হোক, ঐভাবে কাজ করলাম। মিনারের উপর গিয়ে নামাযের আযান দিলাম। এদিকে খলীফা মু'তাসিম সজাগ ছিলেন। অসময়ে আযান শুনে তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'যে লোক মধ্যরাত্রিতে আযান দিচ্ছে সে নিশ্চয়ই একজন দুরাচার, কারণ যে-ই আযান শুনবে সে মনে করবে যে ভোর হয়েছে এবং বের হয়ে রাস্তায় গেলে রাত্রের পাহারাদাররা ধরে তাকে বিপদে ফেলবে।' তিনি একজন চাকরকে বললেন, যাও, দারোয়ানকে গিয়ে বল যে এক্ষণই যেন সে মুয়াযযিনকে ডেকে আনে—যে মধ্যরাত্রে নামাযের আযান দিয়েছে। আমি তাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যে, ভবিষ্যতে যেন কোন মোয়াযযিন আর অসময়ে আযান না দেয়।' স্ত্রীলোকটির অপেক্ষায় আমি মসজিদের দরজায় অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় দারোয়ান একটা মশাল হাতে করে এল। আমাকে ওখানে দাঁড়ান দেখে সে বলল, 'আপনি কি আযান দিয়েছেন?' আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ'। তখন সে বলল, 'অসময়ে কেন আযান দিয়েছেন? খলীফা এতে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আপনার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। আপনাকে শাস্তি দেবার জন্য নিতে পাঠিয়েছেন।' আমি বললাম, 'খলীফা হুকুম করতে পারেন, কিন্তু আমি অসময়ে আযান দিতে বাধ্য হয়েছি একজন বর্বর লোকের জন্য।' সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে এই বর্বর লোক?' আমি বললাম, 'এ এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, খলীফাকেও ভয় করে না।' সে তখন বলল, 'এমন কে হতে পারে?' আমি জবাব দিলাম, 'এটা

এমন একটা ব্যাপার যা আমি শুধু খলীফার কাছে বলতে পারি। আর আমি যদি ইচ্ছা করে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে একাজ করে থাকি, তাহলে খলীফা আমাকে যে শাস্তিই দিন না কেন, তা আমার যোগ্য শাস্তির চেয়ে কম হবে।' সে বলল, 'আল্লাহ্‌র নাম করে চলে আসুন আমরা খলীফার বাড়ীতে যাই।'

আমরা যখন রাজপ্রাসাদে পৌঁছলাম, তখন ভৃত্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। দারোয়ানকে আমি যা বলেছিলাম সে তা ভৃত্যকে বলল। ভৃত্য গিয়ে আল-মু'তাসিমকে খবর পাঠাল। তিনি বলে পাঠালেন, 'লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এস।' ভৃত্যটি আমাকে খলীফার কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমি অসময়ে আযান দিয়েছি। আমি তখন তুর্কী আমীর ও স্ত্রীলোকটির কাহিনী আদি-অন্ত তাঁকে বললাম। ঘটনা শোনার পর তিনি ভৃত্যকে দিয়ে দারোয়ানকে বলে পাঠালেন, 'একশত অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে অমুক আমীরের বাড়ী গিয়ে তাকে বল যে খলীফা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমীরকে খবর দেবার পর তোমরা যে স্ত্রীলোককে সে গতকাল এনেছিল তাকে উদ্ধার করে এই বৃদ্ধ লোক ও দুই-তিনজন অনুচর সহ তাকে তার স্বামীর বাড়ীতে পৌঁছে দিবে। তার স্বামীর কাছে গিয়ে বলবে যে, খলীফা আল-মু'তাসিম তাকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তার স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে বলেছেন যে, সে ঐ ঘটনার জন্য মোটেই দায়ী নহে। তাই সে তার স্ত্রীর প্রতি ভবিষ্যতে ভাল ব্যবহার করবে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আমীরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।' তিনি আমাকে বললেন, 'এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।' এক ঘণ্টা পরে তারা আমীরকে আল-মু'তাসিমের কাছে নিয়ে এল। আল-মু'তাসিম তাকে দেখে বললেন, 'কেন তুমি মনে কর যে, আমার মধ্যে ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের অভাব আছে? তুমি কি আমাকে লোকদের প্রতি অত্যাচার করতে দেখেছ? অথবা আমার সময়ে ধর্মীয় ব্যাপারে কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছে কি? আমি কি সেই লোক নই, একজন মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য যাকে বাইজানটাইনের রুমিরা জেলে দিয়েছিল, বাগদাদ থেকে গিয়ে রুমি সেনাদের পরাজিত করে রোমক সম্রাটকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ছয় বছর পর্যন্ত লুঠ করেছি এবং ততদিন পর্যন্ত ফিরে আসি নি যতদিন না কুস্তান্তানিয়া (কনস্টেনটিনোপল) ধ্বংস করে সেখানে ক্যাথেড্রাল মসজিদ তৈরী

করে বন্দী লোকটাকে মুক্ত করে আনতে পেরেছি? আজ আমার ও আমার ন্যায়বিচারের ভয়ে নেকড়ে বাঘ ও ভেড়াও এক ঘাটে পানি খেতে পারে আর তুমি বাগদাদে আমার দরজার কাছে থেকে কি করে একজন স্ত্রীলোককে অসৎ উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক তোমার বাড়ীতে নিতে সাহস কর এবং লোকে আপত্তি জানালে তাদের মেরে তাড়িয়ে দাও?' খলীফা তখন হুকুম করলেন একটা বস্তা এনে আমীরকে তার মধ্যে ভরে বস্তাটা শক্ত করে বাঁধতে। তাই করা হোল। তখন তাঁর আদেশে পাথর-জমানো নোড়ার মত দু'খানা লাঠি আনা হোল এবং খলীফা দুইজন লোককে বস্তার দুই পার্শ্বে বসে আমীরকে মেরে গুঁড়ো করে ফেলতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোক দু'টি তাকে মেরে গুঁড়ো করে দিল। তারা তখন বলল, 'হে খলীফা, তার সব হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। এখন কি করতে বলেন?' তিনি তখন বস্তা বন্দী অবস্থায়ই ওগুলোকে তাইগ্রীস নদীতে ফেলে দিতে হুকুম দিলেন।

তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ওহে শেখ! আপনি জেনে নিন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, সে আমাকে ডরাবে কিন্তু আল্লাহ্-বিশ্বাসী লোক এমন কাজ নিশ্চয়ই করবে না যার জন্য তাকে একালে ও পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। এই লোকটা তার অন্যায়ের প্রতিফলই পেয়েছে। তাই আমি আপনাকে আদেশ করছি যে ভবিষ্যতে যদি কোন লোক অন্য একজনের প্রতি অন্যায় করে, অন্যকে অন্যায়ভাবে আঘাত দেয় বা ধর্মীয় অনুশাসন বরখেলাফ করে এবং তা যদি আপনার গোচরীভূত হয় তাহলে আপনাকে এই ভাবে অসময়ে আযান দিতে হবে যাতে আমি জানতে পেরে আপনাকে তলব করে আপনার থেকে ঘটনা জেনে অপরাধীর বিচার করতে পারি যেমনি করে এখন করলাম। অপরাধী আমার নিজ পুত্র বা ভ্রাতা হলেও রেহাই পাবে না।' তখন তিনি আমাকে একটা উপহার দিলেন এবং চাকরি থেকে অবসর দিলেন। সকল সম্ভ্রান্ত ও পাত্র-পারিষদরা এই ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত আছে এবং আমীর আমাকে সম্মান করে তোমার টাকা ফেরৎ দেয় নি বরং ঐ বস্তা, প্লাস্টার, নোড়া এবং নদীর ভয়েই তিনি তোমার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন। তা না হলে তিনি যদি তোমার টাকা না দিতেন তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে আযান দিতাম, ফলে তার ভাগ্যেও তুর্কী আমীরের শাস্তিই ঘটত।

এই ধরনের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আমি এইটুকু বর্ণনা করলাম যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন যে, খলীফা ও রাজারা কি ভাবে

সর্বদা নেকড়ে বাঘদের হাত থেকে ভেড়াদের রক্ষা করেন, কি ভাবে তাঁরা তাঁদের কর্মচারীদের শাসনে রাখেন, অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে তাঁরা কি সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং কি ভাবে তাঁরা ইসলামী ঝাণ্ডা শক্তিশালী করে ধরে রেখেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

ধর্মীয় ব্যাপারে তদন্ত করে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, সেগুলোকে কার্যে পরিণত করা এবং সেগুলো মেনে চলা রাজার জন্য অবশ্যকরণীয়। তাঁর আলেমদের শ্রদ্ধা করা উচিত এবং তাঁদের বেতন রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে দেওয়া উচিত। তাছাড়া তাঁর সংযমী ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরও সমাদর করা উচিত। পরন্তু তাঁর জন্য মঙ্গলকর হবে যদি তিনি সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন ধর্মীয় মুরব্বিদের ডেকে তাঁদের থেকে কিছু ধর্মকথা শুনেন, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা শুনেন ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও খলীফাদের কাহিনী শুনেন। ঐ সময় তাঁর পার্থিব সবকিছু ভুলে গিয়ে সর্বতোভাবে ওগুলো শুনা উচিত। তাঁর আদেশে আলেমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক-সভা করবেন, সেখানে তাঁকে কোন কিছু না বুঝলে প্রশ্ন করতে হবে এবং প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলে সেগুলো তাঁকে মুখস্ত করতে হবে। এইভাবে কিছু দিন চলার পর এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই আল্লাহ্‌র আইন ও কুরআন-হাদীসের অর্থ তাঁর জানা হয়ে যাবে। এই ভাবে চললে পার-লৌকিক ও পার্থিব ব্যাপারে তাঁর পরিণামদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে, ফলে কোন প্রচারক বা কেউ তাঁকে বিপথে নিতে পারবে না। তাঁর বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতা বেড়ে যাবে, তাঁর রাজ্য থেকে আত্মশ্লাঘা ও ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং তাঁর দ্বারা মহৎ কাজ সুসম্পন্ন হবে। তাঁর সময়ে অনাচার, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা আর থাকবে না। পুণ্যবানরা শক্তিশালী হয়ে পড়বে আর দুষ্টদের চিহ্নও থাকবে না। তিনি এ জগতে সুনাম পাবেন আর পরকালে পাবেন মুক্তি ও অসংখ্য পুরস্কার। তাঁর আমলের লোক জ্ঞান অর্জনে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহম্মদ (সা:) বলতেন, 'পুণ্যবানরা তাদের অধীনস্থদের প্রতি যে ন্যায়-বিচার করেছে তার দৌলতেই তারা বেহেশ্‌তে বাস করবে।'

একজন রাজার যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেটা হোল ধর্মবিশ্বাস। কারণ রাজত্ব ও ধর্ম দুই ভাইয়ের মত। দেশে কোন দুর্যোগ দেখা দিলে ধর্মীয় কাজেও ব্যাঘাত ঘটে ; ধর্মবিদ্বেষী এবং অসৎ ব্যক্তিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং যখনই ধর্ম বিষয়ে কোন গোলযোগ দেখা দেয়, দেশে তখন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, অসৎ ব্যক্তিরা ক্ষমতা লাভ করে এবং রাজা দুর্বল ও হতাশ হয়ে পড়ে। ধর্ম-বিরোধীরা পুরামাত্রায় তাদের কাজ শুরু করে আর বিদ্রোহীদের কাজও শুরু হয় তেমনিভাবে।

সুফিয়ান সাওরী (আব্বাসীয় খলীফাদের সমসাময়িক একজন সুবিখ্যাত আলেম) বলতেন, 'তিনিই শ্রেষ্ঠ রাজা—যিনি বিদ্বানদের সাহচর্যে থাকেন আর তিনিই বিদ্বানদের মধ্যে অধম – যিনি রাজার সংস্পর্শ চান।'

আর্দাশির বলেন, 'যে রাজার নিজের পারিষদবর্গকে সংযত রাখার ক্ষমতা নাই তিনি কখনও সাধারণ লোক ও কৃষকদের শাসন করতে পারবেন না।' এই মর্মে কুরআন শরীফে একটা কথা আছে (২৬.২১৪), 'তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরই প্রথমে সাবধান কর।'

খলীফা উমর (রাঃ) বলতেন, 'রাজার দর্শন লাভে অসুবিধা দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতির ও কৃষকদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। বিপরীতক্রমে বলা যায়ঃ জনসাধারণের জন্য রাজার কাছে সহজভাবে প্রবেশাধিকারের চেয়ে আর লাভজনক কিছুই নাই, কারণ শাসকবর্গ এবং রাজস্ব আদায়কারীরা যখন জানতে পারবে যে রাজার সঙ্গে সকলেই দেখা করতে পারে তখন অত্যাচার ও অবৈধ যুলুম করতে সাহস পাবে না।'

লোকমান হাকীম বলতেন, 'জ্ঞানের চেয়ে মানুষের আর বড় বন্ধু কিছু নাই এবং জ্ঞান সম্পদের চেয়েও উত্তম। কারণ সম্পদ যত্ন করে রাখতে হয় আর জ্ঞান জ্ঞানী ব্যক্তির যত্ন নেয়।'

বাসরার হাসান (উমাইয়া বংশের খলীফা আবদুল আযীযের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত আইনবিদ ও যোগী) বলতেন, 'একজন লোক বেশী আরবী জানলে এবং আরবী ব্যাকরণ ও শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই জ্ঞানী হয় না। সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী, যিনি জানেন, তাঁর কি কর্তব্য। এটা ছাড়া ভাষায় দখল থাকলে উত্তম। যদি কোন ব্যক্তি ধর্মীয় অনুশাসন ও কুরআনের অর্থ তুর্কী, অথবা পার্সী অথবা গ্রীক ভাষায় জানে এবং তার যদি আরবীতে কোন জ্ঞান নাও থাকে তাহলেও সেই ব্যক্তি জ্ঞানী। তাছাড়া তিনি যদি আরবী জানেন তাহলে আরো ভাল। কারণ আল্লাহ

আরবীতে কুরআন শরীফ নাযিল করেছেন এবং হযরত মহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আরবীতে কথা বলতেন।'

রাজার মধ্যে যদি ঐশ্বরিক দীপ্তি ও সার্বভৌমত্ব বিরাজমান থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি জ্ঞানের সংযোগও থাকে তাহলে তিনি উভয় জগতেই শান্তি পাবেন, কারণ তিনি যা কিছু করেন সবই জেনে-শুনে করেন এবং কোন কিছুতেই অজ্ঞ থাকেন না। আফ্রিদুন, আলেকজাণ্ডার, আর্দাশির, ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়াঁ, খলীফা উমর (রাঃ) উমর ইবনে আবদুল আযীয, হারুন, আল মামুন, আল মুতাসিম, ইসমাইল ইবনে আহমদ এবং সুলতান মাহমুদের মত জ্ঞানী রাজারা এত মহৎ কাজ করেছেন এবং তাঁদের নাম এত প্রসিদ্ধ যে, কেয়ামতের দিন পর্যন্ত লোকেরা তাঁদের নাম স্মরণ করবে। তাঁদের কার্যপ্রণালী ও জীবন ধারা এত সুবিখ্যাত যে সেগুলো ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এবং মানুষ তা কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

উমর ইবনে আবদুল আযীয ও দুর্ভিক্ষের কাহিনী

কথিত আছে যে, উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময় একবার দুর্ভিক্ষ হয়, ফলে লোকের খুব অসুবিধা হয়। একদল আরব তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই বলে নালিশ করে, 'হে খলীফা! দুর্ভিক্ষে আমরা একদম কঙ্কালসার হয়ে গেছি, আমাদের গাল রক্তশূন্য হয়ে গেছে, কারণ আমাদের প্রচুর খাবার নেই। আপনার ধনাগারে যা আছে ওগুলো আমরা চাই। আর ধনাগারের মালিক আপনি অথবা আল্লাহ্ নিজে অথবা জনগণ। এখন ওগুলো যদি জনগণের হয় তাহলে আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে, যদি আল্লাহ ওগুলোর মালিক হন তবে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই আর আপনি যদি ওগুলোর মালিক হন তবে ওগুলো আমাদের দান করুন, আল্লাহ আপনাকে পরিশোধ করে দিবেন।' (কুরআনঃ ১২˙৮৮) উমর ইবনে আবদুল আযীয শুনে সহানুভূতিতে ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁর চোখে পানি আসল। তিনি বললেন, 'তোমরা যা বললে আমি তাই করব।' 'এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধনাগার থেকে তাদের সাহায্য করতে হুকুম দিয়ে দিলেন। লোকগুলো যখন উঠে চলে যাচ্ছিলো তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছো, আমাদের সময় তোমরা আমাকে

স্মরণ করবে কিন্তু।' লোকগুলো তখন উপরের দিকে চেয়ে বলল, 'হে খোদা ! তুমি ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার কর যেমন তিনি তাঁর প্রজাদের সাথে করেছেন।'

প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ হয়ে ভীষণভাবে বৃষ্টি পড়তে লাগল। রাজপ্রাসাদের উপর একটা শিলাখণ্ড এসে পড়ে ভেঙ্গে দু'খণ্ড হয়ে গেল এবং তার মধ্য থেকে এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেল। তাতে আরবীতে লেখা ছিল, 'এটা ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ প্রেরিত একটা আশীর্বাদ।'

এই জাতীয় অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তবে এই অধ্যায়ে যেটুকু বলা হোল, সেটাই যথেষ্ট।

নবম অধ্যায়

উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা ও তাদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরই উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ করা উচিত। তাদের কাজ হবে আদালত সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করা। তারা তাদের নিজেদের দায়িত্বে প্রতি জেলায় এবং শহরে সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ প্রতিনিধি কর্মচারী পাঠিয়ে রাজস্ব ও খাজনা আদায়ের কাজ তদারক করবে এবং ছোট বড় সব ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবে। তাদের বেতন এমন হওয়া উচিত যাতে কৃষকদের গায়ে না লাগে বা তাদের উপর কোন রকম বোঝা না, হয় তবে তাদের এমনভাবে বেতন দেওয়া উচিত যাতে তারা ঘুষ খাবার বা অসৎ উপায় অবলম্বনের কোন অজুহাত না পায়। তারা যদি সভাবে কাজ করে তবে তাদের থেকে যে লাভ পাওয়া যাবে তা তাদের রাখতে যা খরচ হয় তার দশ গুণ অথবা একশত গুণ বেশী হবে।

দশম অধ্যায়

গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী এবং তাদের কাজের গুরুত্ব প্রসঙ্গে

কৃষকদের ও সৈনিকদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং অন্যান্য সবকিছু সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞাত হওয়া রাজার কর্তব্য। এটা যদি তিনি না করেন তাহলে লোকে তাঁকে অমনোযোগী, অলস ও স্বেচ্ছাচারী বলে গালাগাল দিবে এবং বলবে, 'রাজা দেশের অত্যাচার এবং অবৈধ যুলুম সম্পর্কে জ্ঞাত অথবা তিনি কিছুই জানেন না। যদি তিনি জেনেও এটা দমন করতে ও এর প্রতিকার করতে কোন ব্যবস্থা না করেন তাহলে তিনিও তাদের মত অত্যাচারী এবং অন্যান্য অত্যা-চারীদের তিনি সমর্থন করেন, আর যদি তিনি অত্যাচার সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকেন তাহলে তিনি অমনোযোগী এবং অজ্ঞ।' দুটোর , একটাও বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর নিশ্চয়ই বার্তাবাহক ছিল কারণ ইসলামিক এবং প্রাক-ইসলামিক যুগে সব সময়ই রাজার বার্তাবাহক থাকত এবং তাদের মাধ্যমে তিনি ভাল-মন্দ সব খবর নিতেন। উদাহরণস্বরূপ পাঁচ শত ফারসাং দূরে যদি কোন এক ব্যক্তি একটা মুরগী অথবা এক বোঝা খড়ের জন্য অত্যধিক পয়সা আদায় করে এবং রাজা যদি তা জানতে পেরে তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে অন্যান্য সকলে জানবে যে রাজা সর্বদা সতর্ক। তাঁরা এখানে সেখানে সংবাদদাতা নিযুক্ত করে অত্যাচারী-দের কার্যকলাপ যথাসম্ভব দমন করে ন্যায়বিচার করতেন এবং ব্যবসা ও কৃষিকার্যের নিরাপত্তা বিধান করতেন। কিন্তু এটা বেশ কঠিন কাজ। আর এতে অনেক তিক্ততা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। এই কাজ এমন লোকদের হাতে দেওয়া উচিত, যারা সম্পূর্ণ স্বার্থহীন এবং সন্দেহের বাইরে ; কারণ দেশের ভাল মন্দ তাদের উপরই নির্ভরশীল। কেবল রাজার কাছেই তারা দায়ী থাকবে আর কারও কাছে নয়। আর তাদের মাসিক ভাতা নিয়মমত মাসে মাসে রাজকোষ থেকে দিতে হবে যাতে তারা নির্ভাবনায় তাদের করণীয় কাজ করতে পারে। এইভাবে রাজা খুঁটিনাটি সব তথ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারবেন এবং তার ফলে তাঁর ন্যায়বিচার করতে সুবিধা হবে। রাজার মধ্যে যখন এই সমস্ত গুণের সমাবেশ দেখা যায় বা রাজা যখন এইরূপ হন তখন সকলেই রাজার বাধ্যগত হয় এবং

রাজার শাস্তির ভয়ে কেউ অবাধ্য হতে সাহস করবে না বা রাজার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করতে সাহস করবে না। এইভাবে গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী এবং প্রতিনিধি নিয়োগের দ্বারা রাজা সহজেই ন্যায়বিচার, সতর্কতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন এবং রাজ্যের উন্নতি বিধান করতে পারেন।

কুচবালুচের ডাকাতদলের গল্প

সুলতান মাহ্‌মুদের ইরাক অভিযানের সময় দায়ের গাচিনে ডাকাতেরা মরুযাত্রিদলে ভ্রমণরত একজন বৃদ্ধার সকল ধনসম্পদ ও মালপত্র নিয়ে যায়। ডাকাতদের বাড়ী ছিল কিরমান প্রদেশের অন্তর্গত কুচবালুচ নামক জায়গায়। স্ত্রীলোকটি সুলতান মাহ্‌মুদের কাছে নালিশ করতে গিয়ে বলল, 'দায়ের গাচিনে ডাকাতেরা আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেছে। তাদের থেকে আমাকে ঐগুলো ফেরত এনে দিন অথবা ঐগুলোর জন্য আমাকে ক্ষতিপূরণ দিন।' সুলতান মাহ্‌মুদ বললেন, 'দায়ের গাচিন কোথায়?' স্ত্রীলোকটি বলল, 'রাজ্যসীমা এত বেশী বাড়াবেন না যার পরিধি আপনার জ্ঞানের আওতার মধ্যে না থাকে এবং যার প্রতি আপনি লক্ষ্য না রাখতে পারেন।' সুলতান মাহ্‌মুদ বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আচ্ছা তুমি কি বলতে পার যে ডাকাতেরা কোন্ গোত্রের লোক এবং কোন্ দিক থেকে এসেছিল?' স্ত্রীলোকটি বলল, 'তারা কুচবালুচের লোক এবং কিরমান অঞ্চলের দিক থেকে এসেছিল।' তিনি তখন বললেন, 'ঐ জায়গা অনেক দূরে অবস্থিত এবং আমার রাজ্যসীমার বাইরে তাই তাদেরকে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।' স্ত্রীলোকটি বলল, 'আপনি কেমন ধরনের রাজা যে নিজের অধীনস্থ জায়গার শাসন ঠিক রাখতে পারবেন না? আপনি কেমন রক্ষক যে নেকড়ে বাঘের আক্রমণ থেকে ভেড়াকে রক্ষা করতে পারেন না? আপনার সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে আমার নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ অবস্থার দিকে কেবল তাকিয়েই থাকেন।' শুনে সুলতান মাহ্‌মুদের চোখে পানি আসল। তিনি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি তোমার অস্থাবর সম্পত্তির জন্য তোমাকে ক্ষতিপূরণ দেব এবং তোমার এই ব্যাপারের ফয়সালা করতে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব।'

স্ত্রীলোকটিকে তখন তিনি ধনাগার থেকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন এবং কিরমানের আমির আবু আলী ইলিয়াসকে এই বলে চিঠি লিখলেন, 'ইরাকে আমি রাজ্য বিজয়ে আসি নাই কারণ আমি হিন্দুস্তানে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। আমি এসেছিলাম মুসলমানদের নিকট থেকে ঘন ঘন অত্যাচার ও অবিচারের অভিযোগপত্র পেয়ে। শুনেছি যে দাইলামীরা ইরাকে দুর্নীতি, অত্যাচার ও ইসলাম-বিরোধী মতের আশ্রয় নিয়েছিল। তারা বড় বড় রাস্তার পার্শ্বে গোপনে অবস্থান করে পথচারী প্রতিটি সুন্দরী মেয়ে বা ছেলেদের ধরে নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছিল। তারা প্রত্যক্ষভাবে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সাহাবাদের অপমানিত করছে এবং আয়েশা বিবিকে অভিযুক্ত করেছে। রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধিরা যা ইচ্ছা তাই করছে এবং বছরে দুই তিন বার খাজনা আদায় করছে। শুনেছি যে মজিদ আদদৌলা নামে এক রাজার নয়জন স্ত্রী এবং সবাই বিবাহিত স্ত্রী। তিনি নিজেকে সব রাজাদের রাজা বলে জাহির করেন। তাছাড়া কৃষকরা ইসলাম-বিরোধী ও বাতিনী মতবাদ ছড়াচ্ছে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-কে গালাগাল দিচ্ছে, তারা প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে অস্বীকার করছে এবং নামায, রোযা, হজ ও যাকাতকে বর্জন করছে। রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধিরা তাদেরকে দমন করতে পারছে না, অন্যদিকে কৃষকরাও প্রতিনিধিদের কর্তব্যহীনতা, অরাজকতা ও দুষ্টতা সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না। দুই দলই সমভাবে পাপাচারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

'ইরাকের এই সমস্ত ঘটনা যখন আমার কানে আসল তখন আমি হিন্দুস্তানের যুদ্ধের কথা বাদ দিয়ে এদিকে দৃষ্টি দিলাম। আমি তুর্কীর সৈন্যদের (সকলেই হানাফী গোত্রের মুসলমান) কাছে সব খুলে বলে তাদেরকে দাইলামীদের, নাস্তিকদের এবং বাতিনীদের মোকাবেলা করতে অনুরোধ করলাম এবং তারা সকলকেই সমূলে বিনাশ করে দিল। কিছু অস্ত্রের আঘাতে নিহত হোল, কিছু বন্দী হোল এবং বাকীগুলোকে নির্বাসিত করা হোল। আমি ইরাকী সব কর্মচারীকে বরখাস্ত করে সেখানে খোরাসানের হানাফী এবং শাফী মজহারের সরকারী কর্মচারী ও শাসনকর্তাদের নিয়োগ করলাম। এরা তুর্কীদের মতই গোঁড়া এবং রাফিদী, বাতিনী এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধবাদী। আমি একজন ইরাকী সেক্রেটারীকেও কলম ধরতে দেই নাই, কারণ আমি ভালভাবেই জানতাম যে প্রত্যেকটি ইরাকী লেখকই প্রচলিত ধর্মবাদে বিশ্বাস করে না এবং

তারা তুর্কীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবে। এইভাবে আল্লাহ্‌র রহমতে আমি অল্পদিনের মধ্যেই দেশ থেকে বিরোধীবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। কারণ আল্লাহ্‌ এই জন্যই আমাকে সকলের কর্তা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আমার উচিত দুনিয়া থেকে অবিশ্বাসীদের নিচিহ্ন করে বিশ্বাসীদের রক্ষা করা এবং উদারতা ও বদান্যতার মাধ্যমে দুনিয়ার উন্নতি সাধন করা।

'ইতিমধ্যে আমি জানতে পেরেছি যে কুচবালুচের কাফেরের একটি দল দায়ের গাচিনে ডাকাতি করে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। আমি আশা করি, আপনি ওদের খোঁজ নিয়ে জিনিসগুলো উদ্ধার করবেন। ডাকাতদের সকলকে ফাঁসি দিবেন অথবা হাতকড়ি দিয়ে জিনিসগুলোসহ রায় শহরে পাঠিয়ে দিন। তাতেই তারা কিরমান থেকে আমার প্রদেশে এসে ডাকাতি করার সাহসের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। অন্যথায় আমি আমার নিজের সৈন্য পাঠিয়ে কিরমান প্রদেশের উপর প্রতিশোধ নেব, কারণ সোমনাথ থেকে কিরমান খুব বেশী দূরে নয়।'

চিঠিটা পেয়ে আবূ আলী ইলিয়াস খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বার্তাবাহককে খুব আদর যত্ন করলেন এবং তার কাছে সুলতান মাহমুদের সম্মানার্থে বিভিন্ন রকমের মুক্তা, কিছু সমুদ্রের জিনিস এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপঢৌকন দিয়ে বলে পাঠালেন, 'আমি আপনার খুব অনুগত কিন্তু আপনি সম্ভবতঃ আমার কৃতকর্ম ও কিরমান প্রদেশ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমি কখনও বিশৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেই নি এবং কিরমানের অধিবাসীরা সকলেই সুখী এবং শান্তিক, তারা সর্বদাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকে। কুচবালুচের পাহাড়গুলো সঙ্কীর্ণ পথ এবং অসমতল রাস্তা দ্বারা কিরমান থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি এই সমস্ত লোকের জন্য খুব চিন্তিত, কারণ তাদের বেশীর ভাগই ডাকাত এবং হত্যাকারী। তারা তাদের অসৎ কাজের দ্বারা দুই শত ফারসাং রাস্তা বিপজ্জনক করে রেখেছে। তাছাড়া তারা সংখ্যায় এত বেশী যে আমি তাদের সঙ্গে পেরে উঠি না। দুনিয়ার সুলতান অধিক শক্তিশালী। দুনিয়ায় তিনি ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তাঁকে সহায়তা করার জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি।'

আবূ আলীর কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়ে সুলতান মাহমুদ বুঝতে পারলেন যে সে যা লিখেছে সব সত্য। তিনি বার্তাবাহককে পুনরায় আবূ আলীর কাছে বলে পাঠালেন, 'কিরমানের সমস্ত সৈন্যদের

একত্রিত করে প্রদেশটি ঘিরে ফেলুন আর অমুক মাসের প্রথম দিকে কুচ বালুচস্থ প্রান্তসীমায় এসে অপেক্ষা করবেন। যখনই কোন বার্তাবাহক আমার নিকট থেকে কোন এক বিশিষ্ট প্রতীকসহ আপনার নিকট যাবে তখনই সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে কুচবালুচ প্রদেশ আক্রমণ করবেন। সামনে পেলে প্রত্যেকটা যুবককে হত্যা করবেন এবং তাদের প্রতি কোন করুণা দেখাবেন না। তাদের স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদের ধরে এনে এখানে পাঠিয়ে দিবেন যাতে আমি সম্পত্তিহারা ব্যক্তিদের মধ্যে ওদেরকে বণ্টন করে দিতে পারি। তারপর তাদের সঙ্গে একটা দৃঢ় সমঝোতায় আসার পর ফিরে আসবেন।

বার্তাবাহককে আবূ আলীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে সুলতান মাহমুদ ঘোষণা জারী করে দিলেন যে, ইয়াহূদ এবং কিরমানগামী প্রতিটি ব্যবসায়ী রওয়ানা হবার আগে সুলতানের কাছে এসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তিনি সকলকে একজন করে প্রহরী সঙ্গে দিবেন এবং প্রত্যেককে এই নিশ্চয়তা দিবেন যে কুচবালুচের ডাকাতেরা যদি কারো জিনিসপত্র নিয়ে যায় তাহলে তিনি রাজকোষ থেকে ক্ষতিপূরণ দিবেন।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ অঞ্চল থেকে অসংখ্য ব্যবসায়ী এসে রায় শহরে জমায়েত হোল। তখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে সুলতান মাহমুদ তাদেরকে একজন আমীর ও দেড় শত অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়ে বিদায় দিলেন। বিদায়ের আগে পুনরায় আশ্বাস দিলেন, 'ভয় কর না, কারণ আমি তোমাদের পিছে পিছেই বিরাট এক সেনাদল পাঠাচ্ছি।' প্রহরীদের বিদায় দিবার সময় তিনি আমীরকে ডেকে তাঁর হাতে এক শিশি বিষ দিয়ে বললেন, 'ইস্পাহানে পৌঁছে দশ দিন অপেক্ষা করবে যাতে সেখানকার ব্যবসায়ীরা তাদের সব ঝামেলা চুকিয়ে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারে। ঐসময় ইস্পাহান থেকে দশ গাধাভর্তি আপেল কিনে দশটি উটের বোঝায় চড়িয়ে দিবে। রওনা হবার সময় উটগুলোকে ব্যবসায়ীদের উটের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ক্রমাগত পথ চলতে থাকবে যতক্ষণ না বুঝবে যে পরের দিন তোমারা ডাকাতদের অঞ্চলে পৌঁছেছো। ঐদিন রাত্রে আপেলের বোঝাগুলো তোমাদের তাঁবুতে এনে মাটিতে ছড়িয়ে দিবে তারপর প্রতিটি আপেলের মধ্যে সূঁচ ঢুকিয়ে ছিদ্র করে ফেলবে। সূঁচের মত ছোট ছোট কাঠি বানিয়ে সেগুলো ঐ বিষের মধ্যে ডুবিয়ে তারপর আবার ঐগুলো আপেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে। এইভাবে সমস্ত আপেল বিষাক্ত করবে এবং তখন আবার আপেলগুলো বস্তাবন্দী করে

মালপূর্ণ উটগুলো অন্যান্য উটের সঙ্গে মিশিয়ে পরের দিন রওয়ানা হবে। ডাকাতরা এসে তোমাদের আক্রমণ ক.লে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চেষ্টা কোর না, কারণ তাদের তুলনায় তোমরা থাকবে অনেক কম। বরং সমস্ত পদাতিক ও অশ্বারোহীদের নিয়ে অর্ধ ফারসাং দূরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। তারপর ডাকাতদের নিকট এসে সম্ভবতঃ দেখতে পাবে যে তাদের বেশীর ভাগই আপেল খেয়ে মরে গেছে। তরবারী দিয়ে যাদের পাবে তাদেরকে হত্যা করবে। তারপ। দশজন সুনিপুণ অশ্বারোহীকে আলাদা আলাদা ভাবে আমার দেওয়া আংটিসহ আবূ আলী ইলিয়াসের কাছে পাঠিয়ে তাকে প্রথমে তোম.দের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞ.ত করবে এবং পরে আমার নির্দেশ অনুযায়ী ঐ প্রদেশ আক্রমণ করতে বলবে— যাতে আর দস্যু ও অত্যাচারীদের কোন পাত্তা না থাকে। তারপর দলবল সহ নিরাপদে কিরমান সীমান্তে পেঁাছে সম্ভব হলে আবূ আলী ইলিয়াসের সঙ্গে মিলিত হবে।'

আমীর বললেন, 'আপনার আদেশ মেনে চলব। আমার অন্তর থেকেই বলছে যে আপনার অনুগ্রহে আমাদের যাত্রা শুভ হবে এবং ঐ রাস্তা কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য খোলা থাকবে।' এই বলে তিনি সুলতান মাহ্‌মুদের নিকট থেকে বিদায় নিলেন। দলবলসহ তিনি ইস্পাহানে এসে পেঁাছুলেন এবং সেখান থেকে দশ উটভর্তি আপেল নিয়ে কিরমানের দিকে রওয়ানা হলেন। ডাকাতেরা ইস্পাহানে গুপ্তচর পাঠিয়ে জানল যে একদল ব্যবসায়ী এতসব প্রাণী ও জিনিসপত্র নিয়ে আসছে যে গত হাজার বছরেও এমন কাফেলার কথা শুনা যায়নি; তবে তাদের সঙ্গে দেড় শত তুর্কী অশ্বারোহী রক্ষক আছে। ডাকাতেরা উল্লসিত হয়ে কুচবালুচের সমস্ত যুবককে ডাকল। অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চার হাজার লোক ব্যবসায়ী দলের অপেক্ষায় রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকল।

আমীর তাঁর ব্যবসায়ী দলসহ নির্দিষ্ট স্থানে পেঁাছলে সেখানকার অধিবাসীরা বলল, 'কয়েক হাজার ডাকাত তোমাদের বাধা দিবার জন্য কয়েকদিন যাবৎ অপেক্ষা করছে।' আমীর জিজ্ঞাসা করলেন, তারা এখান থেকে কত ফারসাং দূরে আছে। তারা বলল যে, পাঁচ ফারসাং দূরে আছে। যাত্রীদলের লোকেরা এই কথা শুনতে পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা সকলে ওখানেই থেমে গেল। বিকেল বেলা আমীর দলের নেতাদের এবং রক্ষীদের ডেকে বললেন, 'তোমাদের কাছে জীবন ও

সম্পত্তির মধ্যে কোনটা বেশী মূল্যবান।' তারা বলল, 'জীবন।' তিনি তখন বললেন, 'তোমরা সকলেই ধনী আর আমরা তোমাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত কিন্তু তবুও চিন্তিত নই। সুতরাং তোমরা কেন টাকা পয়সার জন্য চিন্তা কর যা তোমরা পুনরায় পেতে পার? সুলতান মাহ্‌মুদ নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি যখন আমাদের কারো প্রতি নারাজ ন'ন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ধ্বংস করার জন্য এখানে পাঠান নি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য এই সমস্ত ডাকাত দায়ের গা চিনে এক বৃদ্ধার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, সেগুলো পুনরুদ্ধার করা। তোমরা কি মনে কর যে, ডাকাতরা তোমাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাক সেটা তিনি চান? তোমরা মন খারাপ করো না। সুলতান মাহ্‌মুদ তোমাদের কথা ভুলে যান নি, তাঁর কি উদ্দেশ্য তা তিনি আমাকে বলেছেন। আগামীকল্য তাঁর কাছ থেকে আমাদের সাহায্য আসছে এবং আল্লাহ্‌র রহমতে সবই ঠিক হয়ে যাবে। তবে আমি যা যা বলব তোমাদের তাই করতে হবে; কারণ তার উপরই নির্ভর করবে তোমাদের ভবিষ্যৎ।'

কথাগুলো শুনে দলের লোকেরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হোল। তারা বলল, 'আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব।' তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যাদের কাছে অস্ত্র আছে এবং যুদ্ধ করতে পার তারা আমার কাছে আস।' সকলে আসলে তিনি গণনা করে দেখলেন যে পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলে মোট সংখ্যা হোল তিন শত সত্তর। তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'আজ রাত্রে আমরা রওয়ানা হব। অশ্বারোহীরা আমার সঙ্গে দলের সামনে থাকবে আর পদাতিকরা পিছনে। কারণ এই সমস্ত ডাকাত সব সময়েই জিনিসপত্র কেড়ে নেয়, কাউকে মারে না— যদি না কেউ প্রতি-আক্রমণ করে। আগামী কাল বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা তাদের ওখানে পৌঁছব। তারা আমাদের আক্রমণ করলে আমি পিছু হটে আসব। আমাকে পিছু হটে আসতে দেখলে তোমরাও তাই করবে। আমি কিছুটা যুদ্ধের ভান করব যতক্ষণ না আমাদের দূরত্ব অর্ধ ফারসাং-এর মত হয়। তখন আমি আবার তোমাদের সাথে মিলিত হব। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমরা সকলে একত্রে গিয়ে ডাকাতদের আক্রমণ করব এবং তখন তোমরা এক অবিশ্বাস্য জিনিস দেখতে পাবে; কারণ আমাকে এমন কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি এই ব্যাপারে এমন একটা জিনিস জানি যা তোমরা জান না। কাল তোমরা নিজেরাই

দেখতে পাবে এবং জানতে পারবে যে সুলতান মাহ্মুদ কত বড় মহান, এবং বুঝবে যে আমি যা বলছি তা সব সত্য।' তারা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রওয়ানা হোল।

রাত্রিবেলা আমীর আপেলের পাত্রগুলো খুলে ওর মধ্যে বিষ ভরে আবার পাত্রস্থ করলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব পাঁচজন লোককে দশটি ভর্তি আপেলের ভার অর্পণ করে বললেন, 'দলের উপর ডাকাত পড়লে আমরা যখন পালিয়ে যাব তখন তোমরা আপেলের পাত্রের বন্ধন খুলে দিয়ে ঝুলির মুখ ছেড়ে দিবে এবং কাত করে রাখবে তারপর তোমরা পালিয়ে যাবে।'

মধ্যরাত্রে তিনি সঙ্গীদের রওনা হতে হুকুম দিলেন। পূর্বের নির্দেশ অনুসারে তারা ভোর হওয়া অবধি রাস্তা চলল। ডাকাতেরা তিন দিক থেকে এসে তরবারী দিয়ে ব্যবসায়ীদলকে আক্রমণ করল। আমীর দুই তিনবার প্রতি-আক্রমণ করে এবং কয়েকটা তীর ছুঁড়ে আবার পিছ-পা হোলেন। পদাতিক সৈন্যরা ডাকাতদের দেখে পালিয়ে আসল। প্রায় অর্ধ ফারসাং দূরে আমীরের সঙ্গে তাদের দেখা হওয়ায় আমীর তাদের সেখানে রেখে দিলেন। ডাকাতরা যখন দেখল যে প্রহরীর সংখ্যা খুব কম এবং প্রহরীরা ও যাত্রীদলের লোকেরা পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা উৎফুল্ল হোল এবং আস্তে আস্তে জিনিসপত্রের বোঝাগুলো খুলতে লাগলো। আপেলের ঝুড়িগুলো পেয়ে সবগুলোই লুণ্ঠন করে নিল এবং সকলেই খুব খুশির সঙ্গে খেল। যারা ভাগে পেল না তারা অন্যের কাছ থেকে নিয়ে খেল। মোটকথা ওখানে এমন কেউ ছিল না যে, আপেল খায় নাই। ফলে এক ঘণ্টার মধ্যে সকলেই মৃত্যু শয্যায় শায়িত হোল।

সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পরে আমীর পাহাড়ের উপর গিয়ে ডাকাতদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে সকলেই সমভূমির উপর মরার মত পড়ে আছে। তখন তিনি উল্লাসে চীৎকার দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি! সুলতান মাহ্মুদের সহায়তায় ডাকাতেরা নিহত হয়েছে এবং খুব কমই বেঁচে আছে। হে বন্ধুরা, অতি শীঘ্র আস, বাকী যারা বেঁচে আছে তাদের আমরা ধ্বংস করে ফেলি।' তিনি ঘোড়ায় চড়ে অশ্বারোহীদের নিয়ে তাঁবুর দিকে চললেন এবং পদাতিক বাহিনী পিছে আসতে লাগল। তারা সেখানে পৌঁছে দেখতে পেল যে গোটা প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে শুধু মৃতদেহ, ঢাল, তলোয়ার, তীর ও ধনুক। ডাকাতদের মুষ্টিমেয় যে কয়জন বেঁচে ছিল তারাও সৈন্যদের

দেখে পালিয়ে গেল। আমীর ঘোড়ায় চড়ে তাদের পিছু নিলেন। পদাতিক বাহিনীও সঙ্গে চলল। তাদেরকে দুই ফারসাং পর্যন্ত যেতে হয়েছে তবু তারা বাকী ডাকাতদের না মেরে ফেরেনি। ডাকাতদের এমন কেউ জীবিত ছিল না যে তাদের দেশে গিয়ে খবর পৌছে দিতে পারে। আমীরের আদেশে ডাকাতদের অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে দেখা গেল যে কয়েক গাধার বোঝা হয়েছে। তারপর তারা সামনে এক জায়গায় গিয়ে দেখল দলের কারো এক কপর্দকও নষ্ট হয়নি। কাজেই তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সেখান থেকে যেখানে আবূ আলী ইলিয়াস ছিলেন—তার দূরত্ব ছিল বারো ফারসাং। আমীর তখন দশজন ভৃত্যকে সুলতান মাহ্‌মুদের আংটিসহ পাঠিয়ে আবূ আলী ইলিয়াসকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে দিলেন।

সুলতান মাহ্‌মুদ প্রদত্ত আংটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবূ আলী ইলিয়াস সৈন্য সামন্ত নিয়ে কুচবালুচ প্রদেশের দিকে ধাবিত হলেন। আমীরের সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে তারা দশ হাযারেরও বেশী অধিবাসীকে মেরে ফেলল, কয়েক হাযার দিনার কেড়ে নিল এবং প্রচুর পরিমাণে সৌখীন জিনসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও জীব-জানোয়ার দখল করে নিল। আবূ আলী ইলিয়াস আমীরের মারফৎ লুটের মালগুলো সুলতান মাহ্‌মুদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মাহ্‌মুদ এই বলে ঘোষণা জারি করে দিলেন, 'আমি ইরাকে আসার পর থেকে কুচবালুচের ডাকাতদের দ্বারা কারো কোন জিনিস লুণ্ঠিত হয়ে থাকলে তারা আমার কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারে।' যাদের অভিযোগ ছিল, তারা সবাই এসে জিনিসপত্র ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং তারপরে পঞ্চাশ বছর ধরে কুচবালুচ থেকে কোন রকম গোলমালের খবর পাওয়া যায়নি।

তারপর থেকে মাহ্‌মুদ গুপ্তচর ও গোপন সংবাদদাতা নিয়োগ করেছেন যাতে গজনীর কোন লোক অন্যায়ভাবে কারো কোন জিনিস নিয়ে গেলে অথবা কাউকে আঘাত করলে তিনি রায় থেকেই তা জানতে পেরে তার ক্ষতিপূরণ করতে পারেন। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সকল রাজা এই নিয়ম মেনে আসছেন। শুধুমাত্র সেলজুকের সময়েই প্রচলিত নিয়মের প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখান হয়নি।

আবূল ফযল সিগজী (সিস্তানের আমীর, যিনি ১০৭২ খ্রীস্টাব্দে মারা যান) একবার সুলতান আল্প আরসলানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর কোন গোপন সংবাদদাতা নাই কেন? তিনি জবাব দিলেন, 'আপনি কি চান যে আমি আমার রাজ্যকে ধূলিসাৎ করে দেই এবং আমার

অনুরাগীদের বিচ্ছিন্ন করে দিই?' সিগজী বললেন, 'তা হবে কেন?' সুলতান জবাব দিলেন, 'যদি আমি গুপ্তচর নিযুক্ত করি তাহলে আমার বিশেষ ভক্তরা যাদেরকে ভক্ত হিসাবে আলাদা কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের কোন যত্ন নিবে না বা তাদের কোন ঘুষও দিবে না। পক্ষান্তরে আমার শত্রুরা তাদের সঙ্গে মিতালী করে তাদেরকে ঘুষ দিবে। ফলে গুপ্তচরেরা নিশ্চয়ই আমার ভক্তদের বিরুদ্ধে খারাপ খবর দিবে এবং শত্রুদের সম্পর্কে দিবে ভাল খবর। খবর ভালই হোক আর খারাপই হোক তীরের মত। অনেকগুলো মারতে থাকলে একটা নিশ্চয়ই ঠিকমত লাগবে। এইভাবে আমরা ক্রমান্বয়ে ভক্তদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের পরিত্যাগ করে শত্রুদেরই আপন করে নেব, ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই দেখতে পাব যে, ভক্তরা সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর সে সব স্থান দখল করে নিয়েছে শত্রুরা। এইভাবে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয়ে যাবে।'

তবে এর চেয়ে সংবাদজ্ঞাপক রাখার প্রয়োজন বেশী। কারণ সংবাদজ্ঞাপক রাখা রাষ্ট্রের বিধানেই স্বীকৃত। তাদেরকে পূর্ববর্ণিত কাজের জন্য যথেষ্ট বিশ্বাস করলে আর কোন দুর্ভাবনার কারণ থাকে না।

এগারো অধ্যায়

রাজ-দরবার থেকে জারিকৃত নির্দেশাবলী এবং রাজাজ্ঞার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

রাজ-দরবার থেকে সর্বদাই নির্দেশ জারি করা হয়, তবে ঐগুলোর সংখ্যা যত বেশী হয় লোকের ভক্তি ওগুলোর প্রতি তত কমে যায়। বিশেষ জরুরী কিছু না হলে এই উচচাসন থেকে নির্দেশ জারি করা উচিত নয়। যখনই কোন নির্দেশ জারি করা হয়, সেটা এমন গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে যাতে লোকে তার কার্যকর মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সেটাকে অবজ্ঞা না করতে পারে এবং যদি জানা যায় যে কোন ব্যক্তি ঐ নির্দেশের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করে নাই অথবা ঐ আদেশ অবজ্ঞা করেছে, তাহলে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, এমন কি, সে যদি রাজার খুব পরিচিত একজনও হয়—সেখানেই রাজা এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে পার্থক্য।

সুলতান মাহ্মুদ ও অবাধ্য রাজস্ব আদায়কারীর গল্প

বর্ণিত আছে যে, এক বৃদ্ধা একটি অভিযোগ নিয়ে নিশাপুর থেকে গজনীতে গিয়েছিল। সুলতান মাহ্মুদের সঙ্গে দেখা করে সে এই বলে নালিশ করল, 'নিশাপুরের রাজস্ব আদায়কারী আমার ভূ-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিজে দখল করে নিয়েছে।' জমিটা ফেরত দিয়ে দেবার জন্য রাজস্ব আদায়কারীকে একটা চিঠি লেখা হোল। যেহেতু জমির দলীলটা রাজস্ব আদায়কারীর কাছে ছিল, তাই সে বলল, 'জমি আমার, কারণ আমার দলীল আছে এবং আমি দরবারে গিয়ে ঘটনা খুলে বলতে পারি।' স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় বারের জন্য গজনীতে গিয়ে তার অভিযোগ পেশ করল। রাজস্ব আদায়কারীকে নিশাপুর থেকে গজনীতে ডেকে পাঠান হলো। সুলতান রাজপ্রাসাদের তোরণ দ্বারে তাকে এক হাজার বেত্রাঘাত করতে আদেশ করলেন। তাকে বেত্রাঘাতের পূর্বে রাজস্ব আদায়কারী তার দলীল পেশ করল, সাক্ষী আনল এবং এক হাজার বেত্রাঘাতের পরিবর্তে এক হাজার দিনার ঘুষ দিতে চাইল। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না—তাকে বেত্রাঘাত খেতেই হোল। তারা এই বলে তাকে গালাগালি করল, 'জমিটা যথার্থ তোমার

হলেও তুমি আগে রাজার হুকুম মান্য করে পরে তোমার বক্তব্য পেশ করলে না কেন? তাহলে তখন যা যুক্তিযুক্ত তারই আদেশ হতো।’

এই শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল যে অন্যেরা যখন এই জাতীয় ঘটনা শুনবে তখন আর কেউ রাজাদেশ অমান্য করতে সাহস করবে না।

রাজার যা করণীয় বা শাস্তি দেওয়ার, সেটা কঠোর ভর্ৎসনাই হোক, শিরশ্ছেদই হোক, অঙ্গহানিই হোক, খোজা করাই হোক আর যে কোন রকমের শাস্তিই হোক না কেন, যদি তাঁর অনুমতি বা আদেশ ছাড়া অন্য কেউ তা করে সে রাজার নিজস্ব ভৃত্যই হোক আর ক্রীতদাসই হোক, রাজার সেটাতে সম্মত হওয়া উচিত নয়, বরং তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত; যাতে অন্যান্য সকলে সাবধান হয়ে যায় এবং যার যার অধিকার সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারে।

পারভেজ রাজা ও বাহরাম চুবিনের গল্প

কথিত আছে যে, পারভেজ রাজার সঙ্গে বাহরাম চুবিনের খুব সদ্ভাব ছিল। তিনি তাঁকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না, সেটা পানাহারের সময়ই হোক, কোন কাজের সময়ই হোক আর একাকী বৈঠক-খানায়ই হোক। অশ্বারোহণে ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে বাহরাম ছিলেন অদ্বিতীয়। এক দিন হেরাত ও শারাখ জেলা থেকে পারভেজ রাজার জন্য তিন শত লাল-কেশী উট এল। প্রত্যেকটা উট ভর্তি ছিল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে। তিনি বাহরামের বাড়ীতে সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখতে হুকুম দিলেন এবং তাঁর বাড়ীর কাজে ওগুলোর ব্যবহার করতে বললেন।

পরের দিন পারভেজ খবর পেলেন যে, ঐ রাত্রে বাহরাম চুবিন তাঁর ভৃত্যকে মেরেছে ও বিশটা বেত্রাঘাত করেছেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি বাহরামকে ডাকলেন। বাহরাম এলে রাজা অস্ত্রাগার থেকে পাঁচশত তলোয়ার আনতে হুকুম দিয়ে বললেন, ‘হে বাহরাম, তুমি এগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে ভাল তলোয়ারগুলো বেছে নাও।’ বাহরাম দেড়শত তলোয়ার বেছে নিলেন। তখন রাজা বললেন, ‘এখন এইগুলোর মধ্য থেকে তোমার পছন্দমত কতক-গুলো বেছে নাও।’ বাহরাম দশখানা বেছে নিলেন। পারভেজ রাজা আবার বললেন, ‘এই দশখানার থেকে এখন মাত্র দু’খানা বেছে নাও।’ বাহরাম দু’খানা বেছে নিলেন। তখন রাজা বললেন, ‘এখন তাদেরকে বল

দু'খানা তলোয়ার একটা খাপে ভরতে।' বাহরাম বললেন, 'হে রাজা, দু'খানা তলোয়ার একটা খাপে ভরা যায় না।' পারভেজ বললেন, 'তাহলে এক শহরে দু'জন নেতা কি করে থাকতে পারে?' একথা শুনেই বাহরাম নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বিনীতভাবে রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পারভেজ বললেন, 'তুমি আমার খুব অনুগত এবং আমি চাই না যাকে আমি নিজ হাতে উঁচুতে তুলে ধরেছি তাকেই আঘাত করি, তাই এই অন্যায়ের জন্যে তুমি ক্ষমা পেলে। ভবিষ্যতে বিচারের ভার আমার উপরই ছেড়ে দিও। কারণ আল্লাহ্ আমাকেই দুনিয়ার বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন, তোমাকে নয়। কারো কোন অসুবিধা থাকলে তাকে আমার কাছে আসতে দাও, যাতে আমি সদ্ভাবে তার বিচার করতে পারি। এরপরে তোমার কোন অনুগত বা ক্রীতদাস যদি কোন অন্যায় করে তাহলে তুমি প্রথমে আমাকে জানাবে। আমরা এমন উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব যেন কাউকেই অন্যায়ভাবে শাস্তি ভোগ করতে না হয়। আমি এই বারের মত তোমাকে ক্ষমা করলাম।'

পারভেজ রাজা এইরূপ ভর্ৎসনাই করেছিলেন বাহরাম চুবিনকে—যিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

বারো অধ্যায়

জরুরী কাজে রাজ-দরবার থেকে পেয়াদা পাঠান

সাধারণতঃ দরবার থেকে ঘন ঘন পেয়াদা পাঠান হয়, কখনও রাজার আদেশে কখনও বা বিনা আদেশে। তারা লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং জোরপূর্বক টাকা আদায় করে। দুই শত দিনার সংক্রান্ত কোন মামলা হলে ভৃত্যরা যেয়ে উপরি পাওনা হিসাবে পাঁচ শত দিনার নেয়; ফলে লোকগুলো ভীষণ অসুবিধায় পড়ে এবং অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোন জরুরী বিষয় না হলে পেয়াদাদের পাঠান উচিত নয়। আর তাদের পাঠালেও একমাত্র রাজকীয় আদেশেই পাঠান উচিত। তাদেরকে সঠিক-ভাবে বলে দেওয়া উচিত কত পাওনা আছে এবং তারা তার বেশী এক পয়সাও উপরি হিসাবে নিতে পারবে না। তাহলেই সবকিছু ঠিকঠাক মত চলবে।

তেরো অধ্যায়

দেশের ও জনগণের মঙ্গলার্থে গুপ্তচরদের ব্যবহার করা

গুপ্তচরদের সর্বদাই ব্যবসায়ী, পথচারী, দরবেশ, ফেরীওয়ালা (ঔষধ) এবং ভিক্ষাজীবীর বেশ ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে হবে যাতে কোন ঘটনাই গোপন না থাকে এবং কখনও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সময় মত তার সমাধান করা যায়। অতীতে অনেক সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তা, রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধি, কর্মচারী এবং সেনাপতিরা বিদ্রোহ করতে মনস্থ করেছে এবং রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু গুপ্তচরেরা আগে থেকে সেই মতলব ফাঁস করে দিয়েছে এবং রাজাকে বলে দিয়েছে ; ফলে রাজা সঙ্গে সঙ্গেই সসৈন্যে এসে তাদের ধরতে পেরেছেন এবং তাদের মতলব ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এমন কি, যদি কোন বিদেশী রাজা কিংবা সেনাপতিও রাজ্য আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং গুপ্তচরেরা যদি তখন রাজাকে বলে দেয়, তাহলে রাজা সহজেই প্রস্তুত হয়ে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন। সেইরূপভাবে গুপ্তচরেরা কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল-মন্দ খবর আনত এবং রাজা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতেন ; যেমন একবার অদুদ আদ্দৌলা করেছিলেন।

দাইলাম রাজাদের মধ্যে অদুদ আদ্দৌলার মত সতর্ক, চালাক এবং দূরদর্শী আর কেউ ছিলেন না। তিনি একজন বিরাট সংগঠক ছিলেন, তাঁর খুব উচ্চাকাঙ্খা এবং ক্ষমতা ছিল। একদিন একজন সংবাদদাতা তাঁকে লিখল ঃ আপনার নির্দেশিত কাজ করতে আমি শহর-তোরণ দিয়ে যেতে যেতে বেশ কিছু দূর গিয়েছি এমন সময় দেখতে পেলাম রাস্তার পার্শ্বে একটি ছেলে বিষণ্ণবদনে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে দেখে সালাম করল। আমি তার প্রত্যুত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি কারণে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?' সে বলল, 'আমি একজন সাথী খুঁজছি যার সঙ্গে আমি এমন শহরে যেতে পারি যেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা ও একজন ন্যায়বিচারক আছে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে, তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি অদুদ আদ্দৌলার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ রাজা এবং এই শহরের কাজীর চেয়েও অধিক জ্ঞানী বিচারকের সন্ধান চাও।' সে বলল, 'রাজা যদি ন্যায়পরায়ণ হোত এবং সবকিছু সম্পর্কে

জাত থাকত তাহলে বিচারকও সৎ হোত। যেহেতু বিচারক সৎ নয়, রাজা অমনোযোগী হবেই।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি রাজার মধ্যে কি অমনোযোগিতা পেয়েছ বা বিচারকের মধ্যে কি অসততা পেয়েছ?' সে বলল, 'আমার বক্তব্য অনেক ছিল, কিন্তু যেহেতু এখন আমি এই শহর ত্যাগ করছি, আমি বেশী কিছু বলব না।' আমি বললাম, 'আমাকে তোমার কাহিনী বলতেই হবে।' সে বলল, 'চলুন, তাহলে আমরা গল্প বলতে বলতে পথ অতিক্রম করি।'

আমরা এক সঙ্গে চলতে চলতে সে বলতে লাগল, 'আমি অমুক ব্যবসায়ীর ছেলে এবং এই শহরের অমুক জেলায় আমার পিতার বাড়ী আছে। সকলেই জানে আমার পিতা কোন্ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁর কিরূপ ধন সম্পত্তি ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক বছর আমি খুব মদ খাই এবং অতিরিক্ত অমিতাচারের মধ্যে থাকি। তারপর আমার ভীষণ অসুখ হয় এবং বাঁচার আশা ছেড়ে দেই। ঐ অসুখের সময় আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি যে, যদি আমি ভাল হয়ে যাই তাহলে হজ্ করতে যাব এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। যাই হোক, আল্লাহ্‌র রহমতে আমি ভাল হয়ে উঠি।

'আমি সুস্থ হবার পর হজ্বে যেতে মনস্থ করলাম। ভাবলাম, পরে আগে ধর্মযুদ্ধে যাব। আমি আমার সব ক্রীতদাসী ও ভৃত্যদের মুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে স্বর্ণালঙ্কার, বাড়ী ও জমিজমা দিয়ে দেই এবং তাদের বিয়ে ঠিক করে দেই। তারপর আমার বাকী সম্পত্তি ও জমিজমা বিক্রি করে নগদ ৫০,০০০ দিনার পাই। আমি ভাবলাম, আসা-যাওয়ার পথে অনেক বিপদ হতে পারে তাই সব টাকা সঙ্গে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই আমি ৩০,০০০ দিনার সঙ্গে নিতে মনস্থ করলাম এবং বাকী ২০,০০০ দিনার রেখে যেতে চাইলাম। আমি গিয়ে দুটো তামার পাত্র কিনে প্রত্যেকটিতে ১০,০০০ করে দিনার ভরলাম। ওগুলো কার কাছে জমা দেব সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত শহরের প্রধান কাজীর কাছে রাখাই মনস্থ করলাম। আমি ভাবলাম, তিনি একজন বিজ্ঞ লোক ও একজন বিচারক। রাজা সমস্ত মুসলমানদের জীবন ও বিষয়-সম্পত্তির বিষয়ে তাঁর উপরে নির্ভরশীল এবং তাঁকে বিশ্বাস করেন— তিনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে প্রতারণা করবেন না। তাঁর কাছে গিয়ে আমি সব বললাম। তিনি প্রস্তাবটা গ্রহণ করে নিলেন। আমি রাত্রে গিয়ে পাত্র দুটো তাঁর কাছে দিয়ে এলাম। তারপর আমি হজ্বে গেলাম।

মক্কা থেকে মদীনায় গেলাম এবং সেখান থেকে রুম সাগরের দিকে বেড়াতে গেলাম। আমি সৈনিকদলে মিশে ধর্মযুদ্ধে কয়েক বছর অতিবাহিত করি। কোন এক যুদ্ধে আমি আক্রমণের সময়ই ধরা পড়ে যাই এবং মুখে, উরুতে ও হাতে আঘাত পাই। রুমীয়রা আমাকে বন্দী করে নেয় এবং চার বছর জেলে থাকার পর হঠাৎ রুমী সম্রাটের অসুখ হলে সব বন্দীদের মুক্ত করে দেয় (তার রোগমুক্তির জন্য)। জেল থেকে বের হবার পর আবার তাদের হাতে ধরা পড়ে যাই এবং এইবার আমার ভাড়া যোগানোর জন্য তাদের অধীনে অনেক দিন কাজ করি। সব সময়ই আমার মনে ভরসা ছিল যে, বাগদাদের কাজীর কাছে আমার ২০,০০০ দিনার গচ্ছিত আছে, আর এই আশায়ই আমি ফিরে আসার জন্য রওনা হলাম।

দশ বছর পরে নিঃস্ব অবস্থায় আমি বাগদাদে ফিরে এলাম; কাপড়-চোপড় ছিল ছেঁড়া আর এত দিনের কষ্টে শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পর পর দু'দিন কাজীর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করে তাঁর সামনে বসলাম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। তৃতীয় বারের মত গিয়ে তাঁকে শান্তভাবে বললাম, 'আমি অমুকের ছেলে অমুক। হজ্জ করে ও ধর্মযুদ্ধ থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছি। আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এবং যা সঙ্গে নিয়েছিলাম সব খরচ হয়ে গিয়েছে। আমাকে যে অবস্থায় দেখছেন এর বাইরে এক কপর্দকও আর অবশিষ্ট নেই। আমি আপনার কাছে যে দুটো মোহরভর্তি পাত্র গচ্ছিত রেখে ছিলাম, এখন তা আমার খুবই প্রয়োজন। তখন কাজী উত্তরে একটা কথাও বললেন না, এমন কি তিনি এটাও বললেন না, "তুমি মাথামুণ্ডু কি চাচ্ছ?" তিনি কিছু না বলে উঠে নিজের কামরায় চলে গেলেন। আমি নিরাশ হয়ে চলে এলাম, কিন্তু আমার এই দুঃস্থ অবস্থা নিয়ে নিজের বাড়ীতে অথবা কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে যেতেও লজ্জা হল। রাত্রে এক মসজিদে ঘুমাতাম আর দিনের বেলা এক কোণায় আত্ম গোপন করে থাকতাম। এইভাবে কয়েকবার আমি প্রধান কাজীকে বলেছি, কিন্তু তিনি কোন উত্তরই দেন নি। সপ্তম দিনে আমি একটু কড়া ভাবে বললে তিনি আমাকে বললেন, "তুমি হতাশায় ভুগছ। ভ্রমণের কষ্টে তোমার মস্তিষ্ক শুকিয়ে গেছে এবং প্রলাপ বকা শুরু করেছ। আমি তোমাকে চিনি না বা তুমি কি বলছ, তাও জানি না। আর তুমি যার কথা বলছ, সে ছিল দেখতে সুন্দর ও ভাল পোশাক পরিহিত। আমি বললম, "হে কাজী, আমিই সেই ব্যক্তি। কিন্তু দুঃখকষ্টে আমা

চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, মুখ বিভিন্ন আঘাতে বিশ্রী হয়ে গেছে।” তিনি বললেন, “দূর হয়ে যাও। আমাকে জ্বালাতন কোর না।” আমি বললাম, “হে কাজী, মনে রাখবেন, আল্লাহ্ আছেন। এ দুনিয়ার পরেও আরেকটা দুনিয়া আছে এবং এখানকার প্রতিটি কাজের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি পেতে হবে।” তিনি বললেন, “আমাকে বিরক্ত কোর না। দূর হয়ে যাও।” আমি তখন বললাম, “২০,০০০ দিনারের থেকে ৫,০০০ আপনাকে দিব।” তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি আবার বললাম, “হে কাজী, আমি নিজ ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে আপনাকে একটা পাত্র দিয়ে দিলাম। আপনি দয়া করে আমাকে অন্যটা ফেরৎ দিন; কারণ আমি খুব অসুবিধায় আছি। তাছাড়া আমি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে এই বলে লিখে দিতে রাজি আছি যে, আপনার কাছে আমার কোন দাবী নাই।” শুনে কাজী বললেন, “তুমি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছ এবং এমন সব কথাবার্তা বলছ যে তোমাকে পাগল বলে সনাক্ত করা উচিত এবং পাগলা গারদে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা দরকার—যেখানে তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে। সারা জীবন ছাড়া পাবে না।” শুনে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, তিনি পুরা টাকাটাই রাখতে চান এবং তিনি যা হুকুম করবেন তাই ত পালন করা হবে। শান্তভাবে সেখান থেকে চলে এসে নিজেই বার বার প্রবাদটি বলতে লাগলাম: “মাংস থেকে গন্ধ আসলে তার মধ্যে লবণ দাও; কিন্তু যদি লবণ থেকে গন্ধ আসে তাহলে কি করা?” কাজীর মাধ্যমেই ন্যায়বিচার করা হয়, কিন্তু যদি কাজীই অসৎ হন তাহলে কার মাধ্যমে ন্যায়বিচার হবে? এখন অদুদ আদ্দৌলা যদি ন্যায়পরায়ণ হতেন তাহলে আমার ২০,০০০ দিনার কাজীর কাছে থাকতে পারত না, তাহলে আমারও এভাবে ক্ষুধার্ত ও দুঃস্থ অবস্থায় পড়তে হোত না অথবা আমাকে আমার জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি, শহর ও দেশ পরিত্যাগ করতে হোত না।’

সংবাদদাতা লোকটার কাহিনী ও অবস্থার কথা শুনে খুব দুঃখিত হলেন এবং বললেন, ‘হে মহান বন্ধু, নিরাশ হবেন না। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন, কারণ একমাত্র আল্লাহ্ই তাঁর বান্দাদের দুঃখ মোচন করেন।’ তিনি তাকে বললেন, ‘এই গ্রামে আমার একজন উদার ও অতিথিপরায়ণ বন্ধু আছে এবং আমি তার ওখানে বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে থাকায় ভালই হোল এবং আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। আজ আমরা বন্ধুর বাড়ীতে থাকব, তারপর দেখা যাক আগামী

কল্যাণ কি হয়।' তারা দু'জনে বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে বেশ আপ্যায়িত হোল। তারপর সংবাদদাতা ঐ লোকটার সম্পর্কে সবকিছু লিখে একজন গ্রামবাসীকে এই বলে দিল, 'যাও, অদুদ আদ্দৌলার রাজপ্রাসাদে গিয়ে অমুক ভৃত্যকে ডেকে তার হাতে এই চিঠিখানা দিয়ে এস। তাকে বোল যে অমুক ব্যক্তি চিঠিখানা দিয়েছে এবং সে যেন বিলম্ব না করে চিঠিখানা অদুদ আদ্দৌলার হাতে দেয় এবং চিঠিখানার একটা উত্তর নিয়ে আসে।' লোকটা গিয়ে ভৃত্যটির হাতে চিঠিখানা দিল এবং ভৃত্যটিও সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা অদুদ আদ্দৌলার হাতে পৌঁছে দিল।

অদুদ আদ্দৌলা চিঠিখানা পড়ে খুব ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক দ্বারা সংবাদদাতাকে বলে পাঠালেন যে, সে যেন পরের দিন বিকালেই ঐ লোকটাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসে। সংবাদদাতা শুনে লোকটাকে বললেন, 'চলুন আমাদের শহরে যাওয়া উচিত। অদুদ আদ্দৌলা আমাদের দু'জনকেই ডেকেছেন।' লোকটা তখন বলল, 'সেটা কি ভাল হবে?' সংবাদদাতা বললেন, 'নিশ্চয়ই এটাতে আপনার মঙ্গল হবে। হয়ত আপনার দুঃখের কাহিনী অদুদ আদ্দৌলার কানে গিয়েছে। আমি আশা করি, আপনি শীঘ্রই আপনার আকাঙ্খিত বস্তু পেয়ে যাবেন এবং আপনার দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে।' তিনি লোকটাকে নিয়ে অদুদ আদ্দৌলার দরবারে এসে পৌঁছলেন। রাজা লোকটাকে বসতে দিয়ে তাকে তার দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটা তাঁকে পুরা কাহিনী বলল। শুনে অদুদ আদ্দৌলা খুব দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন, 'চিন্তা করো না। আমিই সব ঠিক করে দেব, তোমার কিছু করতে হবে না। কাজী আমার অধীনস্থ একজন কর্মচারী, সেইজন্য কাজীর বিচার করা আমার কর্তব্য; কারণ আল্লাহ্ দেশের কর্তৃত্ব করার ভার আমার উপর দিয়েছেন, যাতে কারও কোন অসুবিধা না হয়—বিশেষ করে কাজী যাতে অবিচার না করতে পারে। আমি তার উপর মুসলমানদের জীবন ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছি। সেজন্য তাকে মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হয় যাতে সে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে কাজ করতে পারে, কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখায়, কারো ভয় না করে বা কারো কাছ থেকে ঘুষ না খেয়ে যাতে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে পারে। আর একজন বৃদ্ধ ও জ্ঞানী বিচারকই যদি এইরূপ কাজ করেন এবং তা রাজধানীতে বসে, তাহলে অল্প বয়স্ক অসাবধান বিচারকরা কতদূর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? এই কাজী প্রথমে একজন অতি সাধারণ লোক ছিল। তার

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল অনেক, কিন্তু তার আয় ছিল মাত্র তার বেতনের টাকা। আজ সে বাগদাদে এত এত সম্পত্তির মালিক ; তাছাড়া তার আড়ম্বরপূর্ণ জিনিসপত্রের সংখ্যাও অগণিত। তার ঐ মাইনে থেকে এত সব সঞ্চয় করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, সে মুসলমানদের থেকেই এত সব সম্পত্তি করেছে।' তখন তিনি লোকটার দিকে ফিরে বললেন, 'যতদিন না আমি তোমার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দিতে পারি, আমার আহার-নিদ্রা কিছুই ভালভাবে হবে না। যাও, কাজীর থেকে টাকা তুলে ইস্পাহানে চলে যাও। ওখানে কোন বিশেষ বণিকের সঙ্গে অবস্থান করতে থাক। আমি তাকে ততদিন পর্যন্ত তোমার দেখাশুনা করার কথা লিখে দিচ্ছি যতদিন না আমি তোমাকে আবার ডেকে পাঠাই।' তিনি তখন লোকটাকে দুই শত দিনার এবং পাঁচ জোড়া কাপড় দিয়ে ঐ রাত্রেই ইস্পাহানে পাঠিয়ে দিলেন। সারা রাত ধরে অদুদ আদ্দৌলা ভাবলেন কি করে কাজীর থেকে টাকাগুলো আদায় করা যায়, তিনি নিজের মনেই বললেন, 'আমি যদি নিজের ক্ষমতার বলে কাজীকে বন্দী করি এবং তার প্রতি উৎপীড়ন করি তাহলে সে কখনও তার নিজের দুরাত্মাপনা স্বীকার করবে না, তার ফলে টাকাটা আর পাওয়া যাবে না। তাছাড়া লোকে কানাঘুষা শুরু করবে এবং বলবে, 'অদুদ আদ্দৌলা কাজীর মত একজন বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ লোককে জোরপূর্বক গ্রেফতার করেছে এবং তার সম্পত্তি কেড়ে নেবার জন্যে তার প্রতি উৎপীড়ন করছে। দুর্নামটা দেশের দূরতম আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। আমাকে নিশ্চয়ই কাজীর দুরাত্মাপনা উদ্‌ঘাটন করার এক পন্থা বের করতে হবে, যাতে লোকটা তার টাকা ফেরত পায়।'

এরপর এক মাস বা দুই মাস গত হয়ে চলল, কিন্তু কাজী স্বর্ণের মালিকের আর দেখা পেলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'আমি 10,000 দিনার লাভ করেছি, তবে আমাকে আরো এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে হয়ত তার মরার খবর পাব, কারণ শেষ বারের বার আমি তাকে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে আমি নিশ্চিত যে সে খুব শীঘ্র মরে যাবে।'

দুই মাস পরে একদিন ঠিক দুপুরে অদুদ আদ্দৌলা কাজীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আপনি কি জানেন, কেন আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে ডেকে এনেছি?' কাজী বললেন, 'আপনিই ভাল জানেন।' রাজা বললেন, 'ভবিষ্যৎ-

চিন্তায় আমি এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি যে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। দুনিয়ার প্রতি ও রাজ্যের প্রতি সব মোহ আমার নষ্ট হয়ে গেছে। কারো প্রতি আর ভরসা পাই না। দুটো পথ খোলা আছে, হয় কিছু ভুঁইফোড় লোক হঠাৎ এসে আমাদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেবে, যেমনি করে আমরা অন্যের থেকে নিয়েছিলাম এবং দেখবে যে সিংহাসনে বসার পূর্বে আমরা কি করতাম অথবা সিংহাসনে বসে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবার পূর্বে মৃত্যু এসে আমাদের গ্রাস করবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেহই রেহাই পাবে না। তবে যদি দুনিয়াতে সৎ পথে থাকি এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করি, তবে যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন লোকে আমাদের কথা স্মরণ করবে এবং কেয়ামতের দিন আমরা মুক্তি পাব এবং বেহেশতে যেতে পারব। কিন্তু আমরা যদি অসৎ হই এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের অমঙ্গল সাধন করি তবে যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন লোকে আমাদের মন্দ বলবে, কেয়ামতের দিন আমাদের শাস্তি হবে ও দোযখে আমাদের স্থান হবে। সেই জন্যই যতদূর সম্ভব আমাদের ন্যায়পথে চলা উচিত, লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং দান-খয়রাত করা উচিত। যাই হোক, আপনার কাছে এতসব বলার উদ্দেশ্য হোল যে আমার অনেকগুলো স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে। তবে ছেলেদের বিষয়টা তেমনি কিছু না, কারণ তারা সহজেই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে, কিন্তু মেয়েদের অবস্থা ভাববার বিষয়, কারণ তারা দুর্বল ও অসহায়। সেইজন্য এখন থেকেই তাদের কথা চিন্তা করছি, কারণ আগামীকাল আমি মরেও যেতে পারি অথবা রাজ্য পরিবর্তনও হতে পারে। তখন ত আর আমার কিছু করা সম্ভব হবে না। আমি বিশ্বাস করি, সারা রাজ্যে আপনারমত চরিত্রবান, দয়ালু, ধার্মিক ও বিশ্বাসী আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই আমি আপনার নিকট স্বর্ণ ও মুক্তার ২০,০০,০০০ দিনার গচ্ছিত রাখতে চাই আর তা যেন আপনি, আমি ও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানতে না পারে। ভবিষ্যতে যদি আমার এমন কিছু হয় যাতে আমার স্ত্রী-কন্যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে তাহলে আপনি গোপনে তাদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে টাকাগুলো ভাগ করে দিবেন এবং তাদেরকে সুপাত্রে বিয়ে দিয়ে দিবেন, যাতে পরে আবার তাদের ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে না হয়। এই অর্থ আমার মনে হয়, আপনার বাড়ীর মধ্যস্থ কামরাগুলোর যে-কোন একটিতে একটি ভূগর্ভস্থ গর্ত করে ব্যাপারটা আরো নিরাপদ করতে পারেন। গর্ত খনন করার কাজটা শেষ হলে আমাকে খবর দিবেন। আমি এক রাত্রে খাঁ

এই ধরনের বিশ জন হত্যাকারীকে জেল থেকে নিয়ে আসব। তারা আপনার বাড়ীতে টাকা বহন করে নেবে, গর্তের মধ্যে পুঁতে রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বের হয়ে আসবে। তারপর আমি তাদের সকলকে হত্যা করব, যাতে ব্যাপারটা গোপন থাকে।' কাজী তখন বললেন, 'আপনার জন্য এই কাজ করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।' তখন রাজা একটা ভৃত্যকে ধনাগার থেকে দুই শত পশ্চিমী দিনার এনে দিতে হুকুম করলেন।

ভৃত্যটি দিনারগুলো আনলে, অদুদ আদ্দৌলা সেগুলো নিয়ে কাজীর সামনে রেখে বললেন, 'গর্ত খনন করার জন্য এই দুই শত দিনার ব্যবহার করবেন। এতে কম পড়লে আরো পাঠিয়ে দেব।' কাজী তখন বললেন, 'হে রাজা! আল্লাহ্‌র রহমতে এতটুকু খরচ করবার ক্ষমতা আমার আছে।' অদুদ আদ্দৌলা বললেন, 'আমি চাই না যে আপনি আমার কাজে আপনার নিজের টাকা খরচ করেন। আপনার সদুপায়ে অর্জিত টাকা এখানে খাটানোর জন্য নয়। আপনাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেটাই যদি করেন তাহলেই আপনার করণীয় সবকিছু শেষ হবে।' কাজী শুনে বললেন, 'আপনার যা আদেশ।' তারপর তিনি ঐ দুই শত দিনার পকেটস্থ করে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তিনি খুব আনন্দিত হয়ে ভাবলেন, 'বৃদ্ধ বয়সে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে এবং আমার ঘর সোনায় ভরে যাচ্ছে। রাজার কিছু ঘটলে, বা রাজার মৃত্যুর পর কারো কিছু দাবী থাকবে না; পুরা টাকাটাই আমার এবং আমার ছেলে-মেয়েদের হয়ে যাবে। আগের পাত্র দু'টির মালিকও ত বেঁচে থাকতেও আমার কাছ থেকে তার ২০,০০০ দিনারের এক-দশমাংশও আদায় করতে পারে নি। আর রাজার মৃত্যুর পর কেউ আমার থেকে কিছু নিতে সক্ষম হবে না! তিনি বাড়ী গিয়ে এক মাসের মধ্যেই গর্ত করে নিরাপদ কক্ষ প্রস্তুত করে নিলেন। একদিন রাত্রে এশার নামাজের সময় তিনি অদুদ আদ্দৌলার প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলেন। অদুদ আদ্দৌলা তাঁকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার। এমন সময় কেন?' তিনি বললেন, 'আপনাকে জানাতে এলাম যে, আপনি যা হুকুম করে-ছিলেন তা করা হয়েছে।' শুনে অদুদ আদ্দৌলা বললেন, 'শুনে খুব খুশী হলাম। আমি জানতাম যে আপনি সব কাজে খুব আগ্রহশীল। আল্লাহ্‌র কাছে শোকরিয়া যে আপনার সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিল তা মিথ্যা হয় নি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনাকে যে পরিমাণ টাকার কথা বলেছিলাম তার মধ্যে এখন আমার কাছে সোনা ও

মুক্তা মিলে ১৫,০০,০০০ দিনার আছে এবং আমার আরো ৫,০০,০০ দিনার দরকার। তাই আমি (পোশাক, ধূপ, অম্বর এবং কর্পূরের) আড় পূর্ণ জিনিসের কিছু অংশ আলাদা করে রেখেছি এবং আমি অল্প অল্প ঐগুলো বিক্রি করে টাকা যোগাড় করছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই টা পাব এবং তখন সব টাকা একত্র করে আপনার বাড়ীতে পৌছে দে কিন্তু আগামী কল্য রাত্রে আমি ছদ্মবেশে একবার আপনার ওখানে গি নিজের চোখে দেখতে চাই যে, ভূগর্ভস্থ গর্তটি কেমন হয়েছে। আপনা কিছু করতে হবে না, আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।' তিনি কাজী বিদায় দিয়েই একজন বার্তাবাহককে ইস্পাহানে পাঠিয়ে দিলেন ঐ লোকটা আনতে। পরের দিন মধ্যরাত্রে তিনি কাজীর বাড়ীতে ভূগর্ভস্থ দেখতে গেলেন। দেখে তাঁর পছন্দ হোল, তিনি কাজীকে বলে 'আপনি বরং আগামী মঙ্গলবারে আমার ওখানে এসে দেখেন কতদূ যোগাড় হয়েছে।' কাজী বললেন, 'ঠিক আছে।' কাজীর বা থেকে ফিরে রাজা তাঁর কোষাধ্যক্ষকে একটা কামরার মধ্যে একশত চল্লি মোহর ভর্তি পাত্র রেখে তার উপরে মুক্তাপূর্ণ তিনটি ফ্লাস্ক, একটি নীলকা মণি পূর্ণ সোনার পেয়ালা, এক পেয়ালাভর্তি চুনি এবং এক পেয়ালা নীলকান্ত মণি রাখতে হুকুম দিলেন।

মঙ্গলবার আসতেই কোষাধ্যক্ষ রাজার হুকুমমত সব করে ফেল অদুদ আদ্দৌলা কাজীকে ডেকে সঙ্গে করে যেখানে জিনিসগুলো রা হয়েছিল সেখানে নিয়ে গেলেন। পাত্রগুলো দেখে কাজী বিস্মিত হ গেলেন। অদুদ আদ্দৌলা তখন বললেন, 'এগুলো সবই এই সপ্তা মধ্যে আপনার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' তখন তাঁরা কামরা থেকে বে হয়ে এলেন এবং কাজী খুব আনন্দচিত্তে বাড়ী ফিরে এলেন। পরে দিন ঐ লোকটিও এসে হাজির হোল। অদুদ আদ্দৌলা তাকে বলে 'আমার মনে হয় তুমি সোজা গিয়ে কাজীর সঙ্গে দেখা কর এবং যে তুমি তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছ এবং অনেকদিন অপেক্ষা করে কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। শহরের সমস্ত লোকই জানে তোমার এবং তোমার পিতার সম্পত্তির পরিমাণ কত ছিল আর দরকার হ তারা সকলে তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে। কাজী যদি তোমার টাকা ফে দিয়ে দেয় তাহলে ত ভালই আর না দিলে তুমি সোজা রাজা আদ্দৌলার কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে এবং তার ফলে কাজী এমন দশা হবে যাতে সারা দুনিয়া সাবধান হয়ে যাবে। যেয়ে দে

কাজী কি বলে। যদি তোমার জিনিস ফেরত দিয়ে দেয় তবে ঐগুলো ঐ অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে আসবে আর না দিলেও তা আমাকে অতি শীঘ্র জানিয়ে দেবে।'

লোকটা কাজীর কাছে গিয়ে ঠিক ঐভাবে কথাবার্তা বলল। তাতে কাজী মনে করলেন, 'লোকটা যদি আমার সম্বন্ধে কোন কুমতলব আঁটে এবং রাজা অদুদ আদ্দৌলার কাছে গিয়ে নালিশ করে তাহলে রাজার মনে হয়ত আমার প্রতি সন্দেহ জাগতে পারে, ফলে তিনি তাঁর সঞ্চিত সম্পদ আমার কাছে না-ও পাঠাতে পারেন। তাই লোকটাকে তার জিনিস ফেরত দিয়ে দেওয়াই উত্তম, কারণ এতসব মণিমুক্তাসহ একশত পঞ্চাশটি সোনার পাত্র নিশ্চয়ই দুটো পাত্রের চেয়ে অনেক বেশী দামী।' তাই তিনি লোকটাকে বললেন, 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তোমাকে আমিও খুঁজছি।' কিছুক্ষণ পরে কাজী একটা কামরার মধ্যে গেলেন। লোকটাকেও সেখানে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি আমার নিজের ছেলের মত। তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি তোমার জিনিস নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে, তোমাকে আমি সর্বদাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ্‌র কাছে শোকরিয়া যে, আমি তোমার দেখা পেয়েছি এবং আমার দায়িত্ব পালন করতে আমি সক্ষম হয়েছি। তোমার সোনার পাত্র এখনও ওখানেই আছে।' তিনি তখন ভিতরে গিয়ে পাত্র দুটো এনে বললেন, 'এটাই কি তোমার জিনিস?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, ওটাই আমার।' তখন কাজী বললেন, 'তোমার জিনিস নাও এবং যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাও।' লোকটা দুটো ভৃত্যকে ডেকে তাদের কাঁধে করে পাত্র দুটো নিয়ে সোজা রাজা অদুদ আদ্দৌলার প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

লোকটা যখন রাজপ্রাসাদে পৌঁছল, অদুদ আদ্দৌলা তখন রাজ্যের সব পাত্র মিত্রদের নিয়ে পরিষদে বসেছেন। লোকটি রাজার সামনে গিয়ে সসম্মানে তাঁকে জিনিসগুলো দেখাল। জিনিসগুলো দেখে রাজা হেসে উঠলেন এবং বললেন 'খোদার রহমতে তোমার ন্যায়-অর্জিত সম্পত্তি তুমি ফেরত পেয়েছ এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজীর প্রতারণার কথাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তবে তুমি জান না যে তোমার স্বর্ণমুদ্রা আদায় করতে আমাকে কি পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।' পাত্র-পারিষদরা সকলে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হতে চাইলেন। অদুদ আদ্দৌলা তাঁদেরকে বললেন, লোকটি কিভাবে বিপদে পড়েছিল এবং তিনি তাকে সাহায্য করতে কি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। তখন তিনি প্রধান

তত্ত্বাবধায়ককে কাজীকে পাগড়ীবিহীন অবস্থায় তাঁর সামনে আনতে হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ অবস্থায় কাজীকে অদুদ আদ্দৌলার কাছে নিয়ে আসা হল।

কাজী যখন ঐ লোকটিকে পাত্র দু'টিসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তখন তিনি ভাবলেন, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে।' তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারলেন যে অদুদ আদ্দৌলার এত সব কিছু করার এবং বলার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র পাত্র দুটো আদায় করা। অদুদ আদ্দৌলা তখন তাঁর প্রতি গর্জন করে উঠে বললেন, 'আপনি একজন বৃদ্ধ লোক, জ্ঞানী ও বিচারক। তা ছাড়া আপনার এক পা প্রায় কবরে, এই অবস্থায় আপনি কি করে একটা লোককে প্রতারণা করে তার গচ্ছিত সম্পদ মেরে দিতে প্রয়াস পান? এই যদি আপনার অবস্থা হয়, তাহলে অন্যান্যদের থেকে আমরা কি আশা করতে পারি? এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনি যে সম্পত্তি করেছেন সব অন্যান্য মুসলমানদের সম্পত্তি ও ঘুষের টাকা থেকে। এ দুনিয়ায় আমি আপনাকে শাস্তি দিচ্ছি আর পরকালেও নিশ্চয়ই কুকর্মের শাস্তি হবে। আপনার বৃদ্ধ বয়স ও পাণ্ডিত্যের কথা চিন্তা করে আপনাকে জীবনে মারছি না কিন্তু আপনার সব ধন-সম্পত্তি রাজ-কোষাগারে যাবে।' রাজা তখন কাজীর সমস্ত জমা-জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াফত করে দিলেন এবং তাঁকে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। পাত্র দু'টি ঐ লোকটিকে দিয়ে দিলেন। সে আনন্দে চলে গেল।

সুলতান মাহ্মুদ ও অসৎ বিচারকের গল্প

সবুক্তিগিনের পুত্র সুলতান মাহমুদেরও এই জাতীয় অভিজ্ঞতা ছিল। একদিন তিনি যখন ভ্রমণে যাচ্ছিলেন, তখন একটি লোক এইভাবে একখানা দরখাস্ত দেয়ঃ শহরের কাজীকে বিশ্বাস করে সবুজ একটি খামে তার কাছে দুই হাজার দিনার নিরাপদে জমা রাখতে দিয়ে আমি ভ্রমণে চলে যাই। রাস্তায় হিন্দুস্তানের ডাকাতরা আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়। ফিরে এসে কাজীর কাছে গিয়ে আমি আমার গচ্ছিত টাকা ফেরত নিয়ে আসি। কিন্তু বাড়ী এসে খামটা খুলে দেখি সব তামার মুদ্রা। আমি কাজীর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, আমি যখন আপনার কাছে খামটা জমা দেই তখন ওটা ভর্তি ছিল সোনা আর এখন এটা তা

জানা। এটা কিভাবে হোল?' কাযী বললেন, 'তুমি যখন ওটা আমার কাছে জমা দিয়েছিলে তখন নিজেও গোণনি বা আমাকেও কোন কিছু দেখাওনি। তুমি খামটা মুখবন্ধ এবং সীলমোহর করা অবস্থায় নিয়েছিলে এবং ঠিক ঐ অবস্থায়ই নিয়ে গেছ। ফেরত দেবার পূর্বে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ওটা তোমার কিনা, আর তুমিও ওটা তোমার বলেই নিয়েছিলে। এখন তুমি একটা মিথ্যা অজুহাত নিয়ে এসেছ।' এই বলে তিনি আমাকে বের করে দিলেন। হে সুলতান, আপনার আল্লাহর দোহাই, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। কারণ আমার আমার কিছুই নেই। সুলতান মাহ্‌মুদ দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'চিন্তা কোর না। আমি নিশ্চয়ই তোমার সোনা উদ্ধার করে দেব। যাও খামটা আমার কাছে নিয়ে এস।' লোকটা গিয়ে খামটা এনে সুলতানকে দিলেন। তিনি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন যে খামটা খোলার কোন ছিদ্রই নেই। তখন তিনি লোকটাকে বললেন, 'তুমি খামটা আমার কাছে রেখে যাও আর আমার গোমস্তার থেকে প্রতি দিনে তিন সের আটা এবং একসের মাংস এবং মাসে একটি করে দিনার নিয়ে যাবে যাতে যতদিন আমার সোনা উদ্ধার করতে লাগে ততদিন তোমার না খেয়ে থাকতে না হয়।' তারপর একদিন দিবানিদ্রার পর সুলতান মাহ্‌মুদ খামটা সামনে রেখে চিন্তা করতে লাগলেন যে ব্যাপারটা কিভাবে ঘটতে পারে। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন যে খামটা কেটে খুলে সোনাগুলে বের করে পরে আবার ওটার মুখ বন্ধ করে কাজটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর তোশকের উপর বিছানো খুব সুন্দর একটা স্বর্ণনির্মিত বিছানার চাদর ছিল। মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে জেগে নীচে নেমে এসে একটা চাকু যোগাড় করে বিছানার চাদর থেকে প্রায় অর্ধগজ কেটে আবার শোবার ঘরে চলে গেলেন। পরের দিন খুব ভোরে তিনি তিন দিনের জন্য শিকারে চলে গেলেন।

ঐ কামরা পরিষ্কার করার জন্য একজন বিশিষ্ট ঝাড়ুদার ছিল। পরের দিন সকালে সে ঐ কামরা পরিষ্কার করতে গিয়ে বিছানার চাদরের প্রায় অর্ধগজ ছেঁড়া দেখতে পেয়ে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং কান্না শুরু করল। অন্য একজন বৃদ্ধ ঝাড়ুদার তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি হয়েছে?' সে বলল, 'আমার বলতে সাহস হয় না।' বৃদ্ধ ঝাড়ুদার বলল, 'ভয় পেয়ো না, তুমি আমাকে বল।' সে বলতে শুরু করল, 'কে যেন আমার সাথে শত্রুতা করে সুলতানের কামরায় গিয়ে তাঁর বিছানার চাদরের প্রায় অর্ধগজ ছিঁড়ে ফেলেছে। সুলতান দেখলে

আমাকে মেরে ফেলবেন।' বৃদ্ধ ঝাড়ুদার তখন বলল, 'তুমি ছাড়া কি অন্য কেউ এটা দেখেছে?' সে বলল, 'না, দেখেনি।' তখন বৃদ্ধ বলল, 'চিন্তা কোর না। কি করতে হবে আমি জানি এবং তোমাকেও শিখিয়ে দেব। প্রথমতঃ সুলতান শিকারে গিয়েছেন, দ্বিতীয়তঃ আহমদ নামে এই শহরে একজন মধ্যবয়স্ক মেরামতকারী আছে। অমুক জায়গায় তার দোকান আছে আর সে হোল শহরের সবচেয়ে অধিক পারদর্শী মেরামতকারী, অন্যান্য সকলে তার শিষ্য। বিছানার চাদরটি তার কাছে নিয়ে যাও। সে যা মুজুরী চায় তাই দিবে। ফলে এমন করে মেরামত করে দিবে যে এমনকি বিশেষ পারদর্শীরাও বলতে পারবে না যে কোথায় মেরামত করা হয়েছে।' ঝাড়ুদার সোজা আহমদের দোকানে গিয়ে বলল, 'জনাব, আপনি এটা এমন নিখুঁতভাবে মেরামত করে দিবেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে এবং তার জন্য কত মজুরী নিবেন?' মেরামতকারী বলল, 'ওটা মেরামত করতে অর্ধ দিনার লাগবে।' তখন ঝাড়ুদার বলল, 'আমি আপনাকে পুরা এক দিনার দেব, কিন্তু আপনাকে আপনার যথাশক্তি দিয়ে এটা মেরামত করতে হবে।' সে বলল, 'ধন্যবাদ! তোমাকে আমার কাজ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না।' ঝাড়ুদার তাকে এক দিনার দিয়ে বলল, 'কাজটা আমি খুব তাড়াতাড়ি চাই।' সে বলল, 'আগামী কল্য বিকালে এসে নিয়ে যেয়ো।' পরের দিন নির্ধারিত সময়ে ঝাড়ুদার গেলে মেরামতকারী বিছানার চাদরটি দিয়ে দিল। সে চাদরটি হাতে নিয়ে বুঝতে পারল না যে কোথায় ছেঁড়া ছিল। তাই সে আনন্দিত হয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে চাদরটি তোশকের উপর বিছিয়ে দিল।

সুলতান শিকার থেকে ফিরে এসে তাঁর ঘরে গেলেন। তিনি তাকাতেই দেখতে পেলেন তাঁর বিছানার চাদর অখণ্ড অবস্থায় আছে। তিনি ঝাড়ুদারকে ডাকতে বললেন। ঝাড়ুদার আসলে সুলতান বললেন, 'এই বিছানার চাদর ছেঁড়া ছিল, এটা কে মেরামত করেছে?' সে বলল, 'হুযুর এটা কখনও ছেঁড়া ছিল না। তারা মিথ্যা কথা বলেছে।' তিনি বললেন, 'হে বোকা, ভয়ের কিছু নাই, আমিই এটা ছিঁড়েছিলাম, তবে এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমাকে সত্য কথা বল, কোন মেরামতকারী এটা মেরামত করেছে?' ঝাড়ুদার বলল, 'হুযুর, অমুক মেরামতকারী মেরামত করেছে।' তখন সুলতান হুকুম করলেন, 'তুমি এক্ষণই গিয়ে লোকটাকে এখানে নিয়ে আস। তাকে গিয়ে আমার কথা বল। আর সে রাজপ্রাসাদে আসলেই তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

ঝাড়ুদার দৌড়ে গিয়ে মেরামতকারীকে সুলতানের কাছে নিয়ে আসল। মেরামতকারী সুলতানকে একাকী বসে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। সুলতান তাকে বললেন, 'ভয় পাবার কিছুই নাই। আমাকে বল, তুমি কি এটা মেরামত করেছিলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি এটা মেরামত করেছি।' সুলতান বললেন, 'মেরামতটা তুমি খুব সূক্ষ্মভাবে করেছ।' সে বলল, 'আপনার দোয়ায় ওটা ভালভাবেই করা হয়েছিল।' তিনি তখন জানতে চাইলেন, 'এই শহরে তোমার চেয়েও বেশী পারদর্শী অন্য কেউ আছে কি?' সে বলল, 'না—নেই।' তিনি বললেন, 'এখন আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। তুমি সত্য জবাব দিবে।' সে বলল, 'রাজার সঙ্গে সত্য কথা বলার চেয়ে আর উত্তম কাজ কি আছে?' সুলতান তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'গত ছয় সাত বছরে তুমি কি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কোন সবুজ বুটি তোলা খাম মেরামত করেছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ আমি করেছি', তিনি জানতে চাইলেন, 'কোথায় করেছ?' সে বলল, 'শহরের কাযীর বাড়ীতে করেছি এবং তিনি আমাকে দুই দিনার মজুরী দিয়েছিলেন।' তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'খামটা পুনরায় দেখলে কি তুমি চিনতে পারবে?' সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ পারব।' সুলতান তাঁর তোশকের মধ্যে হাত দিয়ে খামটা বের করে মেরামতকারীর হাতে দিয়ে বললেন, 'এটাই কি সেই খাম? সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি তখন বললেন, 'আমাকে দেখাও, তুমি কোথায় মেরামত করেছিলে।' মেরামতকারী দাগের উপর হাত দিয়ে দেখাল। এমন সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে যে সুলতান দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'প্রয়োজন হলে তুমি কি কাযীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে?' সে বলল, 'কেন পারব না?' সুলতান তখনই কাযীকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন এবং খামের মালিককেও ডেকে আনতে হুকুম করলেন।

কাযী এসে সুলতানকে সালাম করে অন্যান্য দিনের মত বসলেন। মাহমুদ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আপনি একজন বৃদ্ধ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। আমি আপনাকে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করতে দিয়েছি এবং আপনার বিচারের উপরই নির্ভর করে তাদের জীবন ও বিষয়-সম্পত্তি। আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী দুই তিন হাযার লোক থাকা সত্ত্বেও আমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আপনাকে নিযুক্ত করেছি। আর আপনি কি এটা ভাল করেছেন যে, অসত্যের প্রশ্রয় নিয়ে বিশ্বস্ততার অবমাননা করে এবং একটা মুসলমানকে তার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেগুলি

অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন?' কাযী বললেন, 'জনাব, আপনি এগুলো কি বলছেন এবং কোথা থেকে শুনেছেন?' সুলতান বললেন, 'হে ভণ্ড কুকুর, তোমার দ্বারাই এ-কাজ সম্ভব হয়েছে আর সেটা আমিই বলছি।' তক্ষুণই তিনি খামটা দেখিয়ে আবার বললেন, 'তুমি কি এই খামটা চেনো? এটাই তোমার কাছে গচ্ছিত রাখবার জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল আর তুমি এটার মুখ খুলে স্বর্ণগুলো বের করে তার স্থলে তামা ভরে খাম মেরামত করে পূর্বের ন্যায় রেখে দিয়েছো। তারপর তুমি খামের মালিককে বলে দিয়েছো যে, সে যেরূপভাবে মুখ বন্ধ করে খামটা তোমার কাছে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেইরূপ অবস্থায়ই আবার ফেরৎ নিয়ে গেছে। এইরূপ ব্যবহারকে কি তুমি সদাচরণ এবং ন্যায় ব্যবহার বলতে চাও? তখন কাযী বললেন, 'এই খামটাও এর পূর্বে কখনও আমি দেখি নাই আর আপনি কি বলছেন তার মর্মার্থও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' সুলতান তখন হুকুম করলেন, 'ঐ লোক দু'জনকে নিয়ে আস।' একজন ভৃত্য গিয়ে খামটার মালিককে ও মেরামতকারীকে নিয়ে আসল। সুলতান তখন কাযীকে বললেন, 'হে মিথ্যাবাদী, তোমার সামনের এই লোকই হচ্ছে সোনার মালিক আর অপর জন মেরামতকারী, যে খামটা মেরামত করেছিল।' শুনে কাযী খুব লজ্জিত হল; তাঁর চেহারা মলিন হয়ে গেল; ভয়ে সে এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও আর বের হোল না। তখন সুলতান হুকুম করলেন, 'তাকে ধরে প্রতিজ্ঞা করাও সে যেন খামওয়ালার সোনা ফেরত দিয়ে দেয় নতুবা আমি তাকে ফাঁসিতে ঝুলাব।' তারা কাযীকে অর্ধমৃত অবস্থায় সুলতানের সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে হাজতখানায় রাখল। কাযী তখন তার গোমস্তাকে একটা সঙ্কেত লিখে পাঠিয়ে দিল এবং গোমস্তা ১,০০০ নিশাপুরী উৎকৃষ্ট দিনার নিয়ে এলে সেগুলো খামের মালিককে দেওয়া হোল।

পরের দিন সুলতান মাহ্মুদ জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য দরবার বসালেন এবং সেখানে তিনি কাযীর প্রতারণার কথা জনসমক্ষে বলে দিলেন। সুলতানের আদেশে কাযীকে আনা হোল এবং তাকে প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ চূড়া থেকে ফেলে দিতে মনস্থ করা হোল। কিন্তু দরবারের সম্ভ্রান্তরা তাঁর বৃদ্ধ বয়স ও জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে তাঁর জন্য সোপারেশ করলেন। শেষে কাযী নিজেকে মুক্ত করার জন্য ৫০,০০০ দিনার দিতে রাযী হোলো এবং তাঁর ঐ টাকার বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করা হোল, কিন্তু তাঁকে তার চাকুরি করার অধিকার আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

এই ধরনের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আলোচ্য গল্পগুলো বর্ণনা করা হোল যাতে সুলতান বুঝতে পারেন যে, বিভিন্ন রাজারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে কিভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, অত্যাচারিদের অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য তাঁরা কত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অন্যায়-কারীদের দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁরা কি সব প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। একজন রাজার জন্য শক্তিশালী সেনা-বাহিনী থাকার চেয়ে ন্যায়বিচার করার প্রয়োজন অনেক বেশী। আল্লাহ্‌র রহমতে সুলতানের দুটো দিকই আছে। এই অধ্যায়ে গুপ্তচর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তবে খুব বিশ্বস্ত লোকদের দ্বারা এই কাজ করান উচিত। আর এই ধরনের বেশী লোক যোগাড় করে দেশের সর্বত্র পাঠান দরকার।

চৌদ্দ অধ্যায়

বার্তাবহদের সর্বদা কর্মব্যস্ত রাখা

বার্তাবহদের প্রধান প্রধান রাজপথে নিযুক্ত করা এবং তাদেরকে মাসে মাসে বেতন ও ভাতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ এটা করলে সারা দিন রাত্রি ৫০ ফারসাং পরিধির মধ্যে যা ঘটবে তা তাদের কানে এসে পৌঁছুবে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাদের কার্যপ্রণালী তদারক করার জন্য পদস্থ পুলিশ কর্মচারী রাখারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

পনেরো অধ্যায়

সুরামত্ত অবস্থায় মৌখিক আদেশে সতর্কতা

রাজ্য, জায়গীর এবং প্রদত্ত জিনিস সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার মৌখিক আদেশ মন্ত্রণাগৃহে এবং ধনাগারে পেঁাছে। এদের মধ্যে কিছু আদেশ বিশেষ আনন্দমুহূর্তে দেওয়া হতে পারে, তবে এই জাতীয় দুরূহ ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এমনও হতে পারে যে, দূত আদেশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে একমত নাও হতে পারে বা সে আদেশটি সঠিকভাবে নাও শুনতে পারে। এই জাতীয় বিষয়ে একজনের উপরই দায়িত্ব দেওয়া উচিত এবং তার অন্য কোন সহকারীর সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই আদেশটি পেঁৗছে দেওয়া উচিত। এটাই নিয়ম হওয়া উচিত যে, যে সমস্ত আদেশে সন্দেহ জাগে সেগুলো পাওয়া সত্ত্বেও কার্যকরী করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দেওয়ান থেকে ঐ আদেশের মর্মার্থ পুনরায় পাঠিয়ে নিশ্চিত করবে।

ষোল অধ্যায়

গৃহনবিস এবং তার গুরুত্ব ও দায়িত্ব

গৃহনবিসের ব্যবহার এখন আর সচরাচর হয় না। এই কাজ সর্বদা সুপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হোত, কারণ গৃহনবিসের কাজই হোল রাজ প্রাসাদ, রন্ধনশালা, ভূগর্ভস্থ কামরা, অশ্বশালা, রাজার ছেলেমেয়ে এবং অনুচর দেখাশুনা করা। তাছাড়া রাজার সঙ্গে কথাবর্তা বলার জন্য প্রত্যহ রাজদরবারে তার প্রবেশাধিকার থাকত। দিনের বেলা সর্বক্ষণই তার রাজার ডাকে সাড়া দেবার জন্য, কোন উপদেশের জন্য এবং যে-কোন ব্যবস্থা ও লেনদেন সম্পর্কিত হিসাবপত্র দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হোত। সেইজন্যই তাকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য সসম্মানে এবং মর্যাদার সঙ্গে থাকা দরকার।

সতেরো অধ্যায়

সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে

প্রত্যেক রাজারই উপযুক্ত বন্ধু থাকে, যাদের সঙ্গে তিনি স্বাধীন-ভাবে এবং অন্তরঙ্গতার সাথে মিশতে পারেন। সর্বদা পাত্র-পারিষদ এবং সেনাপতির সঙ্গে থাকলে রাজার জাঁকজমক এবং মর্যাদা কমে যায়, কারণ এর ফলে তাঁর মেজাজ চড়া হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ যারা রাজ্যের কোন পদে সমাসীন তাদেরকে রাজার বন্ধু হতে দেওয়া উচিত নয়। অথবা যারা রাজার বন্ধু তাদরকেও কোন রাজপদে নিযুক্ত করা উচিত নয়। কারণ রাজার সঙ্গে সহজভাবে মেশার ফলে তারা যে অধিকার ভোগ করবে, তার দ্বারা তারা স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করবে এবং লোকের প্রতি অত্যাচার করবে। কর্মচারীদের সব সময়ই রাজা সম্পর্কে একটা ভীতি থাকার প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে বন্ধুদেরও অতি সহজভাবে মেলামেশার প্রয়োজন থাকে। একজন কর্মচারী যদি বন্ধুভাবাপন্ন হয়, তাহলে তার কৃষকদের প্রতি অত্যাচার করতে ঝোঁক উঠবে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বন্ধুভাবাপন্ন না হয় তাহলে তার সাহচর্যে রাজা কোন আনন্দ বা আমোদ-প্রমোদ পাবেন না। বন্ধুদের রাজার সঙ্গে মেশার জন্যে নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। দরবার শেষে সম্ভ্রান্তরা চলে গেলে শুরু হয় তাদের পালা।

বন্ধু থাকার কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ তারা রাজাকে পরামর্শ দেয় ; দ্বিতীয়তঃ যেহেতু তারা রাজার সঙ্গে দিবারাত্র সব সময় থাকে, তারা রাজার প্রহরীর মত কাজ করে, কখনও কোন বিপদ ঘটলে তারা রাজাকে নিজেদের শরীর দিয়ে রক্ষা করে ; তৃতীয়তঃ রাজা তাঁর বন্ধুদের কাছে রাজারও যরুরী ও কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলতে পারেন, যা তাঁর মন্ত্রী বা পাত্র-পারিষদের কাছে বলা সম্ভব নয় ; চতুর্থতঃ রাজা তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে সব রকমের খবর শুনতে পারেন, কারণ বন্ধুরা রাজার সঙ্গে অতি সহজ হওয়ার ফলে তারা অনায়াসেই ভাল, মন্দ, মাতলামি ইত্যাদি সব খবরই রাজার কাছে পৌঁছে দিতে পারে এবং এর ফলে রাজার অনেক উপকারও হয়।

বন্ধুদের সুশিক্ষিত, মার্জিত এবং প্রফুল্ল হতে হবে। তার বিশ্বাস খুব মজবুত হতে হবে, সব জিনিসের গোপনীয়তা রক্ষা করার

ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তাকে ভাল কাপড়-চোপড় পরতে হবে। তাকে প্রচুর কৌতুকপ্রদ এবং চিন্তাশীল গল্প জানতে হবে এবং সেগুলো সুন্দরভাবে বলার ক্ষমতাও থাকতে হবে। তাকে সর্বদা খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে এবং একজন ভাল সঙ্গী হতে হবে। তাকে অক্ষক্রীড়া ও দাবা খেলা জানতে হবে আর কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে জানলে ত খুবই উত্তম। তাকে সর্বদা রাজার মতের সঙ্গে সমমত হতে হবে এবং রাজা কোন কিছু বললে বা করলে তাকে নিশ্চয়ই বাহবা বলতে হবে এবং বলতে হবে 'চমৎকার হয়েছে'। তার 'এটা করুন' এবং 'ওটা করবেন না' ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে রাজা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এবং ফলে তাকে আর পছন্দ করবেন না। ভোজ, পানাহার, শিকার, পোলো খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি জাতীয় আমোদ-স্ফূর্তিতে রাজার তার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, কারণ এই জাতীয় কাজের জন্যই বন্ধুদের প্রয়োজন। অন্যদিকে যমি চাষ, সেনাবাহিনী, কৃষক সম্প্রদায়, যুদ্ধাভিযান, শাস্তি, উপহার, গুদাম এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজাকে মন্ত্রী, রাজ্যের সংভ্রান্তগণ এবং অভিজ্ঞ মুরব্বীদের সঙ্গে পরামর্শ করাই উচিত, কারণ এই সমস্ত ব্যাপারে তারাই বেশী পারদর্শী। আর এইভাবে চললেই সবকিছু সহজ হয়ে যাবে।

অতীতে অনেক রাজা তাঁদের ডাক্তারকে অথবা গণককে বন্ধু হিসাবে রাখতেন, যাতে তাঁরা তাঁদের থেকে ভাল-মন্দ উপদেশ নিতে পারেন। ডাক্তার রাজার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতেন আর গণকের কাজ ছিল ভাল-মন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করা। গণক সময় গণনা করে সব জিনিসের শুভ মুহূর্ত বলে দিত। অন্য রাজারা আবার ডাক্তার এবং গণককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলতেন, 'আমরা যা খেতে চাই ডাক্তার তাই খেতে নিষেধ করে, অসুখ না হলেও ঔষধ দেয় এবং কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও রক্তপাত ঘটায়। আর গণকরা আমরা যা করতে চাই তা করতে প্রতিরোধ করে এবং জরুরী কাজে বাধা দেয়। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দুই দলের লোকেরাই আমাদেরকে শুধুমাত্র দুনিয়ার সুখ-শান্তি উপভোগ করতে বাধা দেয় এবং জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। সেইজন্যই শুধুমাত্র তখনই তাদেরকে ডাকা উচিত যখন তাদেরকে আমাদের প্রয়োজন থাকে।'

বন্ধুকে আরো বেশী সম্মান করা হয় যদি সে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী হয় এবং যদি সে বড় বড় লোকের অধীনে কাজ করে থাকে। রাজার বন্ধুদের প্রকৃতি দেখেই রাজার চরিত্র ও মেজাজ সম্পর্কে ধারণা করা হয়। বন্ধু

যদি সৎ-স্বভাব, অমায়িক, উদার, ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং অনুগ্রহশীল হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে রাজা উদারচেতা, সৎ-মেজাজী, চরিত্রবান এবং অহমিকাহীন। অন্যদিকে তাঁর বন্ধুরা যদি খিটখিটে, উদ্ধত, বোকা, কৃপণ এবং লম্পট হয় তাহলে বুঝা যাবে যে রাজার মেজাজ অপ্রীতিকর, বদ-মেজাজ, রাগী এবং নৈতিক চরিত্রহীন।

তাছাড়া প্রত্যেক বন্ধুর এক একটি বিশিষ্ট স্থান থাকা উচিত এবং তাদের মর্যাদাও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত। এই নিয়ম প্রাচীন কাল থেকেই প্রত্যেক রাজা এবং খলীফার দরবারেই পালিত হয়ে আসছে এবং এখনও পালন করা হচ্ছে। তার পিতার যত বন্ধু ছিল বর্তমান খলীফার বন্ধুর সংখ্যাও ঠিক তত। গজনীর সুলতানদের ২০ জন বন্ধু থাকত, তার মধ্যে ১০ জন থাকত দাঁড়িয়ে আর ১০ জন থাকত বসে এবং এই নিয়ম সামানিদের সময় থেকে চলে আসছে। রাজার বন্ধুদের বেতন দেওয়া উচিত এবং অনুচরবর্গের মধ্যে তাদেরকেই বেশী সম্মান করা উচিত। আর বন্ধুদেরও জানা দরকার যে নিজেদেরকে কি করে শাসনে রাখতে হয়। তাদের ভদ্র হতে হবে এবং রাজার প্রতি অনুরাগ থাকতে হবে।

আঠার অধ্যায়

বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করা গভীর বিচারবুদ্ধি, উচচ জ্ঞানসম্পন্ন ও দূরদৃষ্টির লক্ষণ। প্রত্যেক মানুষেরই জ্ঞানবুদ্ধি আছে এবং প্রতি বিষয়েই কেউ বেশী জানে কেউ কম জানে। কারো জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে হয়ত সেটা ব্যবহার করেনি আবার অন্য একজন ঠিক অতটুকু জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সেটা ব্যবহার করেছে বা ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ একজন লোক হয়ত বইতে কোন বিশেষ রোগমুক্তির কথা পড়েছে এবং তার ঐ রোগ চিকিৎসার জন্য প্রতিটি ঔষধের নাম জানা আছে কিন্তু সেটা সে কখনও কাজে লাগায়নি। অন্য একজন ঠিক সমপরিমাণ জ্ঞান দিয়েই বহুবার বহু লোককে চিকিৎসা করেছে। এই ক্ষেত্রে দু'জনের স্থান একই রূপ হতে পারে না। তেমনিভাবে যে লোক দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে শীত-গ্রীষ্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার সঙ্গে এমন একজন লোকের তুলনা হয় না যে কোন দেশ ভ্রমণ করেনি এবং যার কোন অভিজ্ঞতা নেই। সে জন্যই বলা হয় যে, প্রত্যেকেরই জ্ঞানী, বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে উপদেশ নেওয়া উচিত। কেউ কেউ খুব বুদ্ধিদীপ্ত এবং অতি সহজে কোন ঘটনা সম্পর্কে বুঝতে পারে আবার অনেকেই তুলনামূলকভাবে বুদ্ধিহীন। জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন, 'একজন লোকের উপদেশ একটি লোকের শক্তির সমতুল্য আর দশ জন লোকের উপদেশ দশটা লোকের শক্তির সমতুল্য।' দুনিয়ার সকলেই স্বীকার করে যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ন্যায় জ্ঞানী আর কেউ নাই। পিছে, সামনে, আকাশে, মাটিতে বাড়ি, খোদার আরশ, বেহেশত, দোযখ সবই দেখতে পেতেন এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত ছিল। তাছাড়া জিব্রাইল (আঃ) মাঝে মাঝে এসে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যেতেন এবং ভূত-ভবিষ্যতের সংবাদ দিয়ে যেতেন। কিন্তু এতসব অলৌকিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁকে বলতেন, (কুরআন ৩ঃ ১৫৩)' 'হে মুহম্মদ (সঃ) যখনই তুমি কোন কাজ কর বা যখনই কোন জরুরী কাজ তোমার সামনে আসে, তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ কর।' যখন আল্লাহ্ই তাঁহাকে উপদেশ নেবার জন্য আদেশ দিয়ে

এমন কি তাঁর নিজেরও উপদেশের প্রয়োজন হোত, তখন এটা সুস্পষ্ট যে হজরত মুহম্মদের (সঃ) চেয়ে উপদেশ নেবার প্রয়োজন কারো বেশী নয়।

তাই যখনই রাজাকে কোন কিছু করতে হয় বা কোন জরুরী কাজ তাঁর সামনে আসে তখন বিজ্ঞদের ও বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে উপদেশ নেওয়া তাঁর কর্তব্য। প্রত্যেকেই তার মনের কথা বলবে এবং তারপরে প্রত্যেকের মতের সঙ্গে রাজার মতের তুলনা করে দেখা উচিত। সকলের মতামত আলোচনা করার পর সত্যিকার পন্থা সহজ হয়ে পড়ে এবং সেটাই উপযুক্ত পন্থা, যেটাকে সকলেই একমত হয়ে আবশ্যক মনে করে।

যে লোক কোন ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ নেয় না সে দুর্বল-চেতা আর এ জাতীয় লোকদের বলা হয় একগুঁয়ে। যথাযোগ্য পারদর্শী ছাড়া কোন কাজই করা যায় না এবং আলোচনা ছাড়া কোন কাজেই কৃতকার্য হওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র রহমতে সুলতানের মধ্যে গভীর বিচার-বুদ্ধিও আছে আর তাঁর পরিচালনা-পরিষদে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকের সমাবেশও আছে।

উনিশ অধ্যায়

বিশেষ রক্ষীদের প্রয়োজনীয় বস্তু ও তাদের পরিচালন ব্যবস্থা

সুন্দর চেহারা ও স্বাস্থ্য এবং পৌরুষ ও সাহসী দেখে দুইশত বিশেষ রক্ষী দরবারে রাখা উচিত। তাদের মধ্যে একশত খোরাসানী আর বাকী একশ' দাইলামী হওয়া উচিত। এই বিশেষ রক্ষীদের কাজ হবে দেশে-বিদেশে সর্বদা রাজার সঙ্গে থাকা। তারা স্থায়ীভাবে দরবারের সঙ্গে জড়িত থাকবে তাই তাদের পোশাক কেতাদুরস্ত হওয়া দরকার। দুইশত জনের অস্ত্র তাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; তারা যখন কাজ শুরু করে তখন তাদের দিতে হবে আবার কাজ শেষ হলে তাদের থেকে নিয়ে নিতে হবে। তবে তার মধ্যে বিশখানা তলোয়ার ঝুলাইবার কটিবন্দ্ এবং বিশখানা ঢাল স্বর্ণমণ্ডিত হতে হবে এবং বাকী একশত আশিখানা কটিবন্দ্ ও ঢাল হবে রৌপ্যমণ্ডিত। সঙ্গে খাটের (পারস্য উপকূলের একটি দ্বীপ) বল্লমও থাকতে হবে। রক্ষীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে বেতন ও ভাতা দিতে হবে। প্রতি পঞ্চাশ জনের জন্য একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার থাকবে (সার্জেণ্ট) যার কাজ হবে তার অধীনস্থ লোকদের খবরাখবর নিয়ে তাদেরকে শাসনে রাখা। রক্ষীবাহিনীর প্রত্যেককে অশ্বারোহণে পারদর্শী হতে হবে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঘোড়ার সাজ দিতে হবে যাতে জরুরী সময়ে তারা তাদের কর্তব্য পালনে পিছ-পা না হয়।

বিভিন্ন জাতের থেকে চার হাজার সাধারণ সৈন্যের নাম সর্বদা তালিকাভুক্ত করে রাখা উচিত। তার মধ্যে এক হাজার থাকবে শুধুমাত্র রাজার জন্য আর বাকী তিন হাজার গবর্নরদের ও সেনাপতিদের অনুচর-বর্গদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—যাতে যে-কোন জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করা যায়।

বিশ অধ্যায়

মূল্যবান পাথর খচিত বিশেষ অস্ত্রের রীতি ও ব্যবহার

স্বর্ণ, মুক্তা এবং অন্যান্য অলঙ্কার খচিত বিশ প্রকারের বিশেষ অস্ত্র সর্বদাই কোষাগারে মজুদ রাখা দরকার যাতে কখনও বিদেশ থেকে কোন রাজদূত আসলে সুন্দরভাবে সজ্জিত বিশজন ভৃত্য অস্ত্রগুলি হাতে করে সিংহাসনের চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সুলতান এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছেন যে, তিনি এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি না করলে চলে কিন্তু তবুও রাজার উদারতার সঙ্গে খাপ খাইয়েই রাজ্যের জাঁকজমক রক্ষা করতে হয়। এখন সুলতানের চেয়ে বড় রাজা আর কেহ নাই এবং তাঁর রাজ্যের মত এত বড় রাজ্য আর কোন রাজার নাই; সে জন্যই অন্য যে-কোন রাজার কোন জিনিস একটা থাকলে সুলতানের দশটা থাকা উচিত আর যেখানে অন্য কোন রাজার দশটা আছে সেখানে সুলতানের একশতটি থাকা উচিত। কারণ সব ঐশ্বরিক ও পার্থিব সম্পদ তাঁর করায়ত্ত। তাছাড়া তাঁর বিচারবুদ্ধিও গভীর। এক কথায় মর্যাদা ও আধি-[illegible] কিছুরই তাঁর অভাব নাই।

একুশ অধ্যায়

রাজ-প্রতিনিধি এবং তাদের প্রতি ব্যবহার

বিদেশ থেকে কোন রাজ-প্রতিনিধির আসার পূর্বে তাদের আগমন-বার্তা সম্পর্কে কেউ অবহিত থাকে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা শহরে এসে পৌঁছে। তাদের আসার খবর কেউ দেয় না এবং তাদের আগমন-প্রস্তুতিও কেউ করে না ফলে তারা নিশ্চয়ই মনে করে যে আমরা তাদের সম্পর্কে উদাসীন এবং অমনোযোগী। সেজন্য সীমান্তের অফিসারদের বলতে হবে যে, যখনই কোন লোক তাদের কাছে উপস্থিত হয় তারা একজন অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে খবর নিবে কে আসছে, তার সঙ্গে কত লোক আছে, তার মধ্যে কতজন অশ্বারোহী আর কতজন পদাতিক, তার সঙ্গে মালপত্র কত আছে এবং কি উদ্দেশ্যে সে এসেছে। একজন বিশ্বস্ত লোককে তাদের সঙ্গে পাঠান উচিত যে তাদেরকে নিকটতম শহরে পৌঁছে দিবে। সেখানে আবার সে অন্য একজন প্রতিনিধির হাতে তাদেরকে দিয়ে দিবে এবং এ প্রতিনিধিও আবার অন্য এক শহরে পৌঁছে দিবে। এমনিভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা রাজ-দরবারে গিয়ে পৌঁছায়। অফিসার, রাজস্ব আদায়কারী এবং রাজস্ব প্রতিনিধিদের প্রতি আদেশ থাকবে যে রাজ-প্রতিনিধিরা কোন কৃষি অঞ্চলের কাছে পৌঁছলে তাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখাতে হবে এবং তাদেরকে এমনভাবে আপ্যায়ন করতে হবে যেন তারা সন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে বিদায় নেয়। তাদের ফেরার সময়ও তাদের প্রতি ঠিক এমনি ব্যবহার করতে হবে। রাজ-প্রতিনিধি ভালই হোক আর খারাপই হোক, তার প্রতি যে ব্যবহার করা হবে সেটা মনে করতে হবে যে তার দেশের রাজার প্রতি করা হচ্ছে। রাজারা সব সময়ই একে অন্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং রাজ-প্রতিনিধিদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তার ফলে তাঁদের নিজেদের সম্মানই বেড়ে যায়। কখনও যদি দুই রাজার মধ্যে মতানৈক্য হয় বা তাঁদের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয় এবং এমতাবস্থায়ও যদি রাজ-প্রতিনিধিরা নিজেদের কার্য সমাধা করার জন্য মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে তাহলেও তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয় না বা তাদের প্রতি ব্যবহারে সাধারণ সৌজন্যের অভাব থাকে না। আর সেটা যদি ঘটে তবে খুব লজ্জার কথা। আল্লাহ্ বলেছেন (কুরআন ২৪ : ৫৩) 'দূতের কাজই হোল সহজভাবে সংবাদটা পৌঁছে দেওয়া।'

এটাও বুঝতে হবে যে, এক রাজা অন্য রাজার কাছে শুধু সংবাদ পাঠানোর জন্য বা চিঠি দেবার জন্য প্রতিনিধি পাঠান না। একের অন্যের কাছে এগুলো ছাড়াও বহু গোপনীয় কাজ থাকে। প্রতিনিধিরা দেশের রাস্তা-ঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা এবং চারণভূমি সম্পর্কে জানতে চায়, তারা দেখতে চায় সৈন্য-সামন্ত চলাচল করতে পারবে কিনা, কোথায় কোথায় জাব পাওয়া যায়, কোথায় কোন্ অফিসার থাকে, দেশের সৈন্যসংখ্যা কত এবং সৈন্যবাহিনী কেমন সজ্জিত, রাজার আসন ও সঙ্গীদের মান কেমন, তাঁর দরবার ও পরিষদের সংগঠন ও শিষ্টাচার কিরূপ, তিনি পোলো খেলেন এবং শিকারে যান কিনা, তাঁর কি কি গুণ আছে এবং তাঁর স্বভাব কেমন, তিনি কি চান বা তাঁর স্বরূপ কি, তাঁর চেহারা কেমন, তিনি কি ন্যায়-পরায়ণ না নির্দয়, বৃদ্ধ না অল্প বয়স্ক, তাঁর রাজ্য কি উন্নতির দিকে না ধ্বংসের দিকে, তাঁর সৈন্যরা কি সুখী না অসন্তুষ্ট, কৃষকরা কি ধনী না দরিদ্র, তিনি কি লোভী না দয়ালু, তিনি কি সব কাজে খুব সতর্ক না অমনোযোগী, তাঁর মন্ত্রীরা কি উপযুক্ত না অনুপযুক্ত, তিনি কি বিশ্বাসী এবং নীতিবান না তার বিপরীত, তাঁর সেনাপতিরা অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধে পারদর্শী কিনা, তাঁর বন্ধুরা ভদ্র এবং উপযুক্ত কিনা, তিনি কি পছন্দ করেন আর কি পছন্দ করেন না, পানাহারের সময় তিনি প্রফুল্ল এবং শান্ত প্রকৃতির কিনা, ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি খুব কঠোর কিনা, তিনি অন্যের প্রতি খুব উদার না অমনোযোগী, তিনি কি কৌতুক বেশী পছন্দ করেন না গাম্ভীর্য এবং তিনি কি ছেলেদের প্রতি আসক্ত না মেয়েদের প্রতি। কখনও যদি তাঁরা সেই রাজার মন জয় করতে চান অথবা তাঁর কোন কিছুর বিরোধিতা করতে চান বা কোন কিছুর সমালোচনা করতে চান তাহলে যাতে তাঁরা সবকিছু জেনে এবং যে-কোন রকম অবস্থা থেকে সাবধান হয়ে তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। এমনি অবস্থা ঘটেছিল শহীদ সুলতান আল্প আরসলানের সময়।

সারা দুনিয়ায় একমাত্র দুটো নীতিই ভাল এবং সঠিক। একটা আবু হানিফার আর অন্যটি আশ্ শাফীর নীতি। বাকী সবগুলো অন্তঃসারশূন্য এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী। সুলতান আল্প আরসলান পারিবারিক জীবনে এত ধার্মিক ছিলেন যে, তাঁকে কখনও কখনও বলতে শুনা যেত, 'যদি আমার মন্ত্রী শাফী মতাবলম্বী না হোত'। তিনি এত বেশী উদ্ধত এবং ভীতি সঞ্চারকারী ছিলেন এবং যেহেতু তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসে খুব

গোঁড়া ছিলেন এবং শাফীবাদকে পছন্দ করতেন না, সর্বদাই আমি তাঁকে ভয় করে চলতাম।

ঘটনাক্রমে সমরকন্দের খান শামস্ আল মলক নাসর ইবনে ইব্রাহীম অবাধ্য হয়ে পড়াতে সুলতান ট্রান্স-অক্সিয়ানা আক্রমণ করতে মনস্থ করলেন। তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্তদের ডাকলেন এবং শামস্ আল মুলকের নিকট একজন রাজদূত পাঠিয়ে দিলেন। আমিও ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য সুলতানের দতের সঙ্গে দানিশমান্দ আসতারকে আমার তরফ থেকে পাঠিয়ে দিলাম। রাজদূত সেখানে গিয়ে তাঁর খবর পেঁাছে দিলেন। খান নিজের একজন দূতকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। প্রচলিত নিয়ম আছে যে, রাজ-প্রতিনিধিরা যে-কোন সময় উজিরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করতে পারেন এবং তাঁর কাছে ঐ সমস্ত কথা বলতে পারেন যা তাঁরা সোজাসুজি সুলতানের কাছে বলতে পারেন না। উজির আবার ঐগুলো সুলতানের কাছে বলে দেন। তাঁদের সমরকন্দে ফিরে যাবার সময় আমি আমার তাঁবুতে বসে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দাবা খেলছিলাম। তার অল্পক্ষণ আগেই আমি তাদের একজনকে পরাজিত করেছি এবং তার আংটিটা খেসারত হিসাবে রেখে দিয়েছি। আংটিটা এত বড় যে আমার বাম হাতের অনামিকায় লাগে না তাই আমি ওটা ডান হাতে পরেছি। আমাকে জানানো হোল যে, সমরকন্দের খানের দূত দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন বললাম, 'তাঁকে ভিতরে আন' এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ করে দিলাম।

রাজদূত আমার সামনে এসে বসে তাঁর যা বক্তব্য ছিল তা আমায় বললেন। সারাক্ষণ আমি হাতের আংটিটা নাড়াচাড়া করছিলাম আর রাজদূতও আমার আঙ্গুল ও আংটির দিকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর কাজ সমাধা হলে তিনি উঠে চলে গেলেন। সুলতান হুকুম করলেন যে, খানের রাজদূতকে বিদায় করে দিতে হবে এবং তিনি নিজে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। দানিশমান্দ আসতার এক চতুর ছিল বলে আমি তাকে আবারও রাজদূতের সঙ্গে পাঠালাম। সমরকন্দে পেঁাছে রাজদূতেরা শামস আল মুলকের সামনে তাদের পরিচয়পত্র দাখিল করল এবং আলাপ-আলোচনার সময় তিনি তাঁর নিজের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুলতানের বিচার, তাঁর হাবভাব এবং ব্যবহার কেমন লাগল? তাঁর সেনাবাহিনীর পরিমাণ কত? সেগুলো অস্ত্রেশস্ত্রে কেমন

সজ্জিত? তাঁর দরবার, মিলনায়তন এবং দেওয়ানের পরিচালনা ব্যবস্থা কেমন এবং রাজ্যের শাসন নীতি কি'? রাজদূত বললেন, 'হে মনিব, সুলতানের চেহারা, পৌরুষ, ক্ষমতা, মর্যাদা এবং আধিপত্য কিছুরই অভাব নাই। তাঁর সৈন্যসংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না আর তাঁর সম্পদের পরিমাণ ও প্রাচর্যেরও কোন সীমারেখা নেই। তাঁর দরবার, মিলনায়তন, দেওয়ান এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর। সে দেশে কিছুর অভাব নেই, তবে একটা গলদ আছে আর সেটা না থাকলে সবই ঠিকঠাক ছিল।' শামস আল মুলক তখন জানতে চাইলেন, 'কি তাদের গলদ?' তিনি বললেন, 'সুলতানের উজির একজন "রাফিদী" (প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী—সাধারণতঃ সুন্নিরা শিয়াদের বলত)। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন করে জান?' তিনি বললেন, 'কারণ একদিন ফজরের নামাযের পর আমি তাঁর তাঁবুতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেখানে আমি তাঁর ডান হাতে একটি আংটি দেখলাম কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় সেটা তাঁর আঙ্গুলের সঙ্গে নাড়াচাড়া করছিলেন।' সাহিবখাবর আগতার তখনই আমাকে লিখে জানাল, 'আপনার সম্পর্কে শামস আল মুলকের সামনে তাঁর রাজদূত অমুক কথা বলেছেন। আমি ভাবলাম এটা সম্পর্কে আপনি হয়ত ভালভাবে জানেন।' শুনে আমি সুলতানের ভয়ে খুব ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং মনে মনে বললাম, 'তিনি রাফিদীর ধর্মকে পছন্দ করেন না এবং সেজন্য আমাকে সর্বদা নিন্দা করছেন। কিন্তু কোনক্রমে তিনি যদি জানতে পারেন যে জিলিলীরা (তুর্কিস্তান) আমাকে রাফিদী বলে আখ্যায়িত করেছে এবং সমরকন্দের খানের সামনে তা বলেছে তাহলে তিনি আমাকে জানে মেরে ফেলবেন।' আমি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও অযাচিতভাবে এবং অপ্রার্থিতভাবে ৩০,০০০ দিনার খরচ করেছি এবং এ সংবাদ যাতে সুলতানের কানে না পৌছে সেজন্য বহু উপহার দিয়েছি।

আমি এই ঘটনা জানিয়ে দিলাম। কারণ রাজ-প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ ছিদ্রান্বেষী এবং সর্বদাই খুঁজতে থাকে যে রাজ্য ও রাজার মধ্যে কি দোষত্রুটি এবং গুণাগুণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তারা তাদের রাজার মাধ্যমে এ সমস্ত দোষত্রুটির নিন্দা ও সমালোচনা করে। এ সমস্ত চিন্তা করেই আগেকার বুদ্ধিমান এবং সতর্ক রাজারা রাজ-প্রতিনিধিদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন, ভাল দেশাচার মেনে চলতেন এবং দরবারে উপযুক্ত

ও বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করতেন যাতে তাদের মধ্যে কেউ কোন ত্রুটি ধরতে না পারে।

রাজদূতের কার্য পরিচালনা করার জন্য এমন একজন মানুষের দরকার যিনি কথাবার্তায় খুব সাহসী কিন্তু কম কথা বলেন, যিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছেন, যাঁর সব বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান আছে, যাঁর স্মৃতিশক্তি বেশী এবং পরিণামদর্শী, যিনি লম্বা এবং দেখতে সুন্দর এবং তিনি যদি বৃদ্ধ ও জ্ঞানী হন তাহলে অতি উত্তম। যদি কোন বন্ধুকে রাজদূত হিসাবে পাঠান হয় তবে সেটা আরো বেশী নির্ভরযোগ্য হবে এবং যদি এমন একজনকে রাজদূত নিযুক্ত করা হয় যিনি সাহসী এবং মর্যাদাসম্পন্ন, অস্ত্রেশস্ত্রে এবং অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী আর যোদ্ধা হিসাবে খুব নাম-করা তাহলে সেটা অতিশয় মঙ্গল হবে ; কারণ তিনি দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করবেন যে আমাদের দেশের সকলেই তাঁর মত। আর যদি সদ্বংশের থেকে রাজদূত নিযুক্ত করা হয় তাহলে সেটাও হবে অতি উত্তম। কারণ তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করবেন। অনেক সময় রাজারা রাজদূতকে দিয়ে অর্থ, মূল্যবান জিনিসপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র উপহার হিসাবে পাঠিয়ে নিজেদেরকে দুর্বল বলে প্রমাণ করে কিন্তু এ বিভ্রমের পর তাঁরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করে পরাজিত করেছেন। একজন রাজদূতের চরিত্র ও নীতিবোধ তাঁর রাজার চরিত্র ও নীতিবোধেরই পরিচয়বহ।

বাইশ অধ্যায়

পশুর খাদ্য মওজুদ রাখা

সুলতান যখন ঘোড়ায় চড়ে কোথাও রওনা হন, তখন যে যে স্টেশনে তিনি থামবেন, সেখানে ঘোড়ার খাবার মওজুদ নাও থাকতে পারে আর এ অবস্থা যদি হয় তবে ঘোড়ার খাবার যোগাড় করতে অনেক বেগ পেতে হয়। এমন কি, কৃষকদের থেকে তাদের কিছু অংশ জোরপূর্বক কেড়ে আনতে হয়। এভাবে ঘোড়ার খাবার যোগাড় করা মোটেই ভাল নয়। সুলতানের রাস্তায় প্রতি গ্রামে যেখানে তিনি থামবেন, পার্শ্ববর্তী সামন্ত-রাজা এবং রাজার জমি থেকে খাবার সরবরাহ করতে দাবী করা উচিত। আর যে সমস্ত স্থানে কোন গ্রাম বা সরাইখানা নেই, সেখানে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ফসলের সময় খাবার এনে মওজুদ রাখতে হবে এবং প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সুলতান যদি ঐ রাস্তায় না যান তাহলে ঐ মওজুদ খাবার বিক্রি করে টাকাটা অন্যান্য শুল্কের ন্যায় কোষাগারে জমা দিতে হবে। এভাবে চললে কৃষকদের কোন অসুবিধা হবে না, পশুর খাদ্য সরবরাহে কোন অনিয়ম হবে না এবং সুলতানও তাঁর কাজ সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন।

তেইশ অধ্যায়

প্রতিটি সৈনিকের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া

সৈনিকদের সময়মত বেতন দিতে হবে। যারা নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত এবং জায়গীর পেতে পারে তারা অবশ্যই ঠিক সময়ে বেতন পায় ; কিন্তু জায়গীর পাবার উপযুক্ত নয় এমন ভৃত্যবর্গ বেতনের টাকা যাতে ঠিকমত পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। সৈনিকদের সংখ্যানুসারে পুরা টাকাটা হিসেব করে একটা বিশেষ তহবিলে রাখা উচিত এবং তাদেরকে সময়মত দিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যভাবে সৈনিকদের বেতন ধনাগারের মাধ্যমে না দিয়ে (যেখানে তারা সুলতানকে দেখার সুযোগ পায় না) বছরে দু'বার সমস্ত সৈনিকদের ডেকে সুলতান নিজ হাতে তাদেরকে তাদের বেতনের টাকা দিতে পারেন। এর ফলে সুলতানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আরো বেড়ে যায় এবং যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে আরো বেশী উৎসাহ নিয়ে কাজ করে।

আগেকার দিনে রাজারা কোন জায়গীর দিতেন না। প্রত্যেক সৈনিককে তার পদ অনুসারে কোষাগার থেকে বছরে চারবার নগদ টাকা দেওয়া হোত এবং খাবার ও অন্যান্য জিনিসও তাদের সর্বদা সরবরাহ করা হোত। তাছাড়া জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য দুই হাজার অশ্বারোহী সর্বদা ঘোড়ায় চড়ে প্রস্তুত থাকত। রাজস্ব আদায়কারী রাজস্ব আদায় করে রাজার ধনাগারে পাঠিয়ে দিত আর সেই টাকা প্রতি তিন মাস অন্তর সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হোত। এ প্রথাকে তারা 'বিশ্‌তগানী' বলত। এ প্রথা এখনও সুলতান মাহ্‌মুদের রাজ্যে প্রচলিত আছে।

জমির প্রতিনিধিদের বলে দেওয়া উচিত যে, মৃত্যু অথবা যে-কোন কারণে কোন লোক তার দলে গরহাজির থাকলে দলপতিকে খবরটা গোপন না রেখে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে। আর দলপতিকেও নির্দেশ দিতে হবে যে, বেতন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দলের সবলকেই যে-কোন রকম সঙ্কটের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। দলের কেউ ছুটিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা জানাতে হবে যাতে শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যায়। এর অন্যথা কিছু করলে তাদেরকে তিরস্কার করতে হবে এবং তাদের বেতন বন্ধ করে দিতে হবে।

চব্বিশ অধ্যায়

বিভিন্ন জাতের সৈন্য রাখা

সকল সৈন্যই এক জাতের হলে বিপদে পড়তে হয়। তাদের মধ্যে আবেগ ও অনুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়, ফলে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবেই। তাই সৈন্যরা বিভিন্ন জাতের হওয়া প্রয়োজন। দুই হাজার দাইলামী এবং দুই হাজার খোরাসানী সৈন্য রাজধানীতে মোতায়েন রাখা উচিত। বর্তমানে যারা আছে তাদেরকে রাখতে হবে এবং বাকী যারা আছে তাদের সঠিক বন্দোবস্ত করতে হবে। তবে এদের মধ্যে কিছু যদি গুর্জিস্তান (জর্জিয়া) এবং সাবাঙ্কারার হয়, তাহলে উত্তম হবে ; কারণ এরা সকলেই ভাল মানুষ।

সুলতান মাহমুদের সময় তুর্কী, খোরাসানী, আরবী, হিন্দু, গুর, দাইলামী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের সৈন্য রাখার রীতি প্রবর্তিত ছিল। তিনি যখন কোন যুদ্ধযাত্রায় বের হতেন, প্রতিদিন রাত্রে প্রতিদল থেকে কয়েকজনকে ডেকে তাদেরকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, তাদেরকে সাবধান হয়ে থাকতে বলতেন এবং প্রত্যেক দলকে তাদের নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে দিতেন। আর একদল অন্য দলের ভয়ে সকাল না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করতে সাহস পেত না এবং এভাবে একদল অন্য দলের প্রতি নজর রাখত। যখন যুদ্ধের সময় হোত, তখন প্রত্যেক দল তাদের নাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠত এবং আরো বেশী আগ্রহশীল হয়ে যুদ্ধ করত যাতে পরে কেউ বলতে না পারে যে, অমুক জাতের সৈন্যরা যুদ্ধে শৈথিল্য দেখিয়েছে। তাই প্রত্যেক জাতের সৈন্যরাই অন্য জাতের সৈন্যদের নৈপুণ্যে পরাভূত করতে চাইত। তাছাড়া প্রত্যেকটি সৈনিকই সাহসী এবং অকুতোভয় ছিল। ফলে তারা একবার অস্ত্র ধরলে আর পিছ-পাও হোত না—যতক্ষণ পর্যন্ত না শত্রুদের পরাজিত করতে পারত।

এমনিভাবে যখনই কোন সৈন্য একবার বা দু'বার বীরত্ব দেখিয়ে শত্রুদের পরাজিত করে, তখন একশত অশ্বারোহীই এক হাজার শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে এবং কোন শক্তিই সে সেনাবাহিনীকে দমন করতে সক্ষম হবে না—ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সৈন্যরা সকলেই রাজাকে ভয় করে চলবে এবং তাঁর কাছে মাথা নত করবে।

পঁচিশ অধ্যায়

জামিন-ব্যক্তিদের দরবারে রাখা

সদ্য-আত্মসমর্পিত আরব, কুর্দ, দাইলামী, রুমী এবং অন্যান্য দেশের শাসনকর্তাদের বলে দেওয়া উচিত যে, তাদের প্রত্যেককে দরবারে একজন পুত্র বা একজন ভাইকে জামিন রাখতে হবে আর তাদের সংখ্যা এক হাজার না হলেও পাঁচশতের কম হবে না। বছর শেষে তারা একজনের পরিবর্তে অন্য একজনকে পাঠাতে পারে এবং প্রথমজন দেশে ফিরে যেতে পারে তবে পরবর্তী লোক না এলে আগের লোক যেতে পারবে না। এভাবে জামিন থাকার দরুন রাজার বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করতে পারবে না। দাইলাম, কুহিস্তান, তাবারিস্তান, সাবাঙ্কারা এবং অন্যান্য দেশ— যেখানকার লোকেরা জায়গীর ও ভূমি স্বত্বের অধিকারী, তাদের থেকেও একইভাবে পাঁচ শত লোক দরবারে থাকা উচিত। ফলে প্রয়োজন হলে দরবারে কাজের লোকের অভাব হবে না।

ছাব্বিশ অধ্যায়

চাপরাশী ধরনের কাজে তুর্কীদের নিয়োগ

যদিও তুর্কীদের প্রতি একটা ভীষণ বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সংখ্যায় অনেক বেশী হয়ে পড়েছে, তবুও এই রাজবংশের প্রতি তাদের বহুদিনের একটা দাবী আছে। কারণ এর শুরু থেকেই তারা বহু পরিশ্রম করেছে ও অনেক কষ্ট পেয়েছে। তাছাড়া তারা রাজসূত্রেও জড়িত। তাই তাদের ছেলেদের মধ্যে কমপক্ষে এক হাজারজনকে চাকরিতে নিযুক্ত করে রাজপ্রাসাদের ভৃত্যদের ন্যায় ভরণ-পোষণ করা উচিত। চাকরি করতে করতে তারা অস্ত্রচালনায় পারদর্শী হবে এবং কাজেও অভিজ্ঞ হবে। আমলাদের ন্যায় তারাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকবে, চাপরাশীদের ন্যায় তারাও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের প্রতি যে একটা সাধারণ বিতৃষ্ণা আছে সেটাও বিদূরিত হয়ে যাবে। প্রয়োজন হলে তাদের ৫,০০০ অথবা ১০,০০০ জন একত্রে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে হুকুমমত যে-কোন কাজ করবে। এভাবে তারা রাজ্য থেকে পৈতৃক ধনশূন্য হবে না, রাজার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তারাও সুখী হবে।

সাতাশ অধ্যায়

ক্রীতদাসদের কাজের সংবিধান করা—যাতে তাদের কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়

রাজদরবারের ক্রীতদাসরা তাদের কাজের সময় এবং শিকারের সময় সকলে মিলে জটলা পাকিয়ে বসে। কাজের সময় তারা যেমনিভাবে সকলে একত্রে ভিড় করে, তেমনিভাবে কাজ থেকে বিদায় নেবার সময়েও একই অবস্থা। কিন্তু যদি তাদেরকে স্পষ্টভাবে হুকুম দিয়ে দেওয়া হয় এবং দু'-একবার বলে দেওয়া হয় কিভাবে তাদের কাজ করতে হবে, তাহলে তারা ঠিকভাবে কাজ করবে এবং আর কোন অসুবিধা হবে না। অন্যান্য চাপরাশীদের নিয়োগ করে তাদের প্রতি যদি পরিষ্কার হুকুম থাকে যে কতজন পানিবাহক, কতজন অস্ত্রবাহক, কতজন মদ্যবাহক, কতজন পোশাক-বাহক প্রতিদিন কাজ করবে এবং রাজার কাছে কতজন থাকবে, তাহলে তারা সেভাবে প্রত্যহ কাজে আসতে পারে। রাজার নিজস্ব ভৃত্যদের বেলায়ও ঠিক তাই হওয়া উচিত যাতে তারা সবাই একত্রে এসে ভীড় না জমায়। তাছাড়া আগেকার দিনে সব সময়ই চাপরাশীদের নিযুক্তি থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ অবধি তাদেরকে শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা হোত। কিন্তু এখন আর সে নিয়ম বলবৎ নেই। বইয়ের প্রয়োজনে আমি অল্প কিছু উল্লেখ করছি। আশা করি, রাজার পছন্দ হবে।

রাজপ্রাসাদের চাপরাশীদের শিক্ষা সম্পর্কে

সামানীদের সময় পর্যন্তও চাপরাশীদের চাকরির মেয়াদ, কাজে নিপুণতা এবং সাধারণ গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে ক্রমানুসারে উচ্চপদ দেওয়া হোত। একজন ভৃত্যকে ক্রয় করার পরে এক বছর জানদানিজী কাপড় এবং বুট পরে ঘোড়ার রেকাব ধরে হাঁটবার কাজে থাকত এবং এ সময় প্রকাশ্যে বা গোপনে তার ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ ছিল আর কখনও যদি তাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখা যেত তাহলে তার শাস্তি হোত

তার এক বছর পুরা হলে তার তাঁবুর সর্দার রাজকীয় গৃহকর্তাকে তা জানিয়ে দিত; তখন তারা তাকে কাঁচা চামড়ার একটা জিন, একটা সাধারণ লাগাম এবং পাদানীসহ একটা তুর্কী ঘোড়া দিত। এভাবে আরেক বছর অতিবাহিত হবার পর তৃতীয় বছরে তাকে একটা কোমরবন্দ্ দেওয়া হোত। চতুর্থ বছরে তাকে একটা তূণীর এবং ধনুকদানী দেওয়া হোত আর সে তাটা ঘোড়ায় চড়বার সময় বাঁধত। পঞ্চম বছরে সে একটি আরো সুন্দর জিন এবং একটা তারকাখচিত লাগাম পেত, তার সঙ্গে একটা সুন্দর আলখেল্লা এবং একখানা লাঠিও পেত। ষষ্ঠ বর্ষে তাকে মদ্য-পরিবেশক নিযুক্ত করা হতো এবং তার সঙ্গে একটা বড় হাতলশূন্য পানপাত্র থাকত যা সে কোমরের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখত। সপ্তম বছরে তাকে ঢিলা পোশাকের যুক্ত করা হোত। অষ্টম বছরে তাকে শৃঙ্গ ও ষোলটি গোঁজবিশিষ্ট একটি তাঁবু দেওয়া হোত এবং তার দলে তিনজন নবাগত ভৃত্যকে রাখা হোত। তাকে তাঁবুর সর্দার উপাধি দেওয়া হোত এবং রৌপ্য তারকামণ্ডিত কালো টুপি ও গানজার তৈরী আলখেল্লা পরান হোত। প্রত্যেক বছর তার পদমর্যাদা ও দায়িত্ব বাড়ানো হোত যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দলপতি হোত এবং রাজকীয় গৃহনবিসের পদ পাওয়া পর্যন্ত ক্রমশঃ তার পদোন্নতি হতে পারতো। এভাবে যখন তার উপযুক্ততা, কার্যনিপুণতা এবং সাহসিকতা সকলেই স্বীকার করত, একটা বিশেষ লক্ষণীয় কাজ তার দ্বারা সম্পন্ন হোত এবং সে যদি তার সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মনিবের প্রতি অনুগত হোত আর সে সঙ্গে তার বয়সও পঁয়ত্রিশ বছর হোত, তাহলে তাকে আমীর নিযুক্ত করে একটা প্রদেশের ভার তার উপর দেওয়া হোত।

আলপ্তিগীন সামানীদের ক্রীতদাস ও পালিত পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে খোরাসানের সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অস্বাভাবিক বিশ্বাসভাজন, অনুগত এবং সাহসী ছিলেন। তিনি তুর্কীস্তানের অধিবাসী ছিলেন এবং খুব পরিণামদর্শী, সুনিপুণ, জনপ্রিয়, সৈনিকদের প্রতি উৎসর্গীকৃত, উদার, অতিথিপরায়ণ এবং আল্লাহ্ ভীরু ছিলেন। সামানীদের সবগুলো ভাল গুণ তাঁর মধ্যে ছিল এবং বহু বছর তিনি খোরাসান এবং ইরাক শাসন করেছিলেন। তাঁর ১৭০০ তুর্কী ক্রীতদাস ও চাপরাশী ছিল। একদিন তিনি তিরিশজন ভৃত্য কিনেছিলেন এবং সুলতান মাহ্মুদের পিতা সবুক্তিগিন ছিলেন তার মধ্যে একজন। আলপ্তিগীনের কেনার সঙ্গে সঙ্গে সবুক্তিগিনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেল। ওখানে আসার মাত্র তিনদিন পরে অন্যান্য ভৃত্যদের সঙ্গে তিনিও আলপ্তিগীনের

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় গৃহরক্ষী এসে আলপ্তিগীনকে বলল, 'একটা তাঁবুর সর্দার অমুক ভৃত্য মারা গিয়েছে। এখন আপনি কোন্ ভৃত্যকে সেই তাঁবু, তার সৈন্য-সামন্ত এবং জিনিস-পত্রের ভার দিতে চান?' আলপ্তিগীনের দৃষ্টি সবুক্তিগিনের দিকে পড়ল। তিনি বললেন, 'এই ভৃত্যের উপরই আমি ঐ দায়িত্ব অর্পণ করলাম।' গৃহরক্ষী বলল, 'হুজুর, মাত্র তিনদিন হোল তাকে কিনেছেন। তাকে এ পদে উন্নীত হবার জন্য সাত বছর চাকরি করতেই হবে। সে এখন কিভাবে এ কাজের জন্য উপযুক্ত হবে?' আলপ্তিগীন বললেন, 'আমি বলে ফেলেছি। আমি তাকে ব্যতিক্রমমূলকভাবে এ পদাধিকার দিচ্ছি কিন্তু এর পর থেকে তোমাদের প্রচলিত নিয়মই মেনে চলতে হবে।' ভৃত্যটি শুনে মাথা নত করল। সঙ্গে সঙ্গে তারা সবুক্তিগিনকে তাঁবুর ভার দিয়ে দিল আর তিনি লাভ করলেন সাত বছর চাকরি করার ফল। আলপ্তিগীন মনে মনে ভাবলেন, 'সম্ভবতঃ এ ভৃত্যের জন্ম তুর্কীস্তানে এক সম্ভ্রান্ত বংশে। হয়ত তার সৌভাগ্যই তাকে টেনে তুলবে এবং সে একজন বিরাট লোক হবে।' তখন তিনি তাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তাকে দিয়ে তিনি সকলের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন বল ত আমি কি বলেছি।' সবুক্তিগিন সঠিকভাবে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আলপ্তিগীন তাকে বললেন, 'যাও, গিয়ে এগুলোর উত্তর নিয়ে এস।' সবুক্তিগিন যেভাবে সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন তারচেয়েও সুন্দরভাবে তার উত্তর নিয়ে এলেন। দিনের পর দিন তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে আলপ্তিগীন তাঁর জন্য খুব সহানুভূতি অনুভব করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে পানি পরিবেশক নিযুক্ত করলেন এবং খোদ নিজের কাজ করতে হুকুম দিলেন। তাঁর অধীনে দশ জন ভৃত্যের একটা সেনাদল পাঠালেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁর পদোন্নতি হতে লাগল।

আঠারো বছর বয়সে সবুক্তিগিনের সেনাদলে দুই শত সাহসী ভৃত্য ছিল। তিনি আলপ্তিগীনের সব গুণ রপ্ত করে নিয়েছিলেন; যেমন শিষ্টাচার, খাবার অভ্যাস, পান অভ্যাস, আপ্যায়ন, শিকার, পোলো ও ধনুবিদ্যা, লোকের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য দেখান এবং তাঁর সেনাদলের সদস্যদের ভাইয়ের ন্যায় গ্রহণ করা। বস্তুতঃ তাঁর কাছে যদি কখনও একটা আপেল থাকত তাহলে তিনি সেটা দশ জন সহকর্মীর সঙ্গে ভাগ করে খেতে চাইতেন আর তাঁর এ সমস্ত সদ্‌গুণের জন্য সকলে তাঁকে ভালবাসত।

আলপ্তিগীন ও সবুক্তিগিনের গল্প

একদিন আলপ্তিগীন দুই শত ভৃত্যকে খালাজ তুর্কে যেতে হুকুম করলেন এবং তুর্কীবাসীদের কাছে পাওনা কিছু টাকা আদায় করতে বললেন। ঐ দলে সবুক্তিগিনও ছিলেন। তারা খালাজ তুর্কে পৌঁছলে তুর্কীবাসীরা পুরো টাকা দিতে অস্বীকার করল। ভৃত্যরা এতে খুব রাগান্বিত হয়ে জোরপূর্বক টাকা আদায় করবার জন্য অস্ত্র ধরতে চাইল। সবুক্তিগিন বললেন, 'আমি কিছুতেই যুদ্ধ করতে রাজী নই এবং এরূপ কাজে আমি নিজেকে জড়িত করতে চাই না।' তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল কেন তিনি যুদ্ধ করবেন না। তিনি জবাব দিলেন, 'আমাদের মনিব আমাদেরকে এখানে যুদ্ধ করতে পাঠান নি। তিনি বরং এখানে এসে কিছু টাকা যোগাড় করতে বলেছেন। এখন যদি আমরা যুদ্ধ করি এবং তারা যদি আমাদের পরাজিত করে দেয় তাহলে আমাদের জন্য খুব অবমাননার কথা এবং আমাদের মনিবের সম্মানেরও হানি। তাছাড়া আমাদের মনিব তাঁর বিনা আদেশে যুদ্ধ করায় আমাদেরকে দায়ী করবেন। আমাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না বা কোন অজুহাত দেওয়াও চলবে না এবং সারা জীবন কখনও তাঁর ভর্ৎসনা থেকে অব্যাহতি পাব না।' সবুক্তি-গিনের এ কথা প্রায় সকলেই মেনে নিল। কেউ কেউ যুক্তিতর্ক দেখিয়েছিল কিন্তু শেষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে এল। তারা এসে যখন আলপ্তিগীনকে বলল যে, লোকেরা তাদেরকে বাধা দিয়েছে এবং টাকা দিতে অস্বীকার করেছে তখন আলপ্তিগীন বললেন, 'তোমরা কেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের থেকে টাকা কেড়ে আন নি?' তারা বলল, 'আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সবুক্তিগিন আমাদের যেতে দেয় নি। তখন আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত আমরা ফিরে আসি।' আলপ্তিগীন তখন সবুক্তিগিনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি নিজে যুদ্ধ কর নি কেন এবং ভৃত্যদেরও যুদ্ধ করতে দাওনি কেন?' সবুক্তিগিন জবাব দিলেন, 'সুলতান আমাদেরকে যুদ্ধ করতে আদেশ দেন নি; তাঁর বিনা আদেশে আমরা যদি যুদ্ধ করতে পারতাম তাহলে আমরা প্রত্যেকেই এক একজন রাজা হতাম—দাস নয়। কারণ একজন ক্রীতদাসের কাজই হোল তার মনিবের হুকুম তামিল করা। আমরা যদি পরাজিত হতাম তাহলে সুলতান নিশ্চয়ই আমাদের প্রশ্ন করতেন যে, কে যুদ্ধের হুকুম দিয়েছে এবং তোমাদের এই ক্রোধের মূলে কি রক্ষা-ব্যবস্থা ছিল? এমন কি আমরা

যদি তাদের পরাজিতও করতাম, তবুও নিশ্চয়ই কিছু লোক মারা যেত আর আমরা যে শুধু কোন সহানুভূতি বা ধন্যবাদ পেতাম না—তাই নয়, লোকে আমাদের নিন্দাও করত। আপনি যদি সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন তাহলে আমরা যুদ্ধ করে টাকা নিয়ে আসব অথবা যুদ্ধে আত্ম বিসর্জন দিব।' আলপ্তিগীন সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছো।' তারপর থেকে আলপ্তিগীনের দ্বারা সবুক্তিগিনের ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি হতে লাগল এবং ক্রমে তাঁর দলে তিন শত ভৃত্য হোল।

খোরাসানের আমির নূহ ইবনে নাসেরের মৃত্যুর সময় আলপ্তিগীন নিশাপুরে ছিলেন। রাজধানী থেকে রাজ-সভাসদরা আলপ্তিগীনকে লিখে জানাল, 'খোরাসানের আমীর মরে গেছেন। তাঁর তিরিশ বছরের এক ভাই আছে এবং ষোল বছরের একটি পুত্র আছে। আপনি তাদের মধ্যে কাকে সিংহাসনে বসাতে বলেন? আপনিই রাজ্যের প্রধান ভরসা, তাই আপনার মতামত গুরুত্বপূর্ণ।' আলপ্তিগীন সঙ্গে সঙ্গে পত্রবাহককে একটা চিঠি দিয়ে বলে পাঠালেন, 'দু'জনই সিংহাসন ও রাজ্য শাসনের উপযুক্ত; দু'জনই আমার প্রভুর বংশীয়। তবে দু'জনের মধ্যে রাজার ভাই বেশী অভিজ্ঞ, তিনি জীবনে বহু উত্থান-পতন দেখেছেন, তিনি সবাইকে ভালভাবে চেনেন এবং তিনি সকলের যোগ্যতা, পদ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেন এবং সকলকে সম্মান করেন। অন্যদিকে আমীরের ছেলে একজন অনভিজ্ঞ বালকমাত্র। আমার সন্দেহ হয় যে, সে লোকদের শাসন করতে পারবে না বা সব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দিতে পারবে না। তাই সম্ভবতঃ রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসান ভাল হবে।' পরের দিন তিনি এ মর্মে আর একটি চিঠি পাঠালেন। পাঁচ দিন পরে একজন সংবাদদাতা খবর নিয়ে এল যে রাজার ছেলেকে সিংহাসনে বসান হয়েছে। শুনে আলপ্তিগীন তাঁর চিঠি দু'খানার কথা মনে করে বিরক্তি অনুভব করলেন, তিনি বললেন, 'হে হতভাগারা! নিজেদের দায়িত্বেই যখন কাজটা করবে তখন আমার পরামর্শ নিয়েছিলে কেন? আমার কাছে দু'জনই সমান। কিন্তু আমার চিন্তা হচ্ছে যে, আমি ভাইকে সিংহাসনে বসাতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমার চিঠিগুলো রাজধানীতে পৌঁছলে আমীরের ছেলে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। সে মনে করবে যে, আমি তার চাচার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলাম। সে আমার প্রতি রাগ করবে এবং মনে মনে বিতৃষ্ণা পোষণ করবে। তখন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা তাকে প্রভাবিত করে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করবে।' তৎক্ষণাৎ তিনি পাঁচটা দ্রুতগামী উট পাঠিয়ে দিয়ে তার

চালকদের এই হুকুম করলেন যে, তাঁরা যেন অক্সাস নদী (আমুদরিয়া) পার হবার পূর্বেই সংবাদদাতা দু'জনকে ফিরিয়ে আনে। চালকরা খুব তাড়াতাড়ি উট চালিয়ে একজনকে আমুই (আমুল)-এর নিকটবর্তী মরুভূমিতে ধরে ফেলল কিন্তু অন্যজন (আমুদরিয়া) পার হয়ে গিয়েছিল।

আলপ্তিগীনের চিঠি বোখারায় পৌঁছলে, যুবরাজ ও তার সমর্থনকারীরা অপমানিত হয়ে বলল, 'রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসাতে ঠিক করা তাঁর ঠিক হয় নি। তিনি কি জানেন না যে, রাজার উত্তরাধিকারী তার ছেলে, ভাই নয়?' তারা এমনভাবে আলোচনা করে চলল যে যুবরাজ দিনের পর দিন আলপ্তিগীনের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে লাগল। আলপ্তিগীন বার বার তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে নানাবিধ উপঢৌকন পাঠান কিন্তু যুবরাজের মন থেকে বিতৃষ্ণা দূর হোল না। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাও বেড়ে চলল। প্রকৃতপক্ষে আলপ্তিগীনকে আহমদ ইবনে ইসমাঈল তাঁর শেষ জীবনে ক্রীতদাস হিসেবে কিনেছিলেন। তারপর তাঁকে নাসের ইবনে আহমদের অধীনে কয়েক বছর থাকতে হয়। নাসেরের মৃত্যুর পর তাঁকে নূহ ইবনে নাসেরের অধীনে কাজ করতে হয় এবং তাঁর সময়েই আলপ্তিগীন খোরাসানের সেনাপতি হন। নূহ-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যুবরাজ মনসুর তাঁর পিতার সিংহাসনে বসেন। মনসুরের সিংহাসনে আরোহণের ছয় বছর পরেও ষড়যন্ত্রকারীদের প্ররোচনার জন্য আলপ্তিগীন বহু টাকা খরচ করে এবং নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেও তাঁর মন জয় করতে সক্ষম হন নি। ইতিমধ্যে রাজধানীতে কি কি ঘটছে সবই আলপ্তিগীনের কাছে তাঁর দূতেরা জানাতো।

এরপর দুরভিসন্ধিকারীরা মনসুর ইবনে নূহকে বলল, 'আলপ্তিগীনকে না মারা পর্যন্ত আপনি এই রাজ্যের সত্যিকার রাজা হতে পারবেন না। কারণ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি খোরাসানে রাজত্ব করছেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছেন। সব সৈন্যই তাঁর কথায় উঠে বসে। তাঁকে বন্দী করতে পারলেই আপনি মনে শান্তি পাবেন এবং তাঁর ধনসম্পদে আপনার ধনাগার পূর্ণ হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভাল হবে আপনি তাঁকে রাজ-দরবারে ডেকে আনুন। কারণ আপনি সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি এখনও আপনার সঙ্গে এসে দেখা করে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন নি। তাছাড়া আপনি তাঁকে দেখতে উৎসুক হতে পারেন, কারণ তিনি আপনার পিতামহ সমতুল্য। যদিও তাঁর দ্বারাই সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভূমি

স্থাপিত হয়েছে এবং তিনি খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার শাসনকর্তা কিন্তু তবুও যেহেতু তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি, তাই লোকে বলাবলি করছে। তাঁর অতি শীঘ্র দরবারে এসে দরবার ও মিলনায়তনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন দোষত্রুটি থাকলে সেটা সংশোধন করা উচিত। আর এটা করলেই তাঁর প্রতি আপনার বিশ্বাস বেড়ে যাবে এবং স্বার্থান্বেষীদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর তিনি এখানে এলেই তাঁকে গোপনে ডেকে নিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করে দিবেন।'

যাই হোক, মনসুর আলপ্তিগীনকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। আলপ্তিগীনের প্রতিনিধিরা তাঁকে লিখে তাঁকে ডাকানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাবধান করে দিল। তিনি বোখারা যাবার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং লোকজনকে তল্পিতল্পা বাঁধতে হুকুম করলেন। তিনি নিশাপুর থেকে রওনা হয়ে ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং খোরাসানের সব শাসনকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে সারাখে এসে পেঁছিলেন। তিনদিন সেখানে বিশ্রাম নেবার পর তিনি সেনাপতিদের ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই। তোমরা বল আমার কি করা উচিত। কারণ তোমাদের ও আমার ভাল-মন্দ নির্ভর করছে এটার উপর।' তারা বলল, 'আমরা আপনার কথা মানতে রাযী আছি।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জান, কি কারণে মনসুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে?' তারা বলল, 'তিনি আপনাকে দেখতে চান এবং আপনার সঙ্গে নতুনভাবে ব্যবস্থা করতে চান। কারণ আপনি তাঁর পিতৃসমতুল্য।' তিনি বললেন, 'তোমরা যা মনে করছ তা নয়, রাজা আমার শিরশ্ছেদ করার জন্য ডেকেছে। সে একটা বালকমাত্র এবং মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। তোমরা ভাল করেই জান যে, ষাট বছর ধরে সামানী বংশীয় সাম্রাজ্যকে পতনের হাত থেকে আমি রক্ষা করে আসছি। আমি কয়েকজন তুর্কিস্তানের খানকেও পরাজিত করেছি—যারা তাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল। যত রকম বিদ্রোহ হয়েছে সব দমন করেছি এবং আমি কখনও এতটুকু অবাধ্য ছিলাম না। আমিই এ বালকের পিতা ও পিতামহকে সিংহাসনে সমাসীন রেখেছিলাম। এখন শেষ পর্যন্ত এই তার পুরস্কার। সে আমাকে মেরে ফেলতে চায়। সে এতটুকু জানে না তার রাজত্ব একটা শরীরের মত যার মাথা আমি। মাথা না থাকলে কিভাবে শরীর বেঁচে থাকতে পারে? এমতাবস্থায় তোমরা কি করতে বল? এই ভয় প্রদর্শনের কি প্রতি-ব্যবস্থা আমরা করতে

পারি ?' শাসনকর্তারা সকলে বলে উঠলেন, 'অস্ত্র ধরা ছাড়া কোন উপায় নাই। সে যদি আপনার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে তাহলে তার থেকে আর কি আশা করা যায় ? আপনার স্থলে যদি অন্য কেউ হোত, তাহলে পঞ্চাশ বছর আগেই তাদের থেকে রাজ্য কেড়ে নিত। আমরা সকলে আপনাকে মানি, তাকে বা তার পিতাকে নয়। কারণ আমরা যারা সামানীদের রাজ্যে কিছু অধিকার সঞ্চয় করেছি সবই আপনার জন্য আর আপনার থেকেই আমরা জীবিকা, পদ-মর্যাদা ও আধিপত্য লাভ করেছি। আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করি এবং আপনি থাকলেই আমরা আছি। খোরাসান, খারাজম ও নিমরুজের একচ্ছত্র অধিপতি আপনি। মনসুর ইবনে নূহকে বিদায় দিয়ে আপনি সিংহাসন অধিকার করে ফেলুন। আপনি যদি মনে করেন, তাহলে বোখারা ও সমরকন্দ তিনি রাখতে পারেন নতুবা এগুলোও দখল করে নিন।' শাসনকর্তাদের মুখে এই ভাবপ্রবণ কথা শুনে আলপ্তিগীন বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি সহায় হোন। আমি জানি, আপনারা সততার সঙ্গে অন্তর দিয়ে কথাগুলো বলছেন এবং এটাই আমি আপনাদের থেকে আশা করতাম। আল্লাহ্‌র অসীম কৃপা যেন আপনাদের উপরে বর্ষিত হয়। আজ আপনারা যার যার ঘরে চলে যান, দেখা যাক আগামী কল্য কি করা যায়।'

এ সময় আলপ্তিগীনের সঙ্গে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং তিনি ইচ্ছা করলে ১,০০,০০০ সৈন্যও জোগাড় করতে পারতেন। পরের দিন সব শাসনকর্তা আলপ্তিগীনের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন, তিনিও এসে তাঁদের সামনে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁদের সম্বোধন করে বললেন, 'গতকল্য কথা বলার সময় আমি আপনাদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম; দেখতে চেয়েছিলাম যে আপনারা সত্যিকারভাবে আমার সঙ্গে আছেন কিনা এবং যে পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসছে, তাতে আপনারা আমার সহায়ক হবেন কিনা। আপনাদের কাছ থেকে আমি যে সমস্ত কথা শুনলাম, সত্যিকারভাবে সেগুলো আপনাদের মহত্ত্ব ও রাজানুগত্যের পরিচয় দিয়েছে। আপনারা কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন এবং আমিও আপনাদের ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট। তবে আপনারা জেনে রাখুন যে, আমার পক্ষে এখন অস্ত্র ছাড়া এই ছেলের দুর ভিসন্ধিকে দমন করা সম্ভব নয়। সে একটা বালক-মাত্র এবং সে তার কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে কতকগুলো নীচ বংশজাত পাজীর কথামত চলে এবং ভাল-মন্দ বিচার করতে জানে না।

সে আমার মত একটা লোককে পরিত্যাগ করে—যে সারাজীবন তার বংশের কর্তা হিসাবে কাজ করছে এবং কয়েকটা দুরাত্মার কথামত চলে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—দেশে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা। তাদের সামান্যতম গণ্ডগোল প্রশমিত করার ক্ষমতাও নাই। তবুও সে তাদেরকে বন্ধু বলে মনে করে আর আমাকে মনে করে তুচ্ছ। আমি তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার চাচাকে সিংহাসনে বসাতে পারি। এমন কি, নিজেও সিংহাসন দখল করে নিতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয়—লোকে বলবে যে আলপ্তিগীন ষাট বছর ধরে তার পুরনো প্রভু সামানীদের সাম্রাজ্য রক্ষা করে শেষ পর্যন্ত আশি বছর বয়সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অস্ত্রবলে তাদের থেকে সাম্রাজ্য কেড়ে কৃতজ্ঞতাকে উপহাস করে নিজেই সিংহাসনে বসেছে। আমি সারাজীবন ভাল কাজ করে বেশ সুনাম অর্জন করেছি আর এখন কবরে যাবার পথে। এ সময় আমার এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে আমার দুর্নাম হতে পারে। আমাদের যতই প্রমাণ থাক যে মনসুরেরই অন্যায়, তবুও কিছু লোক আলপ্তিগীনকে দোষী করবে, কারণ সবাই সেটা জানে না। যদিও আমি সিংহাসনের প্রত্যাশী নই এবং তাদের কোন ক্ষতি করতেও ইচ্ছুক নই, তবুও যতদিন আমি খোরাসানে থাকব ততদিন এ সমস্ত কথাবার্তা চলতে থাকবে এবং তারা এ বালকটাকে আমার বিরুদ্ধে আরো ক্ষেপিয়ে তুলবে। কিন্তু আমি যদি খোরাসান ছেড়ে তার রাজ্য থেকে চলে যাই, অপবাদকারীদের বলার কিছুই থাকবে না। এর পরেও যদি বেঁচে থাকার জন্য আমাকে অস্ত্র ধরতে হয় তাহলে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়ে শহীদ হব। হে সেনাপতিগণ, আপনারা জানেন, খোরাসান, খারাজম, নিমরুজ এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা আমীর মনসুরের অধিকারে আর আপনারা সকলে তার সৈন্য। যান, আপনারা রাজধানীতে গিয়ে আপনাদের নিয়োগপত্র বা দায়িত্ব পুনরায় আরম্ভ করে নিজেদেরকে রাজার অধীনে সমর্পণ করে দিন। আর আমি হিন্দুস্তানে গিয়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনস্থ করেছি। যুদ্ধে যদি মরে যাই, তাহলে শহীদ হব আর যদি জয়ী হতে পারি তাহলে আল্লাহ্ ও রসূলের (সঃ) দোয়ায় এবং বেহেশতে যাবার আশায় বিধর্মীদের মুসলমান করব। পূর্বে ভালই করে থাকি আর মন্দই করে থাকি খোরাসানের আমীর আর আমার দ্বারা ত্যক্ত হবেন না এবং বাচালদের মুখও বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে সে-ই হবে খোরাসানের একচ্ছত্র অধিপতি।

এরূপ বলার পর আলপ্তিগীন উঠে দাঁড়ালেন এবং শাসনকর্তাদের বললেন, 'আপনারা এক এক করে আমার কাছে আসুন—যাতে আমি আপনাদের বিদায় করে দিতে পারি।' তাঁরা প্রতিবাদ করলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না, সকলে কান্না শুরু করলেন। অশ্রুভরা নয়নে এক এক করে তাঁরা এগিয়ে এলেন। আলপ্তিগীন তাঁদেরকে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন। তিনি সকলকে বিদায় দিয়ে শিবিরে ফিরে গেলেন। এসব সত্ত্বেও কেউ বিশ্বাস করল না যে, আলপ্তিগীন খোরাসান ছেড়ে হিন্দুস্তানে চলে যাবেন। কারণ খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে আলপ্তিগীনের ভূ-সম্পত্তির অধীনে ছিল পাঁচশত গ্রাম আর এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তাঁর বাড়ী, বাগান ও সরাইখানা ছিল না। তাছাড়া তাঁর ৩০,০০,০০০ ভেড়া এবং ১,০০,০০০ ঘোড়া, খচ্চর ও উট ছিল। হঠাৎ একদিন ঢাকের বাদ্য শোনা গেল এবং আলপ্তিগীনকে তাঁর ভৃত্য ও সহচরবৃন্দসহ বিষয়-সম্পত্তি সব ছেড়ে বল্‌খের দিকে রওনা হয়ে যেতে দেখা গেল। খোরাসানের শাসনকর্তারা সকলে তখন বোখারায় চলে গেলেন।

বল্‌খে পেঁৗছে আলপ্তিগীন সেখানে দুই-এক মাস থাকতে মনস্থ করলেন যাতে ট্রান্স-অক্সিয়ানা, খুটলান এবং বল্‌খের প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এসে জড় হতে পারে। সেখান থেকে তিনি হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হবেন। অপবাদকারীরা এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা আমীর মনসুরকে বুঝালো যে, আলপ্তিগীন একটা বদমাইশ এবং তাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমীর নিরাপদ হতে পারবেন না। তাই আমীরের উচিত সৈন্য পাঠিয়ে তাকে ধরে রাজধানীতে আনা। মনসুর ১৬,০০০ অশ্বারোহীসহ একজন শাসনকর্তাকে বোখারা থেকে বল্‌খে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা যতক্ষণে তিরমীদ পেঁৗছে আমুদরিয়া পার হয়েছে, ততক্ষণে আলপ্তিগীন বল্‌খ থেকে খুল্‌মের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। বল্‌খ এবং খুল্‌মের মধ্যে চার ফারসাং লম্বা একটা ছোট উপত্যকা আছে যাকে খুল্‌ম গিরিপথ বলা হয়। এ উপত্যকার দু'দিকেই গ্রাম আছে। আলপ্তিগীন উপত্যকায় তাঁবু গেড়ে দুই শত অশ্বারোহীকে সতর্ক করে দিয়ে উপত্যকার চূড়ার দিকে পাহারা দিতে পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর নিজস্ব ২২০০ দাস ছিল যারা প্রত্যেকেই ভাল যোদ্ধা এবং আট শত অশ্বারোহী যারা ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আমীর মনসুরের সৈন্যরা উপত্যকার সামনে এসে তাঁবু গাড়ল, উপত্যকায় ঢুকতে পারল না। ঐ অবস্থায় তারা দু' মাস রইল। তখন

একদিন সবুক্তিগিনের পাহারা দেবার পালা এল। তিনি উপত্যকার চূড়ায় উঠে দেখলেন যে সমতল ভূমি সৈন্য-সামন্তে ভরপুর এবং সামনের দিকে পাহারাও আছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'আমাদের মনিব তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ খোরাসানের আমীরের কাছে রেখে এসে ধর্মযুদ্ধে যাচ্ছেন। এখন তারা আমাদের মনিব ও আমাদের প্রাণ নিতে এসেছে। তিনি তাদের প্রতি এমন আনুগত্য, দয়া এবং শিষ্টাচার দেখিয়েছেন যার জন্য হয়ত তাঁর ও আমাদের প্রাণ দিতে হতে পারে। শুধুমাত্র অস্ত্রের দ্বারাই এ-ব্যাপার মীমাংসা হতে পারে। কারণ যতদিন আমরা চুপ করে থাকব তারা আমাদের পিছু ছাড়বে না। আল্লাহ্ অত্যাচারিতদেরই সহায়ক হন। তারা অত্যাচারী আর আমরা হলাম অত্যাচারিত।' তিনি তাঁর দলের ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন আমাদের প্রতিশোধ নেবার সময়। তারা যদি জয়ী হয় তাহলে আমাদের কাউকে জীবিত রাখবে না। আজই আমাদের শক্তি পরীক্ষা করে দেখা যাক কি ঘটে। আমাদের মনিব অনুমতি দেন আর নাই দেন, আমরা ভাগ্যের উপরই নিভর করে থাকব।' এ বলেই তিনি তাঁর তিন শত ভৃত্য দিয়ে শত্রুদের সম্মুখভাগের পাহারাদারদের আক্রমণ করে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে পরাভূত করে তাদের তাঁবুর উপর হামলা করলেন। তাদের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ার পূর্বেই সবুক্তিগিনের সৈন্যরা তাদের এক হাজারেরও বেশী সৈন্যকে ধরাশায়ী করে দিল। তারা পুনরায় একত্র হয়ে আক্রমণ করলে সবুক্তিগিন পিছু হটে উপত্যকার চূড়ার উপর এসে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

আলপ্তিগীনের কাছে খবর এল যে সবুক্তিগিন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তাদের অনেক সৈন্য মেরে ফেলেছে। আলপ্তিগীন তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এত অবিবেচক হলে কেন? আরো অপেক্ষা করা উচিত ছিল।' তিনি জবাব দিলেন, 'হে মনিব, এর পরে আর আমরা কি করে অপেক্ষা করতে পারি? আমরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছি। আর এটাই ত আমাদের জীবন-সংগ্রাম। আর অস্ত্র ছাড়া ব্যাপারটি মীমাংসা হবার নয়। যতক্ষণ জীবন থাকবে ততক্ষণ আমরা আমাদের মনিবের জন্য যুদ্ধ করব। ভাগ্যে যাই থাকুক।' তখন আলপ্তিগীন বললেন, 'এখন যেহেতু শত্রুদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ, একটা আরো উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। সকলকে বলে দাও তারা যেন তাঁবু তুলে ফেলে জিনিসপত্র বেঁধে নেয়। এশার নামাযের পর তারা যেন তাঁবু থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে উপত্যকার বাইরে চলে যায়। আমাদের

এক হাজার ভৃত্য নিয়ে গোপনে বাম পার্শ্বের যে-কোন একটা সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটে থাকতে হবে আর তোমাকেও আরেক হাজার ভৃত্য নিয়ে ডান পার্শ্বের আরেকটা গিরিসঙ্কটে থাকতে হবে। আমি এক হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে উপত্যকা অতিক্রম করে সমতল ভূমিতে গিয়ে অবস্থান করব। পরের দিন তারা উপত্যকার চূড়ায় এসে সেখানে কাউকে না পেয়ে মনে করবে যে আমি পালিয়ে গিয়েছি। তারা তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমাদের ধাওয়া করবে। তাদের অর্ধেকের মত উপত্যকা অতিক্রম করলে আমাদেরকে সমতলভূমিতে দাঁড়ান অবস্থায় দেখতে পাবে। তোমরা তখন ঝোপ থেকে এসে সশস্ত্রে তাদের আক্রমণ করবে। যুদ্ধের শব্দ শুনে শত্রুদের যারা উপত্যকা থেকে বের হয়ে আমার মুখোমুখি হবে, তারা দৌড়ে পালাবে আর অন্যান্য সকলে তোমার দ্বারা থেমে যাবে। আমি সামনে থেকে তাদেরকে আক্রমণ করব আর তুমি উপত্যকা থেকে বের হয়ে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে। তারা যতক্ষণ বাধা দিতে থাকবে ততক্ষণ আমরা তাদেরকে মারাত্মকভাবে আঘাত করতে থাকব। তারা যখন পিছ-পা হবে তখন আমরা তাদের পালানোর পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হব। আমরা তখন উপত্যকা থেকে বের হয়ে এসে তাদের তাঁবুর উপর হামলা করে তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে আসব।’

এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ করা হল। পরের দিন মনসুরের সৈন্যরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে উপত্যকার চূড়ার উপরে এসে কাউকে দেখতে পেল না। তারা উপত্যকার ভিতরে প্রায় এক ফারসাং (৬০০০ গজ) ঢুকে গেল তবুও তারা আলপ্তিগীনের তাঁবুর কোন চিহ্নই খুঁজে পেল না। তাই তারা নিশ্চিত হল যে, আলপ্তিগীন পালিয়ে গেছে। সৈন্যদের বলে দেওয়া হল, ‘তাড়াতাড়ি কর, আমাদের তাকে অনুসরণ করতে হবে। উপত্যকা অতিক্রম করে সমতল ভূমিতে গেলে এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা আলপ্তিগীনকে ধরে ফেলতে পারব।’ যাই হোক, তারা তাদের উৎকৃষ্ট সৈন্যদের সামনে দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। উপত্যকা পার হয়েই তারা আলপ্তিগীনকে এক হাজার অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিকসহ সামনের সমতল ভূমিতে দেখতে পেল। তাদের অর্ধেকের মত উপত্যকা থেকে বের হয়ে এলে তাষান একটা ঝোপের মধ্য থেকে বের হয়ে এসে বামদিক থেকে এক হাজার ভৃত্য নিয়ে আক্রমণ করে সম্মুখস্থ সৈন্যদের পিছু হটতে বাধ্য করলেন এবং তারা কিছু পালিয়ে গেল আর কিছু নিহত হল।

অন্যদিকে ডানদিক থেকে সবুক্তিগিনও আক্রমণ করলেন। সবুক্তিগিন ও তাষান মিলিত হয়ে তাড়া করলেন আর সামনের থেকে আলপ্তিগীন ভীষণ ভাবে আঘাত করতে লাগলেন। তাদের বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হল, এমন কি, তাদের সেনাপতিও মারা গেল। শত্রুসৈন্যরা তখন যে-দিকে পারল পালিয়ে গেল। আলপ্তিগীনের ভৃত্যরা তখন উপত্যকা অতিক্রম করে শত্রুদের তাঁবুতে এসে হামলা করে তাদের সমস্ত ঘোড়া, খচ্চর, উট, স্বর্ণ-রৌপ্য জিনিস, টাকা-পয়সা এবং ক্রীতদাস নিয়ে এল। শুধুমাত্র তাঁবু এবং কার্পেট জাতীয় জিনিসই রেখে এল। কারণ জিনিসপত্র রাখার জন্য তাঁবুটা ঐ জেলার কৃষকরা ব্যবহার করবে। তারা হতাহতের সংখ্যা গণনা করে শুধুমাত্র মৃতের সংখ্যাই পেল ৪৭৫০ জন।

আলপ্তিগীন তখন খুলুম থেকে রওনা হয়ে বামিয়ানের দিকে গেলেন। বামিয়ানের শাসনকর্তা আলপ্তিগীনের বিরুদ্ধে লড়ে বন্দী হল। আলপ্তিগীন তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে একটা সম্মানসূচক পোশাক দিলেন। বামিয়ানে এ শাসনকর্তা শির বারিফ নামে পরিচিত ছিল। সেখান থেকে আলপ্তিগীন কাবুলে গিয়ে কাবুলের শাসনকর্তাকে পরাজিত করেন এবং তাঁর পুত্রকে বন্দী করেন। তাকে অবশ্য পরে তার পিতার কাছে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন। কাবুলের আমীর-পুত্র ছিল লাভিকের জামাতা। তারপর আলপ্তিগীন গাজনাইন আক্রমণ করেন। গাজনাইনের শাসনকর্তা পালিয়ে শারাখে চলে যায়। আলপ্তিগীন গাজনাইনের তোরণদ্বারে এসে পৌঁছলে লাভিক এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে। কাবুলের আমীরের পুত্রকে দ্বিতীয় বারের জন্য বন্দী করা হয়। লাভিক পরাজিত হয়ে শহরের মধ্যেই পালিয়ে যায়। আলপ্তিগীন তখন তোরণদ্বারে তাঁবু গেড়ে শহর অবরোধ করেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের কারো কাছ থেকে বিনা পয়সায় কিছু নিতে নিষেধ করে আদেশ জারি করেন এবং সতর্ক করে দেন যে, কেউ সেটা অমান্য করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এভাবে তিনি জাবুলিস্তানের লোকের কাছ থেকে সম্মান লাভ করেন।

একদিন আলপ্তিগীন দেখতে পেলেন যে, তাঁর একটা তুর্কী ভৃত্য খড় ও বাচ্চা মুরগীপূর্ণ একটা থলি নিয়ে আসছে। তিনি বললেন, 'ঐ ভৃত্যটিকে আমার কাছে নিয়ে এস'। তাকে আনা হলে আলপ্তিগীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ খড় ও মুরগীর বাচ্চা তুমি কোথায় পেলে?' ভৃত্যটি বলল, 'আমি এটা একজন কৃষকের কাছ থেকে নিয়েছি।' আলপ্তিগীন তখন

আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি প্রত্যেক মাসে তোমার বেতন পাও না?' সে জবাব দিল 'হ্যাঁ পাই।' আলপ্তিগীন বললেন, 'তাহলে এগুলির দাম দাও নি কেন? এজন্যই আমি তোমাদের মাসে মাসে বেতন দেই যাতে তোমরা গরীবদের থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে তাদেরকে জ্বালাতন না কর। তাছাড়া তোমরা যাতে কারো থেকে টাকা না দিয়ে কিছু না নাও, এ মর্মে নির্দেশ জারী করে তোমাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম।' তিনি তখন হুকুম করলেন যে ভৃত্যটিকে কেটে দু'খণ্ড করে রাস্তার পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং খড় ও মুরগীর বাচ্চাপূর্ণ থলিটাও সঙ্গে থাকবে। তাছাড়া তিনি তিন দিন ধরে ঘোষণা জারি করে দিলেন যে, যদি কেউ কারো সম্পত্তি বা কোন জিনিস অপহরণ করে তাহলে তাকেও এই ভৃত্যের মত শাস্তি পেতে হবে। সৈন্যেরা ভয় পেয়ে গেল, ফলে কৃষকরাও নিরাপদে ছিল। তারপর থেকে প্রত্যহ গ্রাম থেকে প্রচুর জন্তুর খাদ্য আনা হত, কিন্তু আলপ্তিগীন এক দানাও শহরে নিতে দেন নি।

গাজনাইনের অধিবাসীরা এরূপ ন্যায়বিচার ও রক্ষণাবেক্ষণ দেখে বলতে লাগল, 'আমরা এমন একজন রাজা চাই যিনি হবেন ন্যায়-বিচারক এবং যিনি আমাদের জীবন, বিষয়-সম্পত্তি, পরিবার ও সন্তানদের নিরাপত্তা বিধান করবেন। তিনি তুর্কীই হন আর পার্সীই হন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।' সেদিনই তারা শহরের তোরণদ্বার খুলে আলপ্তি-গীনের কাছে এলে। এই দেখে লাভিক শহরের দুর্গের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করে রাখল। বিশ দিন পরে সে বের হয়ে এসে আলাপ্তগীনের কাছে গেল। আলপ্তিগীন তাকে একটা অবসর বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং গাজনাইনে তিনি স্থায়ী বাসস্থান করলেন। তিনি আর কারো কোন ক্ষতি করেন নি।

সেখান থেকে আলপ্তিগীন হিন্দুস্তানে গেলেন এবং লুণ্ঠন করে আবার ফিরে এলেন। গাজনাইন থেকে অবিশ্বাসীদের দেশে যেতে দু'দিন লাগত। খোরাসান, ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও নিমরুজে খবর ছড়িয়ে গেল যে আলপ্তিগীন হিন্দুস্তানে গিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, জন্তু ও ক্রীতদাস মিলিয়ে এতবেশী ধনসম্পদ পেয়েছেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া তার পরিমাণ আর কেউ জানে না। চারদিক থেকে এত লোক এসে আলপ্তিগীনের দলে যোগ-দান করল যে, তাঁর সহচরদের মধ্যে অশ্বারোহীর সংখ্যাই দাঁড়াল ৬ হাজারে। কয়েকটা প্রদেশ তিনি দখল করলেন আর তাঁর রাজ্যসীমা সুদূর পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করল। হিন্দুস্তানের রাজা আলপ্তিগীনকে

হিন্দুস্তান থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ১,৫০,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং ৫০০ হাতীর একটা দল মোতায়েন করলেন। পশ্চিমে খোরাসানের আমীর মনসুর যিনি খুলুম উপত্যকার পরাজয়ের জ্বালায় জ্বলছিলেন আবু জাফর নামক এক ব্যক্তিকে আলপ্তিগীনের সঙ্গে বোঝাপাড়ার জন্য ২৫,০০১ অশ্বারোহীসহ পাঠিয়ে দিলেন। আলপ্তিগীন আবু জাফরকে গাজনাইনের এক ফারসাং দূরত্বের মধ্যে আসতে দিয়ে তারপর তাঁর ৬০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খোরাসানী সৈন্যদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেন এবং মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে বল্খ উপত্যকার চেয়েও ভীষণভাবে পরাজিত করলেন। আবু জাফর পালিয়ে গিয়ে তার সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হয়ে গেল। এদিকে কৃষকরা তাকে ধরে তার কাছে অস্ত্রশস্ত্র যা ছিল সব কেড়ে নিল। সে ছদ্মবেশে পায়ে হেঁটে বল্খে পৌঁছল। খোরাসানী সৈন্যদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, লুটের মাল আলপ্তিগীনের হাতে আসল, ফলে খোরাসানের আমীর আলপ্তিগীনকে আর পুনরায় বাধা দিতে পারল না। আলপ্তিগীন আলাদা হয়ে যাওয়াতে সামানীদের ক্ষমতা অনেক কমে গেল; ফলে তুর্কিস্তান থেকে খানদের আক্রমণ করার পথ অনেক সহজ হয়ে গেল।

এভাবে আবু জাফরকে দমন করবার পর আলপ্তিগীন হিন্দুস্তানের দিকে নজর দিলেন। তিনি সাহায্য প্রার্থনা করে খোরাসান ও অন্যান্য জায়গায় চিঠি লিখলেন। অনেকেই লুটের মালের আশায় যোগদান করল। সব মিলে সৈন্যসংখ্যা হোল ১১,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক—সকলেই যুবক ও অস্ত্রে সজ্জিত। তিনি হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে হঠাৎ তাদের সৈন্যদের সম্মুখভাগ আক্রমণ করে ১০,০০০ সৈন্য মেরে ফেললেন। তিনি লুটের মালের অপেক্ষায় না থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। হিন্দুস্তানের সৈন্যরা তাঁর পিছু নিয়েও তাঁকে খুঁজে পেল না। কতকগুলো উঁচু পাহাড়ের মধ্যে একটা উপত্যকা ছিল আর সে উপত্যকার মধ্য দিয়েই ছিল হিন্দুস্তানের রাস্তা। আলপ্তিগীন উপত্যকার অগ্রভাগ দখল করে নিলেন যাতে হিন্দুস্তানের রাজা সেখান দিয়ে ঢুকতে না পারে। তাই তিনি সেখানে তাঁবু গেড়ে দু'মাস অপেক্ষা করলেন। মাঝে মাঝে আলপ্তিগীন অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করে কিছু হিন্দুস্তানী সৈন্য মেরে ফেলতেন। সবুক্তিগিন এ যুদ্ধে ভীষণভাবে খেটেছেন এবং কয়েকবার দুঃসাহসের পরিচয়ও দিয়েছেন। হিন্দুস্তানের রাজা নিরুপায় হয়ে পড়লেন। তিনি সামনেও এগোতে পারেন নি আবার তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল না করে

একটা মীমাংসা না করে তাঁর পক্ষে ফিরে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের রাজা এই বলে একটা প্রস্তাব করলেন, 'আপনারা জীবিকান্বেষণে সুদূর খোরাসান থেকে এখানে এসেছেন। আমি আপনাদের জমি দিব, থাকবার জন্য দুর্গ করে দিব এবং আপনারা হবেন আমার সেনাবাহিনীর একটা অংশ।' আলপ্তিগীনের সৈন্যরা এ প্রস্তাবে সম্মত হোল এবং দু'দলে একটা মীমাংসায় এল। এদিকে রাজা দুর্গের সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে তিনি যুদ্ধ ক্ষান্ত করলেও তারা যেন দুর্গ ছেড়ে না দেয়। রাজা যুদ্ধ থামিয়ে দিলেও সেনাপতিরা দুর্গ ছেড়ে দিল না। আলপ্তিগীন বললেন, 'তারাই চুক্তি ভেঙ্গেছে, আমি ভাঙ্গি নি।' তিনি পুনরায় আক্রমণ করে শহরগুলো ও দুর্গগুলো দখল করতে লাগলেন। এ সমস্ত আক্রমণের সময় আলপ্তিগীন মারা যান। ফলে তাঁর সৈন্যরা ও ভৃত্যরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, বিশেষ করে যখন শত্রুসৈন্যরা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেল্ল।

তাই তারা বসে বসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'আলপ্তিগীনের কোন ছেলে নেই যে তার পিতার স্থান দখল করে আমাদের নেতা হতে পারে। হিন্দুস্তানে আমরা অনেক সম্মান পেয়েছি এবং হিন্দুরাও আমাদের ভয় করে চলে। এখন যদি আমরা নিজেদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়া করি এবং প্রত্যেকেই নেতা হবার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের সম্মান ধূলিসাৎ হবে আর শত্রুরাও আমাদের পাত্তা দেবে না। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে আমরা যদি নিজেদের মধ্যেই হানাহানি করি তাহলে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে ফলে আমরা যেটুকু জায়গা দখল করেছি তাও চলে যাবে। সবচেয়ে উত্তম হবে আমাদের মধ্যে থেকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেছে তাঁকেই সেনাপতি করা হোক, তিনি যা হুকুম করবেন তাই মানতে হবে এবং তাঁকেই আলপ্তিগীন হিসাবে মানতে হবে।' তারা সকলেই বলল, 'এটাই হবে আমাদের একমাত্র উপায়।' তারা উচচশ্রেণীর প্রত্যেকটা ভৃত্য সম্পর্কে আলোচনা করে একমাত্র সবুক্তিগিন ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যেই এটা ওটা না-কোন রকম একটা দোষত্রুটি পেল। সবুক্তিগিনের নাম যখন বলা হোল তখন সকলেই চুপ করে রইল। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, 'সবুক্তিগিনের আগে কেনা হয়েছে এমন কয়েকজন ভৃত্য আছে যারা সবুক্তিগিনের চেয়ে বেশী দিন কাজ করছে।' অন্য একজন বলল, 'সবুক্তিগিনের মধ্যে বিজ্ঞতা, সাহসিকতা, পৌরুষ, দানশীলতা, আতিথেয়তা,

উদারতা, শিষ্টাচার, স্বদেশানুরাগ এবং আনুগত্য—এর কোনটারই অভাব নেই। তাছাড়া আলপ্তিগীন নিজে তাঁকে কিনেছিলেন এবং তাঁর কাজে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। এক কথায় আলপ্তিগীনের সব গুণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান এবং তিনি আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আমার যা জানা ছিল, তা আমি বললাম। এখন আপনারা যা ভাল বঝেন তাই করুন।' কিছুক্ষণ ভাল-মন্দ সম্পর্কে বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তারা সবুক্তিগিনকেই তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করল। সবুক্তিগিন নিজে উচ্চ-বাচ্য কিছুই করেন নি—যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাঁকে অনুরোধ করেছে। তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করার পর তিনি বললেন, 'এ পদ গ্রহণ করা যদি আমার জন্য অপরিহার্যই হয় তবে এ শর্তে আমি গ্রহণ করব যে, যদি কেউ আমার বিরোধিতা করে বা আমাকে অমান্য করে বা আমার আদেশ মানতে গাফলতি করে তাহলে আপনারা সকলে আমার পক্ষ নিবেন আর তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবেন।' এ শর্ত সকলেই মেনে নিল এবং সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করল। তারা তখন জাঁকজমকের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সবুক্তিগিনকে আলপ্তিগীনের চেয়ারে নিয়ে বসালো এবং আমীর হিসাবে তাঁকে সালাম করল।

সবুক্তিগিন যে কাজেই হাত দিয়েছিলেন এবং যেখানেই অভিযানে গিয়েছিলেন, সর্বত্রই কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি জাভুলিস্তানের মেয়রের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তারই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন মাহ্মুদ। সে জন্যই তাঁকে মাহ্মুদ জাভুলী বলা হোত। বড় হবার পর তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে বহুবার বহু অভিযানে এবং ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বহু বড় বড় বীরোচিত কাজ করে, বহু যুদ্ধ করে, বহু বড় বড় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং হিন্দুস্তানের বহু প্রদেশ জয় করার পর সবুক্তিগিন বাগদাদের খলীফা থেকে নাসিরউদ্দীন উপাধি পেয়েছিলেন। সবুক্তিগিনের মৃত্যুর পর সুলতান মাহমুদ সিংহাসনে বসেন। রাজ্য শাসনের সব প্রণালী তিনি তাঁর পিতার থেকে শিখেছিলেন এবং তিনি সর্বদাই রাজ-রাজড়াদের কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন আর সেজন্যই তিনি যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন সবই ছিল প্রশংসনীয়। তিনি নিমরুজ প্রদেশ জয় করেছিলেন, খোরাসানকে বশীভূত করেছিলেন এবং সুদূর হিন্দুস্তানে গিয়ে সোমনাথ দখল করে সেখান থেকে মূর্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানের রাজাদের নিহত করেছেন এবং সুখ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন।

আমার এই গল্প বর্ণনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হোল যাতে সুলতান ভাল ক্রীতদাস চিনতে পারেন এবং তিনি যেন এমন একজন সৎ লোকের মনে আঘাত না দেন, যিনি কখনও রাজদ্রোহ বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেন নি বরং যিনি সিংহাসনের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। এমন কি, তাঁর ঐসমস্ত লোকদের কথাও শোনা উচিত নয় যারা তাঁকে যে-কোন কাজে দোষারোপ করে। সৎ ক্রীতদাসের প্রতি দিনে দিনে আরো বেশী বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, কারণ রাজবংশ, সাম্রাজ্য ও শহরগুলোর শাসন ব্যবস্থা যে-কোন সময়ে একজন মাত্র ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হতে পারে আর সে ব্যক্তিটিকে বরখাস্ত করা হলে বা তার স্থান থেকে সরিয়ে দিলে ঐ রাজবংশ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে অথবা শহরটি ধ্বংস হয়ে যায় অথবা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ আলপ্তিগীন একজন প্রভুভক্ত ক্রীতদাস ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন সামানী সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু সামানী বংশীয় লোকেরা তাঁর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁকে মেরে ফেলার প্রচেষ্টা করল। তাঁর খোরাসান ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সামানী রাজবংশের উপর নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। যে-কোন একজন ক্রীতদাসকে লালন পালন করে উচ্চস্থান দিয়ে সম্মান করার পর সব সময়েই তার প্রতি সুনজর রাখা উচিত। কারণ একজন উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ দাস পেতে সারাজীবন কেটে যায়, তাছাড়া সৌভাগ্যেরও প্রয়োজন হয়। জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, একজন উপযুক্ত দাস একটা ছেলের চেয়েও উত্তম। এ বিষয়ে কবি বলেন: ‘একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাস তিন শ’ ছেলের চেয়েও উত্তম। কারণ ছেলেরা তাদের পিতার মৃত্যু কামনা করে আর ক্রীতদাস কামনা করে তার মনিবের দীর্ঘজীবন।’

আটাশ অধ্যায়

সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের অভিযোগ শ্রবণ প্রসঙ্গে

শ্রোতৃবর্গের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য কতকগুলো নিয়ম থাকা প্রয়োজন। প্রথমে আসে রাজার নিজস্ব আত্মীয়স্বজন, তারপরে অনুচরবর্গের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং শেষে আসে অন্যান্য শ্রেণীর লোক। সকলেই যদি একই সময়ে আসে তাহলে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। পর্দা উঠান থাকলেই বুঝতে হবে যে, রাজা শ্রোতাদের নিয়ে বসেছেন আর পর্দা নানান থাকলে বুঝতে হবে শুধুমাত্র তলব করা ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কোন শ্রোতা নেই। তাই সম্ভ্রান্তরা ও সেনাবাহিনীর কর্মচারীরা তাঁদের যে-কোন একজন ভৃত্যকে দরবারে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে পারেন। সুলতান তাঁদের কথা শুনতে পারবেন কিনা, যদি পারেন তাহলে তাঁরা আসতে পারেন নতুবা নয়। কারণ সম্ভ্রান্ত ও সেনাবাহিনীর কর্মচারীদের জন্য দরবারে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে আসার চেয়ে আর বিরক্তিকর কিছুই নাই। তাঁরা যদি কয়েকবার এসে রাজার সঙ্গে দেখা করতে না পেরে ফিরে যান, তাহলে তাঁরা রাজার সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা পোষণ করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেন। রাজার সঙ্গে দেখা পাওয়া যখন কঠিন হয়ে পড়ে, সব কাজ তখন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে, দুষ্ট লোকেরা উৎসাহিত হয়, সত্য ঘটনা গোপন থেকে যায়, সৈনিকদের অসুবিধা হয় এবং কৃষকরা বিপদে পড়ে যায়। ঘন ঘন দরবার বসানোর চেয়ে রাজার জন্য ভাল শাসন ব্যবস্থা আর কিছুই নাই। রাজা যখন সবার কথা শুনতে বসেন তখন সম্ভ্রান্ত, আমীর, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং ইমাম সকলেরই কক্ষে ঢুকবার সময় মাথা নত করা উচিত। সাধারণ লোকদের জন্য নিয়ম হল যে, তারা রাজাকে দেখে তাদের সকলেই সরে পড়বে যাতে দরবারে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকজন পারিষদ থাকে। তাদের সঙ্গে যে সমস্ত ভৃত্য আসে তাদেরও সরে পড়তে হবে যাতে শুধুমাত্র পারিষদবর্গ এবং প্রয়োজনীয় বালক ভৃত্যরা—যাদের ওখানে থাকা প্রয়োজন আছে, যেমন অস্ত্রবাহক, পানি সরবরাহকারী, খাদ্য পরীক্ষক ও জাতীয় লোকেরাই এখানে থাকতে পারবে। কারণ তাদের ওখানে থাকার

[illegible] আছে। কিছুদিনের জন্য এ নিয়ম প্রবর্তিত হলে, এটা পরে [illegible] পরিণত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তখন আর কোন ভীড় [illegible] না এবং পর্দা উঠানোর ও দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনও হবে না। [illegible] ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অন্য যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অনুমতি দেওয়া [illegible] নয়।

উনত্রিশ অধ্যায়

মদ্যপায়ীদের রীতিনীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

সামাজিক উৎসবাদির জন্য মাঝে মাঝে সপ্তাহব্যাপী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এই সময় এক দিনের বা দুই দিনের জন্য জনসাধারণের জন্য দরবার-কক্ষ খোলা রাখার ব্যবস্থা করা উচিত যাতে যাদের দরবারে আসার প্রয়োজন তারা আসতে পারে এবং কাউকে বঞ্চিত করা না হয়। জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে তাদের কোন্ দিন আসতে হবে, ফলে সম্ভ্রান্তদের জন্য নির্দিষ্ট দিনে তারা নিজেরাই আসবে না এবং একজনকে বাদ দিয়ে অন্য একজনকে প্রবেশাধিকার দেবার প্রয়োজন হবে না। যাদেরকে রাজকীয় ভোজসভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, তারা কে—সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাদের প্রবেশাধিকারের একটা শর্ত হবে যে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজনের বেশী ভৃত্য থাকবে না। যদি কেউ মদ্য পরিবেশনের পাত্র এবং মদ্য পরিবেশককে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, তবে সেটা অসহনীয়; এই রীতি পূর্বে কখনও ছিল না এবং এটি খুবই নিন্দাযোগ্য। সব যুগেই লোকেরা রাজপ্রাসাদ থেকে খাদ্যবস্তু, মিষ্টি ও মদ নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়, কখনও নিজেদের ঘর থেকে রাজপ্রাসাদে আনে না। কারণ সুলতান পৃথিবীর এ বিরাট পরিবারের পিতৃসমতুল্য আর সব মানুষ তাঁর সন্তান ও গোলামতুল্য। যেহেতু সকলেই তাঁর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল, তাঁর কোন উৎসবে সম্ভ্রান্তদের নিজেদের ঘর থেকে নিজেদের মদ ও খাদ্যদ্রব্য আনা উচিত নয়; কারণ অন্যান্য যে কোন সম্ভ্রান্তের চেয়ে রাজার ঘরের ব্যবস্থা উত্তম। তাছাড়া সম্ভ্রান্তদের নিজ নিজ ঘর থেকে মদ আনার কারণ যদি এই হয় যে, রাজার মদ্য পরিবেশক তাদেরকে খারাপ মদ পরিবেশন করে তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। কারণ তাকে সর্বদা ভাল মদই সরবরাহ করা হয় এবং তার খারাপ মদ পরিবেশন করার কোন কারণই নেই। তখন এ অজুহাত আর থাকবে না।

উপযুক্ত বন্ধু থাকা রাজার জন্য অপরিহার্য। কারণ রাজা যদি ক্রীত দাসদের সঙ্গে বেশী সময় কাটান, তাহলে তারা উদ্ধত হয়ে পড়ে, ফলে তাঁর জাঁকজমক কমে যায় এবং মর্যাদা থাকে না। এটা দুর্বল চরিত্রের

লক্ষণও বটে। রাজা যদি সম্ভ্রান্ত, সেনাপতি এবং বেসামরিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করেন, তাহলে তাতে তাঁর আধিপত্য কমে যায়। তারা খুব পরিচিত হয়ে যায়, ফলে রাজার আদেশ মানতে চায় না এবং টাকা-পয়সা নিয়ে প্রতারণা করে। প্রদেশসমূহ, সৈন্যবাহিনী, টাকা-পয়সা, চাষাবাদ, দেশের শত্রুদের মোকাবেলা করা ইত্যাদি ব্যাপারে সব সময় রাজার তাঁর উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এ সমস্ত কাজ এমন দুরূহ যে, এতে রাজার ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় এবং তাঁর উৎসাহ কমে যায়। কারণ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তিনি সজ্ঞানে এ জাতীয় লোকদের সঙ্গে রসিকতা করতে পারেন না। একমাত্র বন্ধুদের মাধ্যমেই রাজার মেজাজ ভাল হতে পারে এবং তিনি যদি আরো উৎফুল্ল হয়ে ফুর্তির সঙ্গে হাসি-তামাশার মধ্যে থাকতে চান, তাহলে তাঁর জাঁকজমক ও সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে একমাত্র বন্ধুদের সাহচর্যেই তা সম্ভব। কারণ এ উদ্দেশ্যেই বন্ধুদের রাখা হয়। এ বিষয়ে একটা অধ্যায় লেখা হয়েছে।

তিরিশ অধ্যায়

কার্যরত ক্রীতদাস ও ভৃত্যদের দাঁড়ানোর নিয়ম

ক্রীতদাসরা ও ভৃত্যরা কি নিয়মে দাঁড়াবে, সেটা নির্দিষ্ট থাকা ভাল। প্রত্যেকের জন্যই একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকা দরকার। কারণ, রাজার সামনে তাদের দাঁড়ান এবং বসা দুটোই একই ধরনের। বসার ও দাঁড়ানোর বেলায় একই নিয়ম মেনে চলা উচিত। রাজার ব্যক্তিগত কর্মচারী-প্রধানগণ যেমন অস্ত্রবাহক, মদ্য পরিবেশনকারী ইত্যাদি সাধারণতঃ সিংহাসনের আশে পাশে দাঁড়ান থাকে এবং যদি বাইরের কেউ তাদের মধ্যে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, দরবারের গৃহাধ্যক্ষ তাকে বের করে দিবে। এভাবে যদি সে কোন নতুন লোককে বা অনুপযুক্ত কাউকে কোন সারিতে দাঁড়ান দেখে, তাহলে চীৎকার করে তাকে সেখান থেকে বের করে দিবে।

একত্রিশ অধ্যায়

যুদ্ধ ও যুদ্ধাভিযানের জন্য অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করা

যে সমস্ত নামকরা ব্যক্তি কাপড়-চোপড়ের জন্য বিরাট ভাতা পায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে এবং ভৃত্য কিনবার জন্য বলতে হবে। কারণ তাদের আড়ম্বর, আভিজাত্য এবং মর্যাদা এই সমস্ত জিনিসের উপরই নির্ভরশীল, তাদের ঘর সাজানোর এবং আসবাব-পত্রের জাঁকজমকে নয়। পূর্বোল্লিখিত গুণগুলো যাঁর মধ্যে বেশী বিদ্যমান রাজা তাঁকেই বেশী পছন্দ করবেন এবং তিনিই তাঁর সমকক্ষ ও অধীনস্থদের থেকে বেশী সম্মান পাবেন এবং ক্ষমতাশালী হবেন।

বত্রিশ অধ্যায়

সৈনিক, ভৃত্য এবং অনুচরদের অনুরোধ ও অভিযোগ সম্পর্কে

সৈনিকরা যে-কোন অনুরোধই করুক না কেন, সেটা তাদের দলপতি এবং উপরস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে করতে হবে যাতে কোন সুবিধাজনক উত্তর পেলে তাদের মাধ্যমেই সেটা পৌঁছে দেওয়া হয়। এর ফলে সৈনিকদের তাদের দলপতি ও উপরস্থ কর্মচারীদের প্রতি সম্মান বেড়ে যাবে। কারণ সৈনিকরা নিজেরা তাদের অভাব-অভিযোগের কথা বললে তাদের কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হবে না, ফলে দলপতির সম্মান কমে যাবে। একটি দলের কোন সৈনিক যদি তার উপরস্থ কর্মচারীর প্রতি উদ্ধত হয় বা তাকে উপযুক্ত সম্মান না দেখায় এবং সে যদি তার ক্ষমতার বাইরে কিছু করে তাহলে তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিতে হবে যাতে উপরস্থ ও অধীনস্থদের মধ্যে তফাত বজায় থাকে।

তেত্রিশ অধ্যায়

ভুলের বা অন্যায়ের জন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তিরস্কার করা

উচ্চপদে উন্নীত ব্যক্তিদের বেশী সময় কাজ করতে হয় এবং বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাঁরা কখনও কোন ভুল করলে তাঁদের যদি প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয় তাহলে তাঁদের মর্যাদার হানি হয় এবং সেটা সে-কোন রকম সহানুভূতি বা পক্ষপাতিত্বের দ্বারাই পূরণ হয় না। তাই কেউ কোন অন্যায় বা ভুল করলে প্রথমে সেটা উপেক্ষা করাই ভাল। পরে তাকে ডেকে বলতে হবে, 'তুমি এ কাজ করেছ। কিন্তু যেহেতু আমরা যাকে উন্নীত করেছি তাকে নিচু করতে চাই না তাই আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' সম্ভবতঃ এর পরে সে আরো বেশী সাবধান হয়ে যাবে এবং এরূপ ভুল আর করবে না। কারণ তারপরেও যদি কোন অন্যায় করে তাহলে সে তার পদ হারাবে এবং সেটা তার নিজের দোষেই।

খলীফা আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'সবচেয়ে সাহসী বীর কে?' তিনি বললেন, 'যার নিজের উপর কর্তৃত্ব আছে এবং যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে অর্থাৎ এমন কাজ না করে যাতে পরে অনুশোচনা করতে হয়। কেননা, অনুশোচনা করে কোন ফল হয় না।'

জ্ঞানে পূর্ণতা আনতে পারলেই মানুষ ক্রোধবিবর্জিত হতে পারে। আর যদি ক্রোধ হয়ই তবে ক্রোধের উপর বিজ্ঞতারই প্রাধান্য থাকা উচিত, বিজ্ঞতার উপর ক্রোধের নয়। যদি কারো দুর্বার কামনা কাণ্ডজ্ঞানের উপরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সে যদি কামনা চরিতার্থ করার জন্য উন্মত্ত-প্রায় হয় তাহলে তার কামনা জ্ঞান-চক্ষুকে ঢেকে দেয় এবং তার কাজকর্ম ও কথাবার্তায় একটা মস্তিক-বিকৃতির পূর্ণরূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু কোন লোক তার কামনাকে যদি জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে রাগের সময় তার বিজ্ঞতাই তার স্বার্থান্ধ কামনার উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে কাজকর্ম ও কথাবার্তা কিছুই অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মত হবে না এবং কেউ-বুঝতে পারবে না যে তার রাগ হয়েছে।

একদিন হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ) একদল সাহাবা ও আরব নেতাদের নিয়ে টেবিলে বসে রুটি খাচ্ছিলেন, তিনি একটা দামী আল-খেল্লা

পরিহিত ছিলেন এবং মাথায় ছিল সুন্দর একটি পাগড়ি। তাঁর পিছনে দাঁড়ান একজন ভৃত্য তাঁর সামনে খাবার পাত্র রাখতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো হোসাইনের মাথায় এবং ঘাড়ে পড়ে তাঁর আলখেল্লা ও পাগড়ি নষ্ট হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই ক্রোধে হোসাইনের মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি মাথা তুলে ভৃত্যটির দিকে তাকালেন। ভৃত্যটি তাঁকে এইরূপ দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন। সে বলল (কোরআনঃ ৩, ১২৮) 'যারা ক্রোধকে সংযত করে তারাই মানব জাতির প্রতি ক্ষমা পোষণ করে'। হোসাইনের মুখাকৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তিনি বললেন, 'হে ভৃত্য, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি যাতে তুমি আমার ক্রোধ ও দণ্ডের থেকে চিরকালের জন্য রেহাই পাও।' উপস্থিত সকলে ঐরূপ অবস্থায় হোসাইনের কোমলতা, ধৈর্য ও মহানুভবতা দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন।

কথিত আছে যে, মুয়াবিয়া অতিশয় সহিষ্ণু ও দয়ালু ছিলেন। একদিন যখন তিনি সকল সম্ভ্রান্তদের সামনে বিচারে বসেছেন, তখন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত একটা যুবক তাঁর কাছে আসল। যুবকটি মুয়াবিয়াকে সালাম করে ধৃষ্টতার সঙ্গে তাঁর সামনে বসে তাঁকে বলতে লাগল, 'হে খলীফা, আমি আজ আপনার কাছে একটা জরুরী অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আপনার অনুমতি পেলে বলতে পারি।' মুয়াবিয়া বললেন, 'আমার পক্ষে যা সম্ভব তা আমি করব।' যুবকটি তখন বলল, 'আমি এক গরীব বেচারা; আমার স্ত্রী নেই। আপনার মারও কোন স্বামী নেই। তাকে যদি আমার সঙ্গে বিয়ে দেন তাহলে আমার একজন স্ত্রী হবে, তিনিও স্বামী পাবেন আর আপনি পাবেন আপনার পুরস্কার।' মুয়াবিয়া তখন বললেন, 'তুমি একটা যুবক আর তিনি হলেন একজন বৃদ্ধা এবং এত বৃদ্ধা যে তাঁর একটা দাঁতও নেই। তাঁকে কি জন্য বিয়ে করতে চাও?' সে বলল, 'কারণ আমি শুনেছি তাঁর বিরাট পাছা আছে আর আমি সর্বদা বিরাট পাছাই পছন্দ করি।' মুয়াবিয়া বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমার পিতাও এই একই জিনিস দেখে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁরও ঐ একমাত্র জিনিস ছিল। যাই হোক, আমি আমার মাকে এ কথা বলব। তিনি যদি রাজী হন তাহলে নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হব।' মুয়াবিয়া কোন উদ্বেগই প্রকাশ করেন নি এবং সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিলেন। সকলেই স্বীকার করলেন, এমন ধৈর্য দেখা যায় না।

জ্ঞানীরা বলেছেন, সহিষ্ণু হওয়া ভাল তবে তা যদি সফলতা লাভের কারণ হয় তবে আরো ভাল ; জ্ঞান থাকা ভাল আর সঙ্গে নৈপুণ্য থাকলে আরো ভাল ; সম্পদ থাকা ভাল আর সঙ্গে যদি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ থাকে তাহলে আরো ভাল ; উপাসনা করা ভাল তবে যদি তা বুঝে এবং খোদার জন্যে করা হয় তবে আরও ভাল।

চৌত্রিশ অধ্যায়

নৈশপ্রহরী, রক্ষী এবং মুটে প্রসঙ্গে

রাজার নিজস্ব প্রহরী, রক্ষী ও মুটেদের সম্পর্কে খুব বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ সমস্ত দায়িত্বে যারা থাকবে তাদেরকে এদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে হবে। কারণ তারা বেশীর ভাগই নীচু পরিবারের, ফলে তাদেরকে সহজেই স্বর্ণের বিনিময়ে প্রলুব্ধ করা যায়। ঐ সমস্ত পদে নতুন কেউ আসলে তার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। প্রত্যেক রাত্রে তাঁর প্রহরায় থাকা অবস্থায় তাদের প্রত্যেককে পরিদর্শন করে দেখা উচিত আর দিনই হোক রাত্রিই হোক এ ব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

পঁয়ত্রিশ অধ্যায়

লোকদের ভালভাবে খাওয়ানো তথা আতিথেয়তা প্রসঙ্গে

রাজারা প্রত্যহ সকালে খাবারের টেবিল সাজানোর দিকে নজর রাখেন যার ফলে রাজার দর্শনপ্রার্থী সকলেই কিছু না কিছু খাবার পেতে পারে। রাজ-দর্শনার্থী ব্যক্তিদের যদি তখন খাবারের প্রয়োজন নাও থাকে তবুও টেবিলে খাবার পরিবেশিত থাকা প্রয়োজন।

টেবিলে ভাল এবং বিভিন্ন রকমের খাবার রাখার দিকে সুলতান তুগরিলই অত্যন্ত নজর দিতেন। তাঁর কোথাও বেড়াতে বা শিকারে যাবার সময় খাবার প্রস্তুত করা হোত এবং যখন সেগুলো পরিবেশন করা হোত, সকল আমির-ওমরাহ্, পরিমাণে এত বেশী দেখে অবাক হয়ে যেতেন। তুর্কিস্তানের খানদের সময়ে ভৃত্যদের কাছে এবং তাদের রান্নাঘরে প্রচুর খাবার রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল। আমরা যখন সমরকন্দ ও উজগান্দে (মালিক শাহ তাঁর সময়ে এই অঞ্চলে দু'বার অভিযানে গিয়েছিলেন) গিয়েছিলাম, তখন কিছু অনধিকার চর্চাকারী লোককে বলতে শুনা যেত যে জিকিলীরা এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানার লোকেরা প্রায়ই বলে যে সুলতানের আসা থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত তাঁর টেবিলে তারা এতটুকু কিছু খায়নি।

একজন মানুষের মহানুভবতা ও উদারতার বিচার তার সাংসারিক ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ থেকেই করা উচিত। সুলতান গোটা জগৎ পরিবারের কর্তা, আর সব রাজাই তাঁর আয়ত্তে। তাই তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থাপনা, তাঁর মহানুভবতা, উদারতা, তাঁর টেবিল এবং তাঁর উৎসবের সময়ের উপহার সবই তাঁর মর্যাদার উপযোগী হওয়া দরকার।

হাদীসে আছে, আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য প্রচুর খাবারের বন্দোবস্ত করলে তাতে রাজার আয়ু, রাজত্ব এবং সৌভাগ্য সবই বেড়ে যায়।

মূসা (আঃ) এবং ফেরআউনের গল্প

নবীদের জীবন কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, খোদাতায়ালা মূসাকে অলৌকিক ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী করে ফেরআউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ফেরআউনের খাবার টেবিলের দৈনিক বরাদ্দ ছিল চার হাজার ভেড়া,

চার শত গরু, দুই শত উট এবং সমপরিমাণে মুরগী, ভাজা মাংস, মিষ্টি ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু। মিসরের জনসাধারণ এবং তার সমস্ত সৈন্য তার সংগে খাবার গ্রহণ করত। চার শত বছর ধরে ফেরআউন ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী বলে দাবী করত এবং কখনও এ রকম খাবার সরবরাহ বন্ধ করে নাই।

যখন মূসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, 'হে স্রষ্টিকর্তা, ফেরআউনকে ধ্বংস করে দাও।' আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনার জবাবে বললেন, 'আমি তাকে পানিতে ধ্বংস করব এবং তোমাকে তার সমস্ত সম্পত্তি ও সৈন্যগণের অধিকারী করে দিব।' এ প্রতিজ্ঞার পরে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, ফেরআউন পূর্বের মতই জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতে লাগল। মূসা (আঃ) তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন, বেশীদিন অপেক্ষা করা তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি চল্লিশ দিন রোজা থাকার পর সিনাই পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করে বললেন, 'হে খোদা, তুমি আমায় প্রতিজ্ঞা করেছ যে ফেরআউনকে তুমি ধ্বংস করবে কিন্তু এখনও তার আল্লাহকে নিন্দা এবং মিথ্যা ভান করা কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই, তুমি কবে তাকে ধ্বংস করবে?' শব্দ ভেসে এল। শোনা গেল, 'হে মূসা, তুমি চাও যে আমি যত শীঘ্র সম্ভব ফেরআউনকে ধ্বংস করে ফেলি, কিন্তু আমার এক হাজার বান্দা আমার কাছে হাজার বার প্রার্থনা জানাচ্ছে যেন আমি একাজ কখনও না করি। কারণ, তারা তার প্রাচুর্যের থেকে অংশ পাচ্ছে এবং তার রাজত্বে শান্তিতেই আছে। সে যতদিন পর্যন্ত আমার প্রজাদের জন্য প্রচুর খাবারের বন্দোবস্ত করবে এবং তাদেরকে শান্তিতে রাখবে ততদিন পর্যন্ত আমার ক্ষমতার দ্বারা আমি তাকে ধ্বংস করবো না।' মূসা (আঃ) বললেন, 'তাহলে কখন তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে?' আল্লাহ্ বললেন, 'আমার প্রতিজ্ঞা তখনই পূরণ হবে যখন সে আমার প্রজাদের আহার্যের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করবে। যদি সে কখনও তার আতিথেয়তা বিসর্জন দেয় তাহলে বুঝবে যে তার দিন ঘনিয়ে আসছে।'

হঠাৎ একদিন ফেরআউন হামানকে বলল, 'মূসা বনি ইসরাঈলদের সংগঠিত করে আমার বিরুদ্ধে অশান্তির স্রষ্টি করছে। আমরা জানি না, কি উদ্দেশ্যে সে আমাদের বিরুদ্ধে এরূপ ব্যবস্থা করে। তবে আমাদের খাদ্যভাণ্ডার ও ধনাগার সর্বদা পূর্ণ রাখতেই হবে যাতে পরে উপায়হীন হয়ে না পড়ি। তাই আমাদের প্রত্যেক দিনের খাবারকে দু'ভাগ করে এক ভাগ সঞ্চয় করতে হবে।' সে দুই হাজার ভেড়া, দুই শত গরু ও এক শত

বাদ দিয়ে দিল এবং এভাবে প্রতি দুই তিন দিন অন্তর অন্তর দৈনিক খাবারের তালিকাও কমিয়ে ফেলল। মূসা (আঃ) তখন বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা পালিত হতে যাচ্ছে, কারণ কৃপণতা পতনের লক্ষণ। লোকে বলে, যেদিন ফেরআউন সমুদ্রে ডুবে মারা যায়, সেদিন তার পাকঘরে মাত্র দু'টা ভেড়ী জবাই করা হয়েছিল।

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বদান্যতা ও আতিথেয়তা আল্লাহ্‌র প্রশংসা লাভ করেছিল। বদান্যতা ও আতিথেয়তার জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা হাতেম তাইকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন মানুষ হাতেম তাই-এর উদারতার কথা স্মরণ করবে। হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কেও এরূপ কথা প্রচলিত আছে। তিনি নামাযের সময় তাঁর আংটিটা একটা ভিক্ষুককে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং বহু ক্ষুধার্ত লোককে সন্তুষ্ট করেছিলেন। কোরআনে বহু স্থানে তাঁর কথা উল্লেখ আছে এবং তাঁর প্রশংসা-স্তুতি আছে। কেয়ামতের দিন পর্যন্ত লোকে তাঁর সাহসিকতা ও উদারতার কথা স্মরণ করবে।

উদারতা, দয়া এবং অতিথিপরায়ণতার চেয়ে মহৎ আর কিছুই নাই। কাউকে আপ্যায়ন করাই হোল দানশীলতার প্রথম সোপান এবং উদারতার মূলকথা। এ সম্পর্কে কবি আনসুরী বলেছেন,

উদারতাই হোল সব গুণের শ্রেষ্ঠ
উদারতা পয়গম্বরের স্বভাব
উদার লোকের জন্য দুই কালই নিশ্চিত
উদার হও ; দুই কালই তোমার হবে।

একজন লোকের যদি প্রচুর ধনসম্পদ থাকে এবং তিনি যদি সকলকে নত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতঃ তাঁকে প্রভু ও রাজপুত্র বলতে বলেন, তাহলে তাঁকে বলতে হবে প্রত্যহ তিনি যেন একটা টেবিলে বিভিন্ন রকমের খাবার সাজিয়ে রাখেন। যাঁরা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের সকলেই প্রধানতঃ আতিথেয়তার মাধ্যমে সেটা লাভ করেছেন আর কৃপণ ও অর্থলিপ্সু ব্যক্তিরা দু'কালেই ঘৃণিত হবে।

প্রচলিত একটা কথা আছে, 'কৃপণেরা বেহেশ্‌তে যাবে না।' প্রাক্-ইসলাম ও ইসলামী সব যুগেই আতিথেয়তার মূল্যই সবচেয়ে বেশী দেওয়া হয়েছে।

ছত্রিশ অধ্যায়

উপযুক্ত ভৃত্য ও ক্রীতদাসদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া

কখনও কোন গৃহভৃত্য প্রশংসনীয় কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার কাজের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, যাতে সে তার আন্তরিকতার ফল পেতে পারে। আর যদি কেউ অযৌক্তিক এবং ইচ্ছাকৃত অন্যায় করে তাহলে তাকে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তি দেওয়া দরকার, যাতে অন্যান্য ক্রীতদাসরা তাদের কাজে আরো বেশী পরিশ্রমী হয় এবং অপরাধীরা বেশী ভয় পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সবকিছু ঠিকভাবে চলবে।

হাশিম গোত্রের একটা ছেলে একদল লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং লোকগুলো তার পিতার কাছে গিয়ে নালিশ করে। পিতা ছেলেকে শাস্তি দিতে যাচ্ছেন এমন সময় ছেলে পিতাকে বলল, 'আমি অন্যায় করেছি, কারণ আমি অবুঝ ছিলাম কিন্তু আপনি জ্ঞানী হয়ে আমায় শাস্তি দিবেন না।' ছেলের কথায় পিতা খুব খুশী হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

ইবনে খুরদাদবিহ্ বলেছেন যে, পারভেজ রাজা একবার তাঁর এক সভাসদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আটক করে রাখেন। শুধুমাত্র চারণ কবি বারবুদ (যিনি প্রত্যেক দিন তাঁর কাছে খাবার ও মদ নিয়ে দিতেন) ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস পায়নি। পারভেজ রাজা গোটা জানতে পারলেন। তিনি বারবুদকে বললেন, 'আমরা যখন একজন লোককে আটক করেছি, তখন তুমি কিভাবে তার কাছে যেতে সাহস কর? তুমি কি এটা জান না যে, আমরা কোন লোকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে আটক করলে তার প্রতি কোন যত্ন নেওয়া হয় না?' বারবুদ বললেন, 'হে রাজা, আপনি তার যা কিছু রক্ষা করেছেন সেটা আমি তার জন্য যা করছি তার চেয়ে অনেক বেশী।' রাজা বললেন, 'আমি তাকে কিভাবে রক্ষা করেছি?' বারবুদ বললেন, 'আপনি তার জীবন রক্ষা করেছেন এবং সেটাই আমি যা করছি তার চেয়ে উত্তম।' তখন রাজা বললেন, 'সাবাস! তুমি ভাল কথাই বলেছ। যাও, তোমাকে আমি দানস্বরূপ লোকটাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

সাসানী রাজাদের সময় প্রচলিত নিয়ম ছিল যে যদি কখনও কোন ব্যক্তি রাজার সামনে এমন কিছু বলত বা এমন কিছু নৈপুণ্য দেখাত

যাতে রাজা খুশী হয়ে বাহবা বলতে বাধ্য হতেন, তাহলে কোষাধ্যক্ষ তখনি তাকে ১000 দিরহাম দিয়ে দিতেন। ন্যায়বিচার, মনুষ্যত্ববোধ এবং মহানুভবতায় খসরুরা সবাইকে অতিক্রম করেছিলেন, বিশেষ করে মহামতি নওশেরওয়াঁ।

কথিত আছে যে, একদা নওশেরওয়াঁ ঘোড়ায় চড়ে তাঁর অনুচরদের নিয়ে শিকারে যাচ্ছিলেন। একটা গ্রামের পার্শ্ব দিয়ে যাবার সময় তিনি একজন নব্বই বছর বয়স্ক বৃদ্ধকে আখরোট ফলের গাছ লাগাতে দেখলেন। নওশেরওয়াঁ দেখে বিস্মিত হলেন, কারণ আখরোট গাছ লাগানোর পর ফল পেতে বিশ বছর লাগে। তিনি বললেন, 'হে বৃদ্ধ, তুমি কি আখরোটের গাছ লাগাচ্ছো?' বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'হ্যাঁ জাঁহাপনা।' রাজা তখন বললেন, 'তুমি কি এ আখরোটের ফল খেয়ে যেতে পারবে?' বৃদ্ধ বলল, 'অন্যেরা গাছ লাগিয়েছে, আমরা তার ফল উপভোগ করেছি আর আমরা লাগাচ্ছি, অন্যেরা তার ফল উপভোগ করবে।' নওশেরওয়াঁ খুব খুশী হয়ে বললেন, 'বাহবা'। সঙ্গে সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ বৃদ্ধকে ১000 দিরহাম দিয়ে দিল। বৃদ্ধ বলল, 'হে রাজা, এই অধমের আগে কেউ এই গাছের ফল উপভোগ করতে পারবে না।' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা কিভাবে?' বৃদ্ধ তখন বললেন, 'আমি যদি এ আখরোটের গাছ না লাগাতাম এবং আপনি যদি এ পথে না যেতেন, আমাকে যদি ঐ প্রশ্ন না করতেন এবং আমি যদি ঐরূপ উত্তর না দিতাম তাহলে কোথা থেকে আমি এ ১000 দিরহাম পেতাম?' শুনে নওশেরওয়াঁ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'সাবাস, সাবাস।' এবং কোষাধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আরো ২000 দিরহাম দিয়ে দিল, কারণ রাজা 'সাবাস' শব্দটি দু'বার উচ্চারণ করেছেন।

একদিন আল-মামুন অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করার জন্য দরবারে বসেছেন, এমন সময় অভাব-অভিযোগ সম্পর্কিত একখানা দরখাস্ত পেলেন। আল-মামুন দরখাস্তখানা তাঁর উজির ফজল ইবনে সাহলকে দিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই এ লোকটার অভাব দূর করে দাও বা অভিযোগ মিটায়ে দাও, কারণ ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী এবং দুনিয়ায় কেউ সারাজীবন ক্ষমতায় সমাসীন থাকতে পারে না। আজ হয়ত আমরা একটা ভাল কাজ করতে পারি, কিন্তু আগামীকল্য এমনও হতে পারে যে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনিবার্য কারণবশতঃ কারো কোন উপকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

সাঁইত্রিশ অধ্যায়

জায়গীর অধীনস্থ জমি এবং কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন

যদি কোন অঞ্চল থেকে খবর পাওয়া যায় যে, কৃষকদের প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে এবং তাদেরকে অন্যদিকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যদি সন্দেহ জাগে যে, খবরদাতা স্বার্থপরবশ হয়ে এ খবর পাঠিয়েছে তাহলে হঠাৎ করে একজন বেসরকারী লোককে কোন এক অছিলায় দুই-এক মাসের জন্য ঐ অঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলো পরিদর্শন করে নিজ চোখে তাদের অবস্থা দেখে আসার জন্য পাঠান উচিত—যাতে তার ওখানে যাবার উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে না পারে। সে ওখানে গিয়ে দেখবে যে লোকেরা উন্নতি করছে, না তাদের অবস্থা পতনের দিকে যাচ্ছে। সে লোকদের থেকে রাজস্ব প্রতিনিধি এবং রাজস্ব আদায়কারীদের সম্পর্কে মন্তব্য শুনে যথার্থ সংবাদ নিয়ে আসবে। কারণ কর্মচারীদের প্রশ্ন করা হলে তারা সব সময় এটা-ওটা অজুহাত দেখিয়ে বলে যে নালিশকারী তাদের শত্রু। তাদের কথা শোনা উচিত নয়, কারণ তাদের কথা শুনলে তারা দুঃসাহসী হয়ে যাবে এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু করবে। এদিকে বিশ্বস্ত সংবাদদাতারাও রাজাকে অথবা রাজস্ব প্রতিনিধিকে উপদেশ দিতে বিরত থাকবে। কারণ পাছে তাদেরকে যদি আবার স্বার্থপর মনে করা হয়। এ কারণে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে; কৃষকরা দরিদ্র হচ্ছে ও তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আর তাদের থেকে অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করা হচ্ছে।

আটত্রিশ অধ্যায়

কোন ব্যাপারে রাজার হঠাৎ কিছু করে না বসা প্রসঙ্গে

কোন বিষয়ে কারও ঝোঁকের মাথায় চলা উচিত নয়। কখনও কোন সংবাদ শুনলে অথবা কোন সম্ভাব্য বিষয়ে সন্দেহ জাগলে ধীর-স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে সত্যিকার ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং সত্য-মিথ্যা বিবেচনা করা যায়। কারণ কোন বিষয়ে অতি ত্বরা করা দুর্বলতার লক্ষণ, ক্ষমতার চিহ্ন নয়। পরস্পর কলহরত দুই ব্যক্তি রাজার কাছে আসলে তাঁর তাদেরকে জানতে দেওয়া উচিত নয় যে কোন্ পক্ষের প্রতি তাঁর সমর্থন আছে। কারণ তাহলে ন্যায়পক্ষ হয়ত ভয়ে কথা বলতে সাহস পাবে না, অন্যদিকে অন্যায়পক্ষের এতে দুঃসাহস ও মিথ্যা বলার প্রবণতা বেড়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেছেন যে, কেউ কিছু বললে সেটার যথার্থতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত কোন কিছু বলা উচিত নয়। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন (কোরআন: ৪৯.৬) 'হে বিশ্বাসিগণ, যদি কোন দুষ্ট লোক তোমাদেরকে কোন খবর এনে দেয় তাহলে প্রথমে তার সত্যতা পরীক্ষা কর যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কাউকে শাস্তি দিয়ে তোমার কৃতকার্যের জন্য পরে আবার অনুশোচনা করতে না হয়।' সেজন্য কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়, কারণ তা অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর অনুশোচনা করে কোন লাভ হয় না।

হেরাত শহরে বেশ নামকরা একজন বিদ্বান ছিলেন (আব্দ-আল্লাহ্ আনসারী)। আসলে তাঁকেই বিকরাক (আল্প আরসলনের গৃহাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি মালিক শাহের অধীনেও কাজ করেছিলেন) সুলতানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সুলতান হেরাতে গিয়ে কিছুদিন থাকলেন। আবদুর রহমান খান এ বৃদ্ধ বিদ্বানের বাড়ীতে ছিলেন। একদিন মদের টেবিলে তিনি সুলতানের সামনে বললেন, 'এ বৃদ্ধ ব্যক্তির একটা কামরা আছে যার মধ্যে তিনি প্রত্যহ রাত্রে যান। শুনেছি তিনি সারারাত্র ধরে নামায পড়েন। আজ আমি সে কক্ষের দরজা খুলে তার মধ্যে ঢুকে দেখলাম সেখানে একটি মদের কলসী ও পিতল-নির্মিত মূর্তি আছে। কাজেই বোঝা যায় তিনি সারারাত মদ খান আর মূর্তিকে পূজা করেন।' তিনি মদের পাত্র ও পিতল-নির্মিত মূর্তি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন। আবদুর রহমান

জানতেন যে এ কাহিনী যদি সুলতানের কাছে বলে দেওয়া হয় তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধকে মেরে ফেলতে হুকুম দিবেন। সুলতান তখন বৃদ্ধ লোকটিকে খুঁজতে একজন ভৃত্যকে পাঠালেন আর অন্য একজন ভৃত্যকে দিয়ে আমার কাছেও বলে পাঠালেন লোকটিকে কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠানোর জন্য। আমি জানতাম না কেন তিনি লোকটাকে ডেকে পাঠিয়েছেন; কিন্তু এক ঘন্টা যেতে না যেতেই ভৃত্য পুনরায় এসে বলল, 'তাকে ডাকবেন না।'

পরের দিন আমি সুলতানকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কারণে আপনি ঐ বৃদ্ধ বিদ্বানকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন এবং পরে আবার ডাকতে নিষেধ করলেন?' তিনি বললেন, 'আবদুর রহমান খানের ধৃষ্টতার কারণেই এমন হয়েছিল। তখন তিনি ঘটনাটা আমাকে বললেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, তিনি আবদুর রহমানকে বলেছেন, 'তুমি আমাকে বলা সত্ত্বেও এবং মদের পাত্র ও পিতল-নির্মিত মূর্তি দেখান সত্ত্বেও আমি এটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কিছুই করতে ইচ্ছুক নই। সুতরাং তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বল যে তুমি যা বলছ তা সত্যি না মিথ্যা।' আবদুর রহমান বললেন, 'আমি মিথ্যা বলেছিলাম।' তখন সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে দুরাচার! কি কারণে তুমি এ বৃদ্ধ বিদ্বান লোকটির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে তার রক্তপাত করতে চেয়েছিলে?' তিনি বললেন, 'যেহেতু তার একটা সুন্দর বাড়ী আছে এবং আমি সেখানেই আছি। আপনি তাকে মেরে ফেললে বাড়ীটা আমাকে দিতেন।'

ধর্মীয় নেতারা বলেছেন, 'অস্থিরতা শয়তানের ধর্ম আর চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ্ তায়ালার।' অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায় কিন্তু কৃতকর্ম আর উদ্ধার করা যায় না।

বুজুরচমিহর বলেন, 'চঞ্চল মস্তিকের থেকেই আসে হঠকারিতা। যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে, যার মধ্যে স্থিরতা নেই তাকে সারাজীবনই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।' আমি দেখেছি অনেক কাজ সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়েছে কিন্তু অত্যধিক তাড়াহুড়ার জন্যে পরে বিনষ্ট হয়ে গেছে। হঠকারী ব্যক্তি সর্বদা নিজেকে গালাগালি করে, দিনের পর দিন অনুশোচনা করে, কৃতকর্মের ক্ষমা চায়, তাকে দোষ মাথায় নিতে হয় আর ভুলের মাসুল দিতে হয়। খলীফা আলী (রাঃ) বলেছেন, 'দানশীলতা ছাড়া সব কাজেই ধীর স্বভাব প্রশংসনীয়।'

উনচল্লিশ অধ্যায়

রক্ষীপ্রধান, দণ্ডধারী এবং শাস্তিদানের অস্ত্র প্রসঙ্গে

সব যুগেই রক্ষীপ্রধানের পদ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর একটি ছিল। আসলে আমীরের গৃহাধ্যক্ষকে বাদ দিয়ে দরবারের রক্ষীপ্রধানের মত বড় পদ আর ছিল না। কারণ শাস্তিদানের ব্যাপারটা তার উপরই ন্যস্ত। রাজার ক্রোধ এবং শাস্তিকে সবাই ভয় করে এবং রাজা কারো উপর ক্রুদ্ধ হলে রক্ষীপ্রধানকেই হুকুম দেন তার শিরশ্ছেদ করতে, তার হাত-পা কেটে দিতে, তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে, তাকে বেত্রাঘাত করতে, তাকে আটক করতে অথবা তাকে কোন গভীর গর্তে ফেলে দিতে। এদিকে লোকেরাও তাদের জীবন রক্ষার্থে তাদের জিনিসপত্র ও বিষয়-সম্পত্তি বিসর্জন দিতে ইতস্তত: করে না। রক্ষীপ্রধানের সঙ্গে থাকত ঢাক, পতাকা ও সঙ্গীত আর লোকেরা শোনা যায় রাজার চেয়ে তাকে বেশী ভয় করত। কিন্তু আমাদের সময় এ পদের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। দরবারে সব সময় কমপক্ষে পঞ্চাশ জন দণ্ডধারী থাকা উচিত। তাদের মধ্যে বিশ জনের হাতে থাকবে স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ড, বিশ জনের হাতে রৌপ্যমণ্ডিত দণ্ড আর বাকী দশ জনের হাতে থাকবে বড় যষ্ঠি। রক্ষীপ্রধানের সাজ-সরঞ্জাম ও পরিচ্ছদ খুব উচ্চ মানের হতে হবে আর তাকে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে থাকতে হবে। বর্তমানে কার্যরত ব্যক্তির মধ্যে যদি এ গুণগুলো থাকে তাহলে ভালই, নইলে তাকে বদল করে অন্য একজনকে রাখা উচিত।

আল-মামুন ও দুইজন রক্ষীপ্রধানের গল্প

খলীফা আল-মামুন একদিন তাঁর বন্ধুদের কাছে বললেন, 'আমার দুইজন রক্ষীপ্রধান আছে যাদের কাজ হল সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত লোকের শিরশ্ছেদ করা, হাত-পা কাটা, বেত্রাঘাত করা এবং লোককে বন্দী করা। একজনকে লোকে খুব ভাল বলে এবং সকলেই তার প্রশংসা করে আর অন্যজনকে সকলে গালাগালি করে। তার নাম শুনলেই লোকে তাকে অভিশাপ দেয় এবং সব সময়ই তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। এর কারণ কি আমি জানি না। আমি যদি কারো দ্বারা জানতে পারতাম কেন একই পদের লোক হওয়া সত্ত্বেও একজনকে লোকে প্রশংসা

করে আর অন্যজনের বিরুদ্ধে নালিশ করে।' খলীফার জনৈক বন্ধু বললেন, 'আমাকে তিন দিনের সময় দিলেই আমি আপনাকে সব জানিয়ে দিতে পারব।' খলীফা তখন বললেন, 'বেশ, তাই হোক।'

বন্ধুটি বাড়ী গিয়ে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। বাগদাদে এখন দুইজন রক্ষীপ্রধান আছে তাদের একজন বৃদ্ধ আর অন্যজন মধ্য-বয়স্ক। আগামীকল্য ভোরে অন্ধকার থাকতে তুমি তাদের মধ্যে বৃদ্ধজনের বাড়ীতে যাবে। তিনি তাঁর কামরা থেকে অঙ্গনে বের হয়ে আসলে লক্ষ্য করবে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কি করেন এবং কি বলেন; আর লোকেরা তাঁর কাছে গেলে এবং আসামীদের তাঁর কাছে আনলে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন এবং কি আদেশ দেন সেটাও দেখবে। মনে রাখবে, তোমাকে ঐগুলো দেখে আমার কাছে এসে পুরোপুরি বর্ণনা করতে হবে। পরের দিন মধ্য-বয়স্কজনের বাড়ীতে গিয়ে এভাবে তিনি কি বলেন এবং কিরূপ ব্যবহার করেন তার একটা পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে।' ভৃত্যটি বলল, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

পরের দিন ভৃত্যটি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধ রক্ষীপ্রধানের বাড়ীতে গিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ কেটে গেল। তখন একটা ভৃত্য এসে বেঞ্চের উপর একটা মোমবাতি রাখল এবং জায়নামায বিছিয়ে তার উপরে কয়েকখানা কোরআন শরীফ ও অন্যান্য পুস্তক রাখল। বৃদ্ধ লোকটি এসে কয়েক রাকাত নামায আদায় করলেন। কিছুক্ষণ পরে কিছু লোক এল এবং তারপর ইমাম এলে জামাতে নামায পড়া হল। বৃদ্ধ লোকটি কোরআন শরীফ নিয়ে কিছু অংশ পড়লেন এবং পরে মোনাজাত করলেন। নামায শেষে বৃদ্ধ লোকটি তসবিহ ঘুরিয়ে জপতে লাগলেন, 'সব মহিমাই আল্লাহ্‌র' এবং 'আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ নাই।' সূর্য উঠা অবধি লোক আসতে লাগল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন আসামী পাওয়া গেছে কি?' লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ একজন আসামী আছে যে একটা লোককে মেরে ফেলেছে।' তিনি তখন বললেন, 'তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী আছে কি?' তারা জবাব দিল, 'না, সে নিজেই তার দোষ স্বীকার করেছে।' বৃদ্ধ বললেন, 'আল্লাহ্‌ই সর্বশক্তিমান। আসামীকে নিয়ে এস। আমি তাকে দেখতে চাই।' আসামী যুবকটিকে ভিতরে আনা হল।

বৃদ্ধ লোকটির দৃষ্টি যুবকটির উপর পড়লে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ লোকটিই কি আসামী?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, এ লোকটিই আসামী।'

তিনি তখন বললেন, 'আসামীর কোন প্রতিমূর্তি এ লোকটির মধ্যে নাই, বরং তার মধ্যে মানবতার ছাপ এবং ইসলামের জ্যোতি বিদ্যমান। তার মত লোকের পক্ষে এ জাতীয় অন্যায় করা অসাধারণ বলে মনে হয়। আমার মনে হয়, লোকে মিথ্যা বলছে। তার বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও শুনতে চাই না। এ যুবক এ জাতীয় অন্যায় কখনও করতে পারে না। চেয়ে দেখ, তার চেহারাই নির্দোষিতার পরিচয় দেয়।' তিনি এমনভাবে কথাগুলো বললেন যাতে যুবকটি শুনতে পারে। তখন একজন লোক বলে উঠল, 'হুজুর সে নিজেই তার অন্যায় স্বীকার করছে।' তিনি লোকটার প্রতি চীৎকার করে বললেন, 'চুপ করে থাক। তোমাকে কথা বলতে কে বলেছে? তোমার কি আল্লাহ্র ভয় নাই। তোমরা কি যথেচ্ছাপূর্বক-ভাবে একজন মুসলিমকে মেরে ফেলতে চাও? এ যুবকটির এতটুকু জ্ঞান আছে যে সে ইচ্ছা করে এমন কিছু করবে না বা বলবে না যাতে তার জীবন নাশ হতে পারে।' তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে চেষ্টা করে যুবকটিকে দিয়ে তার নিজের বক্তব্যকে অস্বীকার করানো। তিনি তখন যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কি বক্তব্য আছে?' যুবকটি বলল, 'আল্লাহ্ই লিখে দিয়েছেন যে এ জাতীয় একটা অন্যায় কার্য আমার দ্বারা সম্পন্ন হবে। এর পরেও আরেকটা দুনিয়া আছে। পরকালের শাস্তি এড়ানোর সাধ্য আমার নাই। তাই আল্লাহ্র নির্দেশিত যে বিচার হয় তাই করুন।' রক্ষীপ্রধান না শোনার ভান করে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে কি বলছে তা আমি শুনতে পাচ্ছি না। সে কি তার অন্যায় স্বীকার করছে না কি?' লোকগুলো বলল, 'হ্যাঁ, সে স্বীকার করছে।' তিনি বললেন, 'বৎস, তোমার ত অপরাধীর চেহারা নয়। সম্ভবতঃ তুমি তোমার কোন শত্রুর প্ররোচনায় এ কথা বলছ, যে তোমার অনিষ্ট করতে চায়। ভালভাবে বিবেচনা করে দেখ।' সে বলল, 'হে আমির, আমি কারো প্ররোচনায় পড়ে এ কাজ করি নাই। আমি একজন পাপী। আমার প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশিত বিচার করুন।'

রক্ষীপ্রধান যখন বুঝতে পারলেন যে, যুবকটি তার উক্তি অস্বীকার করবে না, সে মৃত্যুকে অনিবার্য ধরে নিয়েছে এবং তাঁর উপদেশে কোন কাজই হচ্ছে না তখন তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকবে।' সে বলল, 'তাই ভাল।' তখন তিনি বললেন, 'তোমার প্রতি আল্লাহ্র বিচারই কি আমাকে করতে হবে?' যুবকটি বলল, 'হ্যাঁ, তাই করুন।' তখন বৃদ্ধ সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি কখনও এরূপ

আল্লাহ্-ভীরু এবং পরিণামদর্শী যুবক আর দেখেছ? আমি কিন্তু কখনও এরূপ দেখি নাই। তার থেকে ইসলাম ও আভিজাত্যের জ্যোতি বের হচ্ছে। তার মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সে আল্লাহ র ভয়ে এ স্বীকারোক্তি করছে। সে আল্লাহ্ র কাছে একজন সাধু ও হত্যাকারী হিসাবে উপস্থিত হতেই বেশী পছন্দ করে। বেহেশ্ত তার থেকে বেশী দূরে নয়।' যুবকটিকে তিনি বলতে লাগলেন, 'যাও ওযূ করে দুই রাকাত নামাজ পড়, আল্লাহ্ র কাছে তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে মাফ চেয়ে নাও। তারপর আমার কাছে এলে আমি তোমার প্রতি আল্লাহ্ র নির্দেশিত বিচার করব।' যুবকটি গিয়ে গোসল করে ফিরে এসে নামাজ পড়ার জন্য জায়নামায চাইল। সে দুই রাকাত নামাজ পড়ল এবং তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। তারপর সে আবার বৃদ্ধ লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে এখনই এ যুবক হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দীদার লাভ করে বেহেশ্তে চলে যাবে।' এ কথা বলতে যুবকটির কাছে মৃত্যু এত প্রিয় হয়ে উঠল যে তাকে অতি শীঘ্র বধ করবার জন্য সকলকে অস্থির করে তুলল। তখন বৃদ্ধ তার গা থেকে সদয় ও শান্তভাবে কাপড় খুলে ফেলতে এবং চক্ষু বন্ধ করতে হুকুম করলেন। ঘাতক শান্তভাবে এসে চুপ করে তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল যাতে সে তার উপস্থিতি বুঝতে না পারে। রক্ষীপ্রধান হঠাৎ ইশারা দিলেন সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক নিপুণভাবে এক আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করে দিল। তারপর আমির কতিপয় ধৃত ব্যক্তিকে বিচার না হওয়া পর্যন্ত জেলে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজেও তখন উঠে তাঁর কামরায় চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকেরাও চলে গেল। ভৃত্যটি এসে যা দেখেছে সব খুলে বলল।

পরের দিন ভৃত্যটি সকালে উঠে অন্য রক্ষীপ্রধানের বাড়ীতে গেল। সে অপেক্ষায় থাকল। পুলিস ও জনসাধারণ এক এক করে আসতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না আদালত-কক্ষ ভরে গেল। সূর্য উঠার সাথে সাথে রক্ষীপ্রধান তাঁর কামরা থেকে এসে আদালতে বসলেন। তাঁর ভুরু ছিল কোচকান আর মদের নেশায় চক্ষু ছিল পূর্ণ। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন সারারাত ধরে ফেরেশতাদের মেরেছেন। পুলিসরা তাঁর সামনে দাঁড়ান ছিল। যদি কেউ তাঁকে আস্সালামু-আলাইকুম বলত তাহলে তিনি তার জবাব দিতেন না আর দিলেও খুব রুক্ষভাবে দিতেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অপরাধী কেউ আছে কিনা। তারা বলল, 'কাল রাত্রে একজন যুবককে ধরা হয়েছে। সে এত

মদাসক্ত ছিল যে তার কোন জ্ঞান ছিল না।' তিনি তখন বললেন, 'তাকে ভিতরে নিয়ে আস।' যুবকটিকে আমিরের সামনে আনলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ সেই যুবক কিনা?' তারা জবাব দিল, 'হাঁ, এ সেই যুবক।' আমির তখন বললেন, 'অনেকদিন ধরে আমি তাকে খুঁজছি। সারা বাগদাদে তার মত দুশ্চরিত্র, দুরভিসন্ধিকারী ঝগড়াটে, অধার্মীক এবং রাজদ্রোহী পাজি আর নাই। বেত্রাঘাতে তাকে দমন করা যাবে না, তরবারি দিয়ে তাকে দমন করতে হবে। সে জন-সাধারণকে কুপথে পরিচালিত করে এবং প্রত্যেকদিন কমপক্ষে দশজন তার বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে আসে। তাই বেশ কিছুদিন ধরে আমি তাকে খুঁজছি।' যেহেতু তিনি এ সব বলেছেন যুবকটি তার গালাগালির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিরশ্ছেদ হতেও প্রস্তুত ছিল। আমির তখন কয়েকখানা চাবুক আনতে হুকুম দিয়ে বললেন, 'তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করবে যাতে সে নিজের দাঁত দিয়ে মাটি কামড়াতে শুরু করে।' চল্লিশটি বেত্রাঘাতের পর তারা যখন তাকে জেলে নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় পঞ্চাশ জনেরও বেশী সম্ভ্রান্ত পরিবার-প্রধান এসে যুবকটির সততা, সরলতা, উদারতা, আতিথেয়তা, নৈতিকতা এবং কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁরা যুবকটিকে মুক্তি দেওয়া ছাড়াও তাকে ক্ষতিপূরণ দেবার কথাও প্রস্তাব করলেন। আমির এ সমস্ত বৃদ্ধ ও সম্মানী লোকদের কথায় কর্ণপাত না করে যুবকটিকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। বৃদ্ধরা সকলেই অপমানিত হয়ে চলে গেলেন এবং সকলেই আমিরকে অভিশাপ করলেন। আমির তাঁর আসন ছেড়ে ভিতরে চলে গেলেন। ভৃত্যটি ফিরে এসে সব ঘটনা খুলে বলল।

তৃতীয় দিন বন্ধুটি আল-মামুনের নিকট গিয়ে এই দুই রক্ষী-প্রধানদের ব্যবহার ও চরিত্র সম্পর্কে সব খুলে বললেন—যেমনিভাবে ভৃত্যটি তাঁকে বলেছে। খলীফা শুনে অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ যেন বৃদ্ধ রক্ষী-প্রধানকে ক্ষমা করে দেন আর যে নরাধম মদাসক্ত হওয়ার জন্য একজন যুবকের প্রতি এত নির্মম ব্যবহার করেছে তার প্রতি যেন অভিশাপ বর্ষিত হয়। তাকে যদি একজন খুনীর বিচার করতে হোত তাহলে সে কিই-না করত?' তখন তিনি হুকুম দিলেন, এ ব্যক্তিকে তার রক্ষী-প্রধানের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হোক, যুবকটিকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং বৃদ্ধ রক্ষীপ্রধানকে তাঁর পদে নিশ্চিত করে তাঁকে নতুনভাবে সম্মানে ভূষিত করা হোক।

চল্লিশ অধ্যায়

আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন এবং রাজ্যের সব ব্যাপার ও রীতি-নীতিতে শৃঙ্খলা আনয়ন প্রসঙ্গে

যে-কোন সময়ে রাজ্য কোন দৈব দুর্ঘটনা অথবা কোন চক্রান্তের কবলে পড়ে যেতে পারে। তখন সরকারের পরিবর্তন হবে অথবা রাজদ্রোহ এবং গোলমালের ফলে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে ; বিভিন্ন দলের মধ্যে গণ্ডগোলের ফলে বহু লোক হতাহত হবে, জিনিসপত্র নষ্ট হবে এবং দেখা দেবে দুর্যোগের ঘনঘটা। এ সময় উচ্চ বংশীয় লোকদের আধিপত্য কমে যাবে, দুষ্কৃতিকারীরা মাথচাড়া দিয়ে উঠবে এবং গায়ের জোরে যা ইচ্ছা তাই করবে। সৎ লোকদের কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকবে না ; তুচ্ছ লোক হবে আমির (বা সেনাপতি) আর হীনতম ব্যক্তিরাই হবে বেসামরিক শাসনকর্তা। সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানীদের কোন ক্ষমতা থাকবে না এবং যে-কোন জঘন্য ধরনের ব্যক্তি রাজা ও উজিরদের উপাধি গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করবে না। নিজের স্বস্তির জন্য সে হয়ত নিজেই দশটি উপাধি গ্রহণ করবে; তার যোগ্যতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করবে না। তুর্কীরা বেসামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উপাধি গ্রহণ করবে এবং বেসামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা গ্রহণ করবেন তুর্কীদের উপাধি আর তুর্কীরা ও পারস্যবাসীরা একইভাবে নিজেদেরকে জ্ঞানী লোকদের উপাধিতে ভূষিত করবে এবং রাজার হয়ে আইন জারি করবে। ধর্মীয় অনুশাসনের অবমাননা করা হবে, কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এবং সৈনিকরা হয়ে উঠবে অত্যাচারী। বিবেচনাবোধ ও সৌজন্যবোধের কোন স্থান থাকবে না এবং কারো পক্ষে কোন কিছুর প্রতিকার করা সম্ভব হবে না। কোন তুর্কী যদি শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দশ জন পারসিক রাখে, সেটা অন্যায় হবে না এবং যদি কোন পারস্যবাসী দশ জন তুর্কীবাসীর শাসক হয় তাহলেও কোন আপত্তি থাকবে না। দেশের কোন ব্যাপারেই পূর্ণ শৃঙ্খলা এবং ব্যবস্থাপনা থাকবে না এবং রাজা বিভিন্ন অভিযানে, যুদ্ধে এবং দুশ্চিন্তায় এত ব্যাপৃত থাকবেন যে এ সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার, এমন কি, মনোযোগ দেবারও সময় থাকবে না।

পরে যখন আবার স্বর্গীয় আশীর্বাদে দুর্যোগের ঘনঘটা শেষ হয়ে যাবার পর নেমে আসবে শান্তি ও স্বস্তির দিন, তখন আল্লাহ্‌র মহিমায় একজন

ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানী রাজার আবির্ভাব হবে—যাকে আল্লাহ্ শত্রুদের ধ্বংস করার ক্ষমতা দিবেন। আর ভালমন্দ বিবেচনার জন্য দিবেন বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি। রাজা লোকদের থেকে অনুসন্ধান করে এবং বিভিন্ন বই পড়ে পূর্বেকার রাজাদের রীতিনীতি জেনে নিবেন যাতে তিনি সরকারের সঠিক নিয়ম-কানুন ও শাসনধারা পুনরুদ্ধার করতে পারেন। তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা ও পদমর্যাদার মূল্য দিবেন এবং যোগ্যতর ব্যক্তিদের যোগ্য স্থানে বহাল করবেন এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের বরখাস্ত করে যার যার যোগ্য স্থানে তাকে বসাবেন। তিনি ঐ সমস্ত অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের তাড়িয়ে দিবেন যারা তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে না। তিনি হবেন ধর্মের বন্ধু আর অত্যাচারের দুশমন। তিনি বিশ্বাসীদেরকে অন্তঃসারশূন্যতা ও প্রচলিত ধর্মমতবিরোধিতা দমন করতে সহায়তা করবেন।

এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত বর্ণনা করলে অনেক কিছু আরো স্পষ্ট হবে এবং এলোমেলো বিষয়গুলোর জন্য একটা পথ-প্রদর্শক হবে, যাতে সুলতান এ সমস্ত নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে হুকুম জারি করতে পারেন। সব যুগেই রাজারা পুরোন বংশের সংরক্ষণ করতেন এবং রাজার ছেলেদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন—তাদেরকে অবজ্ঞাও করতেন না বা তাদেরকে উপযুক্ত স্থান ও ক্ষমতা দিতেও কুন্ঠিত হতেন না। এবং তাদেরকে জীবিকার জন্যে রাজ্যের কিছু অংশ দিয়ে দিতেন যাতে তাদের বংশগুলো দিন দিন উন্নতি করতে পারে। অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে যেমন জ্ঞানী, হজরত আলীর(রাঃ) বংশধররা, ইসলামের পার্শ্ববর্তী এলাকার মুরুব্বিগণ এবং কুরআনের ভাষ্যকারদেরও ধনাগার থেকে সাহায্য করা হোত। এভাবে কাউকেই তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হোত না ; ফলে লোকে তাদের আশীর্বাদ ও প্রশংসা করত এবং ইহকাল পরকাল দু'কালেই তারা পুরস্কৃত হোত।

হারুন অর-রশীদের গল্প

কথিত আছে যে, একদল দঃস্থ ব্যক্তি একবার হারুন অর-রশীদের কাছে এই বলে একখানা দরখাস্ত দেয়, 'আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা এবং নবীর পরিবারের অন্তর্গত। আমাদের মধ্যে কিছু জ্ঞানী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ, কিছু কুলীন বংশীয় আর কিছু সৎ কর্মের জন্য সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র। তাছাড়া আমরাও আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করেছি। আমরা সকলে বিশ্বাসী মুসলমান। আমাদের অংশ আপনার অধীনস্থ ধনাগারে আছে।

কারণ আপনিই সারা জাহানের শাসনকর্তা ও খলীফা। ঐ অর্থ যদি বিশ্বাসীদের নিমিত্ত হয় তাহলে আমাদের জন্য ওটা খরচ করুন। কারণ ওটাতে আমাদের অধিকার আছে। গোটাটার এক-দশমাংশের বেশী আপনার নয় কারণ পদমর্যাদার বলেই আপনার অধিকার। প্রত্যহ আপনি আপনার বেতন, খাবার এবং বিলাসিতায় এত এত হাজার দিনার ব্যয় করেন আর আমরা একটা রুটিও খেতে পাই না (এর বৈশিষ্ট্য হোল যে তারা মনে করত তিনি বুঝি ধনাগারের সব সম্পত্তিকে নিজের বলে মনে করেন)। আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য না দিলে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব এবং তাঁকে অনুরোধ করব তিনি যেন আপনার থেকে ধনাগার নিয়ে অন্য কারো হাতে দেন প্রজাদের প্রতি যাঁর দরদ আছে এবং যিনি লোকদের জন্যই টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ রাখেন, টাকা-পয়সার জন্য লোকদের নয়।'

দরখাস্তখানা পড়ে হারুন অর-রশীদ চিন্তিত হলেন এবং সেদিন তার উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি অস্বস্তির সঙ্গে দরবার-কক্ষ থেকে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদে চলে এলেন। মহিষী যোবাইদা তাঁকে দেখে লক্ষ্য করে বললেন, 'খলীফা, আপনার কি হয়েছে?' তিনি তাঁকে দরখাস্তখানার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'তারা যদি আমাকে আল্লাহ্‌র নামে ভয় না দেখাত তাহলে আমি তাদের শাস্তি দিতাম।' যোবাইদা বললেন, 'তাদেরকে আঘাত না দিয়ে আপনি ভালই করেছেন। যেহেতু আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের থেকে খেলাফত পেয়েছেন, তাই তাঁরা আপনাকে তাঁদের নীতি, তাঁদের গুণাগুণ এবং ঐতিহ্য উইল করে দিয়ে গেছেন। চিন্তা করে দেখুন, আপনার পূর্ববর্তী খলীফারা লোকের মঙ্গলের জন্য কি করে গেছেন। তাদের মত করুন, কারণ পদমর্যাদা এবং সার্বভৌমত্ব উদারতা ও বদান্যতার দ্বারা উন্নীত হয়। এটা নিশ্চিত যে, ধনাগারের সব সম্পদই মুসলমানদের তবে আপনি তার বেশীর ভাগই নিজের জন্য খরচ করেন। তাদের আপনার প্রতি যে অধিকার আছে, আপনার তাদের সম্পত্তির উপর তার চেয়ে বেশী অধিকার থাকা উচিত না। তারা যদি আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করে, তাহলে ঠিকই করবে।'

সে রাত্রে তাঁরা দু'জনেই স্বপ্ন দেখলেন যে কেয়ামত হয়েছে, সকলে যার যার হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং তারপর এক এক করে সকলকে সামনে আনা হয়েছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেছেন এবং তারা বেহেশ্‌তের দিকে চলে যাচ্ছে। একজন ফেরেশতা তাঁদের

অর-রশীদ ও যোবাইদাকে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে বলল যে হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাকে বলে পাঠিয়েছেন, 'আমি যতক্ষণ উপস্থিত আছি তাদেরকে আমার সামনে আসতে দিও না, অথবা আমি তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে লজ্জিত হব এবং বলতেও পারব না। কারণ তারা মুসলমানদের সম্পত্তিকে নিজেদের সম্পত্তি বলে গণ্য করত, তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত এবং সেটা আমার প্রতিনিধি থাকাকালেই।' তাঁদের দু'জনেরই সাময়িক উন্মত্ততার ন্যায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। হারুন অর-রশীদ যোবাইদাকে বললেন, 'তোমার কি হয়েছে?' যোবাইদা হারুন অর-রশীদকে তাঁর স্বপ্নের কথা খুলে বললেন এবং জানালেন যে তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন। হারুন অর-রশীদ বললেন, 'আমিও ঠিক একই স্বপ্ন দেখেছি।' তখন তাঁরা আল্লাহ্র কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন যে এটা সত্যিকারভাবে কেয়ামত ছিল না, তাঁরা সবই স্বপ্ন দেখেছেন মাত্র।

পরের দিন তাঁরা সমস্ত ধনাগারের দ্বার খুলে দিয়ে এই বলে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিলেন, 'সকল স্বত্ববান লোকদের দরবারে হাজির হতে বলা হচ্ছে যাতে ধনাগার থেকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেওয়া যায় এবং তাদের অভাব-অভিযোগ মেটানো যায়।' এ বিজ্ঞপ্তির পর বহু লোক এসে হারুন অর-রশীদের দরবারে ভিড় করল এবং তিনি তাদেরকে আনুতোষিক ও অবসরবৃত্তি দিয়ে বিদায় করলেন আর মোট দানের পরিমাণ দাঁড়াল ৩০ লক্ষ দিনারে। যোবাইদা তখন হারুন অর-রশীদকে বললেন, 'ধনাগার আপনার অধীন এর জন্য কেয়ামতের দিন আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে, আমাকে নয়। আপনার সাম্প্রতিক অনুগ্রহের দ্বারা আপনি আপনার দায়িত্ব কিছুটা পালন করেছেন; আপনি যা দিয়েছেন সবই মুসলমানদের গচ্ছিত টাকা; আপনি শুধু তাদের ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন। আর আমি যা করতে যাচ্ছি সবই নিজস্ব খরচে এবং কেয়ামতের দিন মুক্তি লাভের আশায়। আমি জানি না, কখন আমি এই সমস্ত ধনসম্পদ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। তাই আগে থেকেই পরকালের জন্য কিছু পাথেয় হিসাবে সঞ্চয় করা ভাল।'

যোবাইদা তাঁর ধনাগার থেকে মুক্তা, রৌপ্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ মিলে কয়েক লক্ষ দিনার তুলে নিয়ে বললেন, 'এ সমস্ত সম্পদ এমন দাতব্য কাজে ব্যয় হবে যার ফল কেয়ামতের দিন পর্যন্ত থাকবে এবং যার ফলে সততই আমার নাম স্মরণ করা হবে।' এ বলে তিনি হুকম

দিলেন যে, কুফার দ্বার থেকে মক্কা এবং মদীনা অবধি প্রতি স্থানেই কূপ খনন করতে হবে। কূপগুলোর মুখ প্রশস্ত হতে হবে এবং সর্বত্র পাথর, ইট ও চূনাবালি দিয়ে সুন্দর করে তৈরী করতে হবে। প্রত্যেকটির সঙ্গে জলাশয় এবং চৌবাচ্চা সংলগ্ন করতে হবে যাতে হজ্বযাত্রীদের কোন কষ্ট না হয়। কারণ প্রত্যেক বছর বেশ কিছু সংখ্যক পুণ্যার্থী মরুভূমিতে পানির তৃষ্ণায় মারা যায়। এতসব কূপ, জলাশয় ও চৌবাচ্চা নির্মাণ করার পরেও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। তখন তিনি রাস্তার প্রান্তে প্রান্তে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করতে, ধর্মযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া কিনতে এবং প্রচুর পরিমাণে জমিজমা ও কৃষিক্ষেত্র কিনে সারা বছর যে-কোন দুর্গে এক হাজার বা দুই হাজার যোদ্ধার খাবার মওজুদ রাখতে হুকুম দিলেন।

এর পরেও আরো টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। তাই তাঁরা কাসগার, বুলুর ও সুকনান শহরের প্রান্তে শক্ত প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করে বাদাখশান নামে একটি শহর গড়ে তুললেন, যে শহর এখনও বিদ্যমান আছে এবং উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রাশ্‌ত্‌-এর বিপরীত দিকে তারা অন্য একটি দুর্গ তৈরী করলেন এবং খুটলানের প্রান্তে উইশগার্দ নামে একটি দুর্গ তৈরী করলেন— যেটা এখনও বিদ্যমান এবং উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে; এর অস্ত্রাগার ও জন্তুর পাল এখনও বিদ্যমান। এইভাবে কয়েকটি সীমান্ত সৈন্যনিবাস এবং সুরক্ষিত শহর নির্মাণ করা হয়। তাদের মধ্যে একটি ইজবিজানে এখনও বিদ্যমান এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, খারাজামেতে ফারায়া নামে একটি দুর্গ আছে এবং দারবান্দে ও আলেকজান্দ্রিয়াতেও একটি করে দুর্গ আছে। সর্বসমেত তাঁরা দশটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি এক একটি শহরের ন্যায়। কিন্তু তবুও টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। তাই সেগুলো মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেমবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হল।

উমর ও অসহায় রমণীর কাহিনী

জায়েদ ইবনে আসলাম নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন: এক রাত্রে খলিফা উমর ইবনে আল খাত্তাব (রাঃ) মদীনাতে নিজেই ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা দেখছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমরা শহর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দেখি যে মাঠের মধ্যে একটা ধ্বংসাবশেষ দালান থেকে একটা বাতির আলো জ্বল জ্বল করছে। খলিফা আমাকে বললেন, 'জায়েদ,

বল আমরা ওখানে গিয়ে দেখি কে মধ্যরাত্রে আলো জ্বালাচেছ।' আমরা সেখানে পৌছতেই একজন রমণীকে দেখলাম : তার পার্শ্বেই মাটিতে ঘুমিয়ে আছে তার দুটো শিশু আর আগুনের উপর একটি হাঁড়ি বসান। রমণী বলছে, 'হে খোদা, আমায় দয়া করে যেন হযরত উমরের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাই। তিনি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছেন কিন্তু আমরা এখনও ক্ষুধার্ত।' হজরত উমর শুনে আমাকে বললেন, 'হে জায়েদ, এই রমণী সকলের সামনে আল্লাহ্‌র কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তার কি হয়েছে।' তিনি রমণীর কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি মধ্যরাত্রে মাঠের মধ্যে বসে কি রান্না করছো?' সে বলল, 'আমি এক অসহায় রমণী; আমার মদীনাতে একটা বাড়ী ও কিছু সম্পত্তি আছে কিন্তু আমার কাছে এক পয়সাও নাই। আমার বলতে এত লজ্জা হয় যে, আমার এই শিশু দুটো ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছে কিন্তু তাদেরকে দেবার মত আমার কিছুই নাই। আমি এখানে মাঠের মধ্যে চলে এসেছি যাতে প্রতিবেশীরা জানতে না পারে তারা কেন কাঁদছে। যখনই তারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেঁদে উঠে আমার কাছে খাবার চায় তখনই আমি আগুনে চল্লী বসিয়ে তাদেরকে বলি, "তোমরা ঘুমিয়ে পড়, ঘুম থেকে উঠতে উঠতে খাবার পাক হয়ে যাবে।" এই বলে তাদেরকে আমি ঘুমিয়ে রেখেছি। তারা মনে করে যে, আমি কিছু পাক করছি আর সেই আশায় তারা ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে যখন দেখে কিছুই তৈরী হয়নি, তারা আবার আর্তনাদ শুরু করে। ঐ একই অজুহাতে তাদের এখন আমি ঘুমিয়ে রেখেছি। দুইদিন ধরে পানি ছাড়া তাদের আমি কিছুই দিতে পারছি না আর আমার দেবার মত কিছু নাইও। এই হাঁড়ির মধ্যেও পানি ছাড়া কিছুই নাই।' হযরত উমর রমণীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'তুমি ন্যায়ভাবেই উমরকে অভিশাপ দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছ।' রমণীটি হযরত উমরকে (রাঃ) চিনতে পারেনি। তিনি রমণীকে আবার বললেন, 'আমি ফিরে না আসা অবধি তুমি এখানে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে থাক।'

হযরত উমর (রাঃ) তখন আমায় এসে বললেন, 'তাড়াতাড়ি চল, আমরা বাড়ীতে ফিরে যাব।' তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে তিনি ভিতরে ঢুকলেন আর আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি দু'টি চামড়ার থলি ঘাড়ে করে বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'চল আমরা ঐ রমণীর কাছে আবার যাই।' আমি বললাম, 'হে

খলীফা, আমার কাছে থলি দুটো দিন, আমি নিয়ে যাই।' হযরত উমর উত্তর দিলেন, 'হে জায়েদ, তুমি এই বোঝা বহন করলে কেয়ামতের দিন আমার পাপের বোঝা কে বহন করবে?' এবং তিনি সারা পথ হেঁটে রমণীর সামনে গিয়ে থলি দুটো রাখলেন—একটার মধ্যে ছিল ময়দা আর অন্যটির মধ্যে ছিল চাউল, তৈল আর ডাল। তিনি আমাকে বললেন, 'জায়েদ মাঠের মধ্যে গিয়ে খড়কুটা যা পাওয়া যায় নিয়ে তাড়াতাড়ি এস।' আমি জ্বালানি কাঠের সন্ধানে বের হলাম। তখন হযরত উমর কলসী নিয়ে কিছু পানি এনে চাউল ও ডাল ধুয়ে চুল্লীর উপর তুলে দিলেন এবং কিছু চর্বি ঢেলে দিলেন। এদিকে রমণী রুটির মত গোলাকার পিঠা তৈরী করছে। আনন্দে তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমি জ্বালানী কাঠ নিয়ে এলাম। হযরত উমর নিজ হাতে চুল্লী ধরিয়ে দিয়ে তার উপর খাবার চড়িয়ে দিলেন।

খাবার প্রস্তুত হলে রমণী তার বাচচাদের ঘুম থেকে তুলল এবং হযরত উমর তাদের সামনে খাবার রাখলেন। তারপর কিছু দূরে গিয়ে জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাকিয়ে দেখলেন বাচচারা প্রাণভরে খেয়ে তাদের মায়ের সঙ্গে খেলা করছে। তিনি রমণীকে বাচচাদের সহ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'হে রমণী, উমরের প্রতি সদয় হও; তাকে আর অভিশাপ দিও না। তাকে মাফ করে দাও, কারণ সে জানত না যে তুমি অসহায় অবস্থায় আছ।' ক্রন্দনরত রমণী বলল, 'আমি অনরোধ করছি, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলুন আপনি হজরত উমর কিনা।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি উমর।' নিঃস্ব অসহায় রমণী বলল, 'আল্লাহ্ যেন আপনাকে ক্ষমা করেন, আপনি আমাদেরকে খাদ্যাভাবে মত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।'

মূসা ও হারানো ভেড়ার গল্প

কথিত আছে যে, মূসা মেষপালক থাকা অবস্থায় এবং নবুয়তী লাভের পূর্বে একদা তাঁর ভেড়াকে খাওয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা ভেড়ী দল থেকে আলাদা হয়ে পড়ল। মূসা তাকে দলভুক্ত করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু ভেড়ী ভেড়াকে দেখতে না পেয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দৌড়াতে লাগল এবং তিনি তার পিছু পিছু দুই ফারসাং ধাওয়া করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ভেড়ী পরিশ্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আর উঠতে পারল না। তার দিকে

তাকিয়ে মূসার দয়া হল। তিনি বললেন, 'হে দুর্ভাগা, তুমি পালাচ্ছ কেন? তুমি কার ভয়ে পালাচ্ছ?' তিনি তখন তাকে তুলে ঘাড়ে করে দলের কাছে নিয়ে এলেন। ভেড়ী তার দলকে দেখে খুব আনন্দিত হোল। মূসা তাকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন, সে তার দলে মিশে গেল। আল্লাহ্ ফেরেশতাকে ডেকে বলল, 'দেখলে, কিভাবে স্নেহশীলতার সঙ্গে আমার প্রতিনিধি ভেড়ীটার সঙ্গে ব্যবহার করল। ভেড়ীকে শাস্তি দেবার জন্য সে কষ্ট করেনি বরং তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েই তার পিছু গিয়েছিল। আমি ঘোষণা করছি যে, তাকে আমি আরো বড় করে আমার বার্তাবহ নিযুক্ত করব। আমি তাকে নবুয়তী দিয়ে তাকে একখানা কেতাব পাঠাব এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন লোকে তার নাম স্মরণ করবে।' আল্লাহ্ তাঁকে এই সবগুলোই দান করেছিলেন।

মেয়র হাজী ও চর্মরোগগ্রস্ত কুকুরের গল্প

মার্ভ নগরীতে এক ব্যক্তি বাস করতেন; তিনি মেয়র হাজী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নামকরা ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল। এক কথায় তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে ধনী আর কেউ ছিল না। তিনি সুলতান মাহ্মুদ ও সুলতান মাসুদের অধীনেও কাজ করেছেন। জীবনের শুরুতে যৌবনকালে তিনি খুবই নির্দয় ছিলেন, অত্যাচার চালিয়ে তিনি বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন আর তাঁর মত নির্দয় দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। পরবর্তী জীবনে তিনি সৎ পথের সন্ধান পেয়ে অত্যাচার-অবিচার ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ করতে শুরু করেন—যেমন, লোককে সান্ত্বনা দেওয়া, দরিদ্রের সাহায্য করা, পুল ও সরাইখানা তৈরী করা। তিনি তার বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এতিম ও বিধবাদের কাপড়-চোপড়ে সাহায্য করতেন, হাজীদের ও যোদ্ধাদের টাকা-পয়সা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করতেন, নিশাপুরের মসজিদ তৈরী করেছিলেন এবং এতসব দানশীল কর্তব্য করার পর চুগরী (রাঃ)-এর সময়ে তিনি হজ্ব করতে যান। বাগদাদে পৌঁছে তিনি সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। একদিন তিনি বাজারে যাবার জন্য বাড়ী থেকে রওনা হন। পথে তিনি একটি চর্মরোগ-গ্রস্ত কুকুর দেখতে পান। কুকুরটির লোম পড়ে গেছে, ফলে তার চেহারা কদাকার হয়েছে। তিনি দেখে খুব ব্যথিত হয়ে বললেন, 'এটাও আল্লাহ্র

জীব।' তিনি তখন তাঁর একজন ভৃত্যকে দুই সের রুটি ও একটা দড়ি আনতে হুকুম দিলেন। ভৃত্যটি যতক্ষণ না ফিরে এল ততক্ষণ তিনি সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি নিজ হাতে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুকুরটিকে দিতে লাগলেন যতক্ষণ পর্যন্ত কুকুরটি প্রচুর পরিমাণে খেল। তখন কুকুরটির গলায় দড়ি লাগিয়ে ভৃত্যের হাতে দিয়ে কুকুটিতে বাড়ীতে নিয়ে যেতে বললেন। তিনি নিজেও বাজার থেকে ফিরে এলেন।

বাড়ীতে পৌঁছে তিনি তিন সের চর্বি কিনে গলাতে হুকুম দিলেন। মেয়র হাজী একটা লাঠি নিয়ে তার মুখের দিকটা একটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। তিনি কুকুরটার নিকটে গিয়ে নিজ হাতে ন্যাকড়াটা চর্বির মধ্যে চুবিয়ে কুকুরটার গায়ে ঘসতে লাগলেন যে পর্যন্ত না কুকুরটির শরীরের সব জায়গায় চর্বি মাখানো হোল। তখন তিনি তাঁর ভৃত্যকে বললেন, 'আমার চেয়ে তুমি বেশী সম্মানী নও। আমি যা করলাম তাতে আমি কোন অপমান বোধ করলাম না। সুতরাং ভৃত্য হয়ে তোমাকে প্রত্যেক দিন এই কাজ করতে হবে; লজ্জার কিছুই নেই। দেওয়ালে একটা পেরেক গেড়ে কুকুরটিকে তার সঙ্গে বেঁধে রাখ। আর প্রত্যেক দিন সকালে-বিকেলে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রুটি খেতে দিবে। অবশ্য টেবিল থেকে খাবারের অবশিষ্টাংশও তাকে খেতে দিতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত সে আরো সুন্দর না হয় ততদিন পর্যন্ত দিনে দু'বার করে চর্বির লেপও তাকে দিতে হবে।' নির্দেশ অনুসারে ভৃত্যটি কাজ করতে লাগল; ফলে দু'সপ্তাহের মধ্যেই কুকুরটি ভাল হয়ে গেল, তার লোম গজাল এবং মোটা হল। কুকুরটি পরে ঐ বাড়ীর প্রতি এত ভক্ত হয়ে পড়ল যে তাকে পাঁচশত বারও যদি মারা হোত এবং বেত্রাঘাত করা হোত তাহলেও সে চলে যেত না। মেয়র হাজী মরুযাত্রী দলের সঙ্গে ভ্রমণ করে হজ্ব করলেন এবং এই ভ্রমণে তাঁর অনেক টাকা খরচ হোল। তিনি সুস্থভাবেই মার্ভ শহরে ফিরে এলেন এবং এক বছর পরে মারা যান। কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল।

এক রাত্রে এক কঠোর সংযমী দরবেশ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি দেখলেন মেয়র, হাজী বোরাকে (যে ঘোড়ায় চড়ে হযরত মুহম্মদ (সঃ) বেহেশতে গিয়েছিলেন) চড়ে আছেন আর ছেলে-মেয়েরা দুই দিক থেকে তাঁর হাত ধরে পিছনে ও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বেহেশতের একটা বাগানের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাবার সময় তিনি হাসছিলেন। দরবেশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করলেন, তিনি লাগাম টেনে

সালামের উত্তর দিলেন। দরবেশ তাঁকে বললেন, 'জনাব, একদা আপনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ক, নির্দয় ও অত্যাচারী আর আপনি জ্ঞানের আলো লাভ করবার পর শুধু অত্যাচার করা পরিত্যাগই করেন নি; অন্য সকলের চেয়ে বেশী সৎ কাজ ও বদান্যতাও করেছেন। আপনি হজ্ব করেছিলেন, পুল ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন এবং স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাকে বলুন, আপনার কোন কোন সৎ কাজের জন্য আপনি বর্তমান মর্যাদা লাভ করেছেন?' তিনি বললেন, 'হে দরবেশ, আমিত আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতেই মুগ্ধ হয়ে গেছি; আপনারও এই একই পথ ধরা উচিত—শুধুমাত্র আল্লাহ্ ভক্তি এবং নামাজের উপর ভরসা করবেন না। মনে রাখবেন, আমার যৌবনকালের সব পাপকার্যের জন্য আমাকে দোজখে দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছিল—আমার সব পুণ্যকার্য ও দানশীলতা কেয়ামতের দিন কোন কাজেই আসে নাই। আমি এত নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম যে, বেহেশতের সব আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে দোজখের আগুনে জ্বলবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, "তোমাকে আমরা দুনিয়াতে কুকুর হিসাবেই গণ্য করেছি এবং অন্য একটা কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে তোমার সব পাপকার্য মোচন করে দিয়েছি। তোমাকে দোজখ থেকে এনে বেহেশতে স্থান দেওয়া হয়েছে কারণ তুমি সব গর্ববোধ পরিত্যাগ করে একটা কুকুরের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলে।" তারপর আমি দেখতে পেলাম বেহেশত থেকে বিদ্যুতের ন্যায় ফেরেশতারা এসে দোজখের ফেরেশতাদের থেকে কেড়ে আমাকে বেহেশতে নিয়ে গেল। সুতরাং সমস্ত দানশীল কাজের মধ্যে ঐ একটাই আমাকে শেষ পর্যন্ত চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।'

আমি এই গল্পের পুনরুক্তি করলাম যাতে সুলতান জানতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া দেখান কত বড় মহান অভ্যাস। কারণ এই সমস্ত লোক একটা ভেড়ী ও একটা কুকুরের প্রতি দয়া দেখিয়ে ইহকালে ও পরকালে উচচ সম্মান লাভ করেছেন।

সুতরাং এটা অনুমান সাপেক্ষ যে, একজন বিপদগ্রস্ত মুসলমানের উপর দয়াদাক্ষিণ্য দেখালে এবং তাকে সাহায্য করলে আল্লাহ্ তার প্রতি কতদূর সদয় হবেন এবং তাকে কিভাবে পুরস্কৃত করবেন। একজন রাজা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং তিনি যদি ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন তাহলে প্রতিটি কাজে তিনি ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য আর ন্যায়পরায়ণ লোক সব সময়ই দয়ালু হয়। রাজা এইরূপ হলে তাঁর কর্মচারীরা ও সৈনিকরাও

তাঁর মত হবে এবং তাঁকেই অনুসরণ করবে। ফলে সকল মানুষই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে আর রাজাও উভয় জগতে পুরস্কৃত হবেন।

জ্ঞানী রাজারা সকলেই বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ লোকদের সম্মান করতেন এবং বিভিন্ন কাজে পারদর্শী এবং যুদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রত্যেককে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত রাখতেন। কোন চুক্তি সম্পাদন করতে, কোন বিদেশী রাজার সম্পর্কে কোন খবর আনা, ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসন্ধান করা ইত্যাকার দেশকল্যাণমূলক কোন কাজ করতে হলে তাঁরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে বিস্তারিত পরামর্শ করে নিতেন। অন্যদিকে শত্রুরা আক্রমণ করলে অথবা যুদ্ধের আশঙ্কা হলে তাঁরা যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তিদের থেকে পরামর্শ নিতেন। ফলে সব কাজেই তাঁরা কৃতকার্য হতেন। যুদ্ধ বাধলে তাঁরা এমন একজন ব্যক্তিকে সমরক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিতেন যার বহুবার যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে। তারপর শত্রুদের পরাজিত করে বিভিন্ন দুর্গ দখল করে পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করতেন। তবে তার সঙ্গে পরিপক্ব ও বহুদর্শী সৈন্যদেরও পাঠাতেন যাতে কোন আক্রমণই বিফল না হয়। কিন্তু আজ-কালকার দিনে কোন সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত হলে অনভিজ্ঞ লোকদের, এমনকি, বালকদের ও স্ত্রীলোকদেরও নিযুক্ত করা হয়, ফলে তারা ভুল করে বসে। এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করলে অবস্থা এর চেয়ে ভাল হবে এবং বিপদের সম্ভাবনা কম থাকবে।

খেতাব প্রসঙ্গে

খেতাবের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে গেছে, আর কোন জিনিসের প্রাচুর্য হলেই তার মান ও মর্যাদা যায় কমে। খেতাব দেবার ব্যাপারে খলীফারা ও রাজারা খুব যত্নশীল ছিলেন। কারণ যে-কোন লোককে তাঁর পদ ও মর্যাদা অনুসারে খেতাব দেওয়া রাজ্য শাসনের একটা নীতি-বিশেষ। একজন সামান্য দোকানদার অথবা একজন কৃষকের খেতাব ও একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার খেতাব যদি একই হয়, তাহলে ছোট-বড় কোন তফাত থাকে না এবং সুপরিচিত ও অজ্ঞ ব্যক্তি এক হয়ে যায়। একজন ইমামের অথবা একজন বিদ্বানের অথবা একজন বিচারকের যদি মুঈনউদ্দীন (ধর্মের পৃষ্ঠপোষক) খেতাব থাকে, অন্যদিকে একজন ছাত্র অথবা একজন তুর্কীর ধর্ম বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এমনকি লেখা-পড়া না জানা সত্ত্বেও যদি ঐ একই খেতাব থাকে, তাহলে একজন

বিচারক ও একজন ছাত্র এবং একজন বিদ্বান ও একজন অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোথায়? দুই জনেরই একই খেতাব থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

আমীরদের ও তুর্কীদের সব সময় হুসাম-আদ-দৌলা (রাজ্যের তরবারি), সাইফ-আদ-দৌলা (রাজ্যের খড়্গ), আমিন-আদ-দৌলা (রাজ্যের বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক), শামস-আদ-দৌলা (রাজ্যের সূর্য) ইত্যাদি জাতীয় উপাধি দেওয়া হোত আর বেসামরিক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, শাসনকর্তাদের ও কর্মচারীদের দেওয়া হোত আমিদ-আল-মুলক (রাজ্যের স্তম্ভ), জহির-আল-মুলক (রাজ্যের সংরক্ষক), কাইয়ুম-আল-মুলক (রাজ্যের ভার গ্রহণকারী) এবং নিজামুল মুলক (রাজ্যের ভূষণ)। এখন আর কোন ভেদাভেদ মানা হয় না---তুর্কীরা নিজেরাই বেসামরিক কর্মচারীদের খেতাব গ্রহণ করে, তাজিকরা (পারস্যবাসী) তুর্কীদের খেতাব নিতে কোন দ্বিধা করে না। কিন্তু খেতাব আগে সর্বদাই মহার্ঘ ছিল।

সুলতান মাহ্মুদ ও তাঁর খেতাব সম্পর্কিত গল্প

সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান মাহ্মুদ খলীফা আল কাদির বিল্লার কাছে একটা খেতাব চাইলেন। তাঁকে খেতাব দেওয়া হোল ইয়ামিন আদ-দৌলা (সাম্রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত)। তারপর তিনি নিমরুজ, খোরাসান ও হিন্দুস্থান দখল করে অগণিত শহরের অধিপতি হলেন এবং সোমনাথে গিয়ে সেখান থেকে মূর্তি নিয়ে এলেন, সামারকন্দ ও খারাজাম বিজয় করলেন। সেখান থেকে কুহিস্তান ও ইরাকে এসে রায়, ইস্পাহান, হামাদান এবং তাবারিস্তান দখল করে খলীফার কাছে বহু উপঢৌকনসহ একজন দূত পাঠিয়ে আরো খেতাব চেয়ে পাঠালেন। তিনি তার উত্তর না পেয়ে দশ বার দূত পাঠালেন; কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। এদিকে সামারকন্দের খাকানকে তিনটা খেতাব দেওয়া হয়েছিল আর তার ফলে সুলতান মাহ্মুদের সব সময় ঈর্ষা হোত। তার খেতাবগুলো ছিল জহির-আদ-দৌলা (সাম্রাজ্য রক্ষক), মুঈন খিলাফত আল্লাহ্ (আল্লাহ্র প্রতিনিধির সহায়ক) এবং মালিক আশ শার্ক ওয়াস্ সীন (প্রাচ্য ও চীনের সম্রাট)। যাই হোক, সুলতান মাহ্মুদ পুনরায় দূত মারফত বললেন, 'আমি পৌত্তলিক ভূমিতে অনেকবার জয়লাভ করেছি, আমি হিন্দুস্তান, খোরাসান এবং ইরাকের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছি, আমি ট্রান্স-অক্সিয়ানা দখল

করেছি আর আমি আপনার নামে সর্বদাই তরবারি চালাচ্ছি। খাকান, আমার অধীনস্থ প্রজাকে, আপনি তিন তিনটে খেতাব দিয়েছেন আর এত বাধ্যগত এবং এত সব কাজ-কর্ম করা সত্ত্বেও আমাকে দিয়েছেন মাত্র একটা খেতাব।'

উত্তরটাও এল এমনিভাবে, 'খেতাব সম্মানসূচক প্রতীক যার ফলে মানুষের মর্যাদা বেড়ে যায় এবং সারা দুনিয়ায় পরিচিত হয়। তবে মানুষের আসল নাম পিতামাতা রাখে, তার কুনিয়া (ডাকনাম) সে নিজেই বেছে নেয় আর রাজার তরফ থেকে তাকে যেটা দেওয়া হয় সেটা খেতাব। এই তিনটার বাইরে কিছু দিলে সেটা হবে অতিরিক্ত ও উপহাসস্বরূপ, আর কোন বুদ্ধিমান রাজাই নিজেকে উপহাসের পাত্র ও অন্তঃসার-শূন্যরূপে প্রকাশ করতে চান না। একটা লোক যখন ছোট থাকে, তখন তার নাম ধরে ডাকা হয় আর তাতে তার মা-বাবা খুব খুশী হন, কারণ নামটা তাদেরই পছন্দ করা। বড় হলে সে তার নিজের ইচ্ছামত নিজের বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা অতিরিক্ত নাম বেছে নেয়। কথায় বলে, (আরবীতে) 'আকাঙ্খার সঙ্গে খেতাবের মিল থাকে।' তারপর থেকে লোকে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই অতিরিক্ত নাম ধরেই ডাকত। পরবর্তীকালে সে যখন কৃতিত্ব ও নিপুণতার পরিচয় দেয় তখন রাজা তাকে অন্যান্য সকলের থেকে আলাদা ও উন্নত বিবেচনা করে তার পদমর্যাদা অনুসারে একটা খেতাব দেন। সেইজন্য এই খেতাব তার পিতা-মাতা কর্তৃক প্রদত্ত নাম এবং তার নিজ প্রদত্ত নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর লোকেও তাকে সম্মানভরে নত হয়ে রাজা প্রদত্ত খেতাব ধরে ডাকে। এই তিনটা ব্যতিরেকে অন্য যে-কোন খেতাব নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু খাকান অজ্ঞ এবং বিদেশীয় তুর্কী, আমি তাকে ফুলানোর জন্য এবং তার অজ্ঞতা পূরণ করার জন্য তার অনুরোধ রক্ষা করেছি। আর তুমি যেহেতু সব বিষয়ে বিজ্ঞ এবং আমার খুব নিকটে আছ, তোমার যোগ্যতা ও সততা সম্পর্কে আমি যে উচ্চ মনোভাব পোষণ করি, তা তোমার অজ্ঞদের মত লিখিত বা মৌখিক কিছু চাওয়ার বহু উর্দ্ধে।'

এই কথাগুলো শুনে সুলতান মাহমুদ অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। এদিকে তুর্কী এক মহিলা মাঝে মাঝে সুলতান মাহ্মুদের প্রাসাদে আসতেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিতা, মিষ্টভাষিণী এবং অনেকগুলো ভাষা জানতেন। তিনি মাহ্মুদের সঙ্গে কথা বলতেন, হাসি-তামাসা করতেন ও কখনও বা আবার তাঁকে গল্প পড়ে শোনাতেন। এক কথায়, মাহ্মুদের সঙ্গে তাঁর খুব

সদ্ভাব ছিল। একদিন মহিলা সুলতানের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করছিলেন, এমন সময় সুলতান বললেন, 'খলীফার নিকটে আমি এত চেষ্টা করছি আমার খেতাবের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কিন্তু তাতে কোন লাভই হচেছ না। অন্যদিকে খাকান আমার অধীনস্থ প্রজা হওয়া সত্ত্বেও সে অনেকগুলো খেতাব পেয়েছে। যদি আমি এমন কাউকে পেতাম যে খাকানের ধনাগার থেকে চুরি করে বা অন্য কোন উপায়ে খলীফা প্রদত্ত দলিলটা এনে দিত! এই কাজটা করে দিতে পারলে সে যা চাইবে আমি তাই দিতাম।' মহিলাটি তখন বললেন, 'হে সুলতান, আমি নিজেই গিয়ে দলিলটা এনে দিব কিন্তু আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে, আমি যা চাই তাই দিতে হবে।' সুলতান বললেন, 'হ্যাঁ, আমি রাজী আছি।' মহিলাটি তখন বললেন, 'আপনার কাজ করবার মত প্রচুর টাকা আমার নাই, আপনার ধনাগার থেকে আমাকে কিছু সাহায্য করলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' সুলতান বললেন, 'তোমার যা প্রয়োজন আছে আমাকে বল, আমি দিতে রাজী আছি।' এইভাবে তিনি মহিলাকে টাকা-পয়সা, অলঙ্কার, জীবজন্তু, খাবার ইত্যাদি সবই দিলেন। ঐ মহিলার চৌদ্দ বছর বয়স্ক একটি ছেলে ছিল, সে এক শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করছিল। ঐ ছেলেকে সঙ্গে করে মহিলাটি গজনী থেকে রওয়ানা হয়ে কাসঘারে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কয়েকজন তুর্কী ভৃত্য ও ক্রীতদাসী কিনলেন এবং ক্যাথে এবং খোতান থেকে আমদানীকৃত পছন্দকরা কস্তুরী এবং বিভিন্ন জাতীয় রেশমী কাপড়ও কিনলেন। তখন তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভ্রমণ করে উজগান্দে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছলেন সামারকন্দে।

সেখানে পৌঁছবার তিন দিন পরে তিনি সঙ্গে একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী এবং ভারত, খোতান ও ক্যাথে থেকে আনীত বাছাই করা কতকগুলো জিনিস খাতুনকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'আমার স্বামী ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি আমাকে সঙ্গে করে সারা দুনিয়া ঘুরে ব্যবসা করতেন। আমরা ক্যাথের দিকে যাচ্ছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে খোতানে পৌঁছলে তিনি মারা যান। আমি ফিরে কাসঘারে চলে আসি। আমি কাসঘারের খাকানকে একটা উপহার দিলাম এবং তাঁকে খুলে বললাম যে আমার স্বামী তাঁর একজন ভৃত্য ছিলেন এবং আমি ছিলাম খাতুনের একজন পরিচারিকা; পরে আমাদের মুক্ত করে দিয়ে আমাদের বিয়ে দেওয়া হয় এবং আমাদের বিবাহের ফলস্বরূপ

এই ছেলেটির জন্ম হয় ; তিনি সম্প্রতি খোতানে মারা গেছেন আর তিনি আমার জন্য যা-কিছু টাকা-পয়সা রেখে গেছেন সবই খাতুন তাঁকে দিয়েছিলেন ; খাকান ও খাতুন যদি তাঁদের এক ভৃত্য ও তাঁর এতিম ছেলের প্রতি দানশীল ও উদার হয়ে কিছু সাহায্য করতেন এবং একদল সৎ সঙ্গীর সঙ্গে আমাদেরকে উজগান্দ ও সামারকন্দের দিকে পাঠিয়ে দেন, তার জন্য সারাজীবন আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। খাতুন ও খাকান দু'জনেই আমাদের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করেছেন। খাকান আমাদেরকে একজন পথ-প্রদর্শক দিয়েছিলেন, উজগান্দের খানকে আমাদের দেখাশুনা করার জন্য এবং একটা ভাল দলের সঙ্গে আমাদেরকে সামারকন্দে পাঠিয়ে দেবার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। সামারকন্দের ন্যায় আর কোথাও এত ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা নাই বলেই এখন আমরা আপনার দুয়ারে হাজির হয়েছি। আমার স্বামী সব সময়ই বলতেন, যদি তিনি কখনও সামারকন্দে পৌঁছতে পারেন তাহলে সেখান থেকে আর কোথাও যাবেন না। আপনার নাম ও সুখ্যাতি শুনেই আমরা এখানে এসেছি। আপনি যদি আমাকে দাসী হিসাবে মেনে নেন এবং আমার আশ্রয়দাতা হতে রাজী হন, তাহলে আমি এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করব---আমার সঙ্গে যা অলঙ্কারাদি আছে সব বিক্রি করে একটা বাড়ী কিনব এবং একটা খামার কিনব, যার দ্বারা আমার খরচ চলে যাবে। তখন আমি সারাক্ষণ আপনার সেবা করব এবং এই ভরসায়ও ছেলেটির লেখাপড়া চালাতে থাকব যে আপনার আশীর্বাদে আল্লাহ্ তার মঙ্গল করবেন।'

তখন খাতুন বললেন, 'মোটেই চিন্তা কোর না। তোমার দেখাশুনা করার সব রকম ব্যবস্থা আমি করব। আমি তোমাকে একটা বাড়ী ও একখণ্ড জমি দিব। তুমি যা চাও আমি তাই করব আর কোন সময়েই তোমাকে এখান থেকে যেতে দিব না। আমি খাকানকেও বলব— তোমার প্রয়োজন ও অনুরোধ রক্ষা করার জন্য।' মহিলাটি খাতুনের সামনে নত হয়ে বললেন, 'আপনিই এখন আমার কর্ত্রী। আমি আপনাকে ছাড়া এখানে আর কাউকে চিনি না, তাই আপনি মহামান্য খাকানের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি নিজেই আমার বক্তব্য তাঁর কাছে পেশ করতে পারতাম।' খাতুন বললেন, 'তুমি যখনই চাও আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাবো।' মহিলাটি বললেন, 'আমি কালই যেতে চাই।' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' পরের দিন মহিলাটি খাতুনের বাড়ীতে গেলেন ; এদিকে খাতুন খাকানকে

তাঁর কথা আগেই বলে রেখেছেন তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গেলেন। মহিলাটি নতজানু হয়ে তাঁকে একটা তুর্কী ভৃত্য, একটি সুন্দর ঘোড়া এবং অন্যান্য কতকগুলি বাছাই করা জিনিস উপহার দিয়ে বললেন, 'আমি খাতুনের নিকট আমার কাহিনী কিছু বর্ণনা করেছি। সংক্ষেপে আপনাকে বলি। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর অংশীদার আমি যে সমস্ত জিনিসপত্র ক্যাথেতে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তা নিতে বারণ করলেন। তাই কিছু আমি কাসঘারের খানকে দিয়ে দেই, কিছু আমি রাস্তার খরচ হিসেবে ব্যয় করি আর এখন আমি নিজে, আমার এই এতিম ছেলে, কিছু অলঙ্কারাদি এবং কয়েকটি জন্তু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই অবস্থায় একজন দাসী হিসাবে যদি আপনার মহানুভবতা লাভ করতে পারি তাহলে চিরজীবন এখানে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত আছি।'

খাকান সদয় হয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন। তারপর মহিলাটি প্রতি দুই তিন দিন অন্তর অন্তর খাতুনকে একটা কিছু উপহার দিতেন এবং তাঁদেরকে এমন সুন্দর সুন্দর গল্প ও রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনাতেন যে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন এবং তাঁকে ছাড়া থাকতে পারতেন না। তিনি তাঁদেরকে এমন মনোযোগ সহকারে সেবা করতেন যে, তাঁরা তাতে অস্বস্তি-বোধ করতেন আর তাঁরা যখনই তাঁকে গ্রাম এবং কৃষিজমি দিতে চাইতেন, তিনি সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। কিছুদিন পরে পরে তিনি নিজ বাসস্থান ছেড়ে একটা কৃষিজমি কেনার অজুহাতে শহর ছেড়ে তিন-চার ফারসাং দূরে চলে যেতেন। জমি দেখার জন্য তিন-চার দিন সেখানে থাকতেন এবং তখন যে-কোন একটা ত্রুটি বের করে সেটার অজুহাত দেখিয়ে না কিনে আবার ফিরে আসতেন। যখন খাতুন ও খাকান লোক পাঠিয়ে জানতে চাইতেন কেন তিনি তাঁদেরকে পরিত্যাগ করছেন এবং তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে কেন যান না, জানা যেতো যে তিনি অমুক গ্রামে একটা জমি কিনছেন তাই দুই তিন দিন হল সেখানে আছেন। শুনে তাঁরা খুব আনন্দিত হতেন এই ভেবে যে তিনি এখানে থাকতে মনস্থ করেছেন। এইভাবে ছয় মাস কেটে গেল। এদিকে খাতুন তাঁকে কয়েকবার বলেছেন, 'খাকান সব সময়ই বলেছেন যে তোমাকে দেখলেই তিনি লজ্জা বোধ করেন কারণ তুমি আমাদের জন্য এত কিছু করছ। কয়েকদিন পরে পরেই তুমি আমাদেরকে উপহার এনে দাও কিন্তু আমরা কিছু দিলেই তুমি তা নাও না। তিনি তোমার মত দয়ালু মহিলা আর দেখেন নাই। তিনি অবাক হয়ে যান এই ভেবে যে, তুমি

আমাদের জন্য এত কিছু করছ আর তোমার জন্য আমাদের কি করা উচিত। আর আমি তাঁর চেয়ে হাজার গুণে লজ্জিত।' মহিলাটি বললেন, 'আমি আমার মনিবদের দেখতে পাচ্ছি আর আল্লাহ্‌র রহমতে তাঁরা আমার খাবার যোগাচ্ছেন—এই আমার জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। আমি প্রত্যেক দিনই আপনাদের দেখা পাই আর আপনাদের ছাড়া আমি থাকতেও পারি না। তাই আমার কিছু প্রয়োজন হলে আমি নিজেই চেয়ে নিতে ইতস্তত: করব না।' এইভাবে তিনি তাঁদেরকে প্রতারণা করে চললেন। ইতিমধ্যে তাঁর যে স্বর্ণ, মণিমুক্তা ও আচ্ছাদিত পোশাক ছিল তা তিনি গোপনে এক ব্যবসায়ীকে দিয়ে দিয়েছেন—যে সাধারণতঃ বাণিজ্য উপলক্ষে সামারকন্দ ও গজনীর পথে চলাফেরা করত। তিনি পাঁচজন অশ্বারোহীকে পাঁচটা ভাল ঘোড়াসহ এই নির্দেশ দিয়ে বাল্ক ও তিরমিজের রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি না আসা পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনে একজন অশ্বারোহীকে একটা ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

খাতুন ও খাকান যখন একত্রে বসেছিলেন, তখন তিনি খাতুনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উচ্চ প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে রাজোচিত শিষ্টাচার শেষ করে তিনি বললেন, 'আজ আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আপনাদের কাছে বলতে আমার ভয় হচ্ছে।' খাতুন তখন বললেন, 'তোমার থেকে এই কথা শুনে অবাক লাগছে। এতদিনে তুমি যদি হাজারও অনুরোধ করতে আর আমরা যদি সেগুলো পূরণ করতাম তাহলে সেটাই হোত ন্যায়। তুমি বল, কি তোমার প্রয়োজন?' তিনি বললেন, 'আপনারা জানেন, দুনিয়াতে এই ছেলেটিই হোল আমার একমাত্র সম্বল। আমি তার ভবিষ্যৎ ও শিক্ষার জন্য চিন্তিত। সে ইতিমধ্যেই সমস্ত কোরআন শরীফ শেষ করেছে এবং এখন সে কর্মসচিবী শিখছে ও আরবী-পারসী গ্রন্থাদি পড়ছে। আশা করি, আপনাদের দোয়ায় সে ভাগ্যবান হবে। এখন কোরআন-হাদীসের পরে রাজার কাছে পাঠানো খলীফার দলিলনামার চেয়ে দুনিয়াতে পবিত্র আর কিছু নেই। যাঁরা এই দলিলনামা তৈরী করেন, তাঁরা সব কর্মসচিবের চেয়ে বেশী শিক্ষিত। সুতরাং এইগুলার ভাষা ও মর্মকথা নিশ্চয়ই অতি সুন্দর। আপনি যদি দয়া করে দুই তিন দিনের জন্য খলীফার দলিলনামাখানা দিতেন, তাহলে আমার ছেলেটি তার শিক্ষকের নিকটে কয়েকবার পড়তে পারত। সে তা থেকে পাঁচটা শব্দ লিখতে পারলেও হয়ত তার প্রভাবে ভাগ্যবান হবে

যেতে পারে।' খাকান ও খাতুন তখন বললেন, 'এটা কি আমাদের কাছে করার মত একটা অনুরোধ হোল? তুমি কেন একটা শহর অথবা একটা জেলা চাও না? তুমি আমাদের কাছে এমন একটা জিনিস চেয়েছ যার পঞ্চাশখানা ধনাগারে রক্ষিত আছে এবং ধূলিকণায় নষ্ট হচ্ছে। একখণ্ড কাগজের মধ্যে কি এমন রত্ন লুক্কায়িত আছে? তুমি যদি চাও, আমরা তোমাকে সবগুলো কাগজ দিয়ে দিতে পারি।' মহিলাটি শুনে বললেন, 'খলীফাপ্রদত্ত দলিলখানাই যথেষ্ট হবে।' একটা ভৃত্যকে তখন মহিলার সঙ্গে ধনাগারে গিয়ে তিনি যা চান, তাই দিয়ে দিতে হুকুম দেওয়া হোল।

যাই হোক, মহিলাটি ধনাগারে গিয়ে দলিলখানা নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। পরের দিন তিনি অশ্বগুলো বোঝাই করে রওনা হলেন এবং বলে দিলেন যে তিনি একটা জমি কিনবার জন্য অমুক গ্রামে যাচ্ছেন, ফিরতে সপ্তাহ খানেক দেরী হবে। তিনি অশ্বারোহণ করে সোজা সেই গ্রামে চলে গেলেন। যাবার পূর্বে তিনি একখানা ছাড়-পত্র নিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল যে, সামারকন্দ ও বুখারা প্রদেশের যেখানেই তিনি জমি কিনতে অথবা কোন জমি দখল করতে অথবা বাস করতে যান না কেন তাঁকে সম্মান দেখাতে হবে এবং তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করতে হবে। রাজস্ব আদায়কারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রতিও তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে এবং তাঁর প্রয়োজনমত সবকিছু সরবরাহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

তারপর একদিন মধ্যরাত্রে তিনি সেই গ্রাম থেকে পালিয়ে গেলেন এবং সামারকন্দ শহর থেকে তিন ফারসাং দূরবর্তী এক জায়গায় অবস্থান করে সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়লেন। পাঁচদিনে তিনি তিরমিজে পৌঁছলেন। প্রয়োজনমত তিনি ছাড়-পত্র দেখিয়ে নতুন নতুন অশ্ব পেতে থাকলেন। আমুদরিয়া অতিক্রম করে বাল্‌খে না পেঁছা পর্যন্ত খাতুন তাঁর যাওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাল্‌খ থেকে গজনী গিয়ে দলিলনামাখানা সুলতান মাহ্‌মুদের সামনে রাখলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ জনৈক বিদ্বানকে দিয়ে বহু উপঢৌকনসহ সেটাকে খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একটা চিঠিও লিখলেন। তাতে লেখা ছিল: 'আমার এক ভৃত্য সামারকন্দ বাজার দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা স্কুলের কাছে গেলে সেখানে সে খলীফার এই দলিলনামাখানা ছোট ছেলেদের হাতে দেখতে পায়। ছেলেগুলো এটার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা

প্রদর্শন না করে একে অন্যের হাত থেকে নিচেছ এবং ধূলায় মাখামাখি করছিল। আমার ভৃত্যটি দলিলনামাটি চিনতে পেরে সেটা উদ্ধার করতে চাইল। তাই সে ছেলেদেরকে কিছু কিসমিস দিয়ে তাদের থেকে দলিল-নামাটা নিয়ে নেয়। তারপর সে সেটা গজনীতে নিয়ে আসে এবং আমাকে দেখায়। আমি এখন সসম্মানে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আর এই সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমার কাছে আপনার দলিলনামা আমার নিজের চোখের মণির চেয়েও বেশী মূল্যবান এবং সেগুলোকে আমি আমার মাথার মুকুটস্বরূপ মনে করে সযত্নে ধনাগারে রেখে দেই। আমার অতীতের এত সব কাজ-কর্ম ও আশা-ভরসা সত্ত্বেও আমাকে আপনি আর কোন খেতাব দিতে রাজি হন নাই কিন্তু এমন লোককে খেতাব দিয়েছেন, যে আপনার আদেশের পবিত্রতা রক্ষা করতে জানে না, যে সব সম্মান ও কৃতিত্বকে অবজ্ঞা করে এবং প্রাপ্ত খেতাবগুলোর প্রতি দেখায় শুধু অমনোযোগিতা।'

এই বিদ্বান ব্যক্তি বাগদাদে গিয়ে উপঢৌকনসহ পত্রখানা যখন খলীফার নিকট দিলেন, খলীফা তখন পত্রখানা পড়ে খুব অবাক হয়ে গেলেন এবং তখনই খাকানকে একখানা ভর্ৎসনাপত্র দিতে আদেশ দিলেন। সুলতান মাহ্‌মুদের দূত ছয়মাস খলীফার দরবারে অবস্থান করে দরখাস্ত দিয়ে বারবার মাহ্‌মুদের তরফ থেকে খেতাব প্রার্থনা করলেন কিন্তু তার কোন সদুত্তর পেলেন না। তাই তিনি একদিন বাগদাদের প্রধান বিচারপতির কাছে ব্যাপারটা পেশ করবার জন্য একটা প্রস্তাব লিখলেন। এতে লেখা ছিল, 'যদি কোন রাজার রাজত্ব বজায় রাখতে হয়, ইসলামের জন্য তরবারি ধরতে হয়, অবিশ্বাসী ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় এবং মন্দির-গুলোকে মসজিদে পরিণত করে অধর্মীদের বাসস্থানে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে হয় আর সে যদি খলীফা থেকে অনেক দূরে থাকে, মাঝখানে যদি নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত এবং মরুভূমি থাকে, সব সময় যদি সব ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া সম্ভব না হয় এবং সে যদি খলীফার কাছ থেকে তার অনুরোধের কোন উত্তরই না পায় তাহলে এ অবস্থায় আব্বাসীদের কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোককে খলীফার সহকারী হিসাবে অধিষ্ঠিত রাখা এবং তাঁর কর্তৃত্ব মেনে চলা উচিত হবে কিনা?' প্রস্তাবটা তিনি একজনকে দিয়ে বাগদাদের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিচারক পড়ে রায় দিলেন যে, এটা অন্যায় হবে না। বিদ্বান লোকটি বিচারের রায়ের

একটা নকল নিয়ে তার সঙ্গে খলীফাকে লিখিত দরখাস্তের একটা নকলও সংযুক্ত করে লিখলেন, 'আমি অনেকদিন আপনার এখানে অপেক্ষা করলাম। সুলতান মাহ্‌মুদ হাজার ভক্তিমূলক ও জনদরদী কাজ করে একটা-দুটো খেতাবের জন্য এত অনুনয়-বিনয় করছেন কিন্তু খলীফা তাতে সম্মত হচ্ছেন না। ফলে যোদ্ধা রাজার আশা-ভরসা বিফল হচ্ছে আর অন্তরেও তিনি আঘাত পাচ্ছেন। এখন এরপরে যদি সুলতান মাহ্‌মুদ প্রধান বিচারকের রায় অনুযায়ী কাজ করেন তাহলে আপনি কি তাঁকে ক্ষমা করবেন?'

খলীফা দরখাস্তখানা পড়েই তাঁর গৃহাধ্যক্ষকে উজিরের কাছে মাহ্‌মুদের দূতকে ডেকে এনে তাকে আশা-ভরসা দিয়ে শান্ত করে রাখতে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। নির্দেশ দিলেন, তাকে বিভিন্ন রকমের সম্মান-সূচক উপাধি ও খেতাব দিয়ে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিতে। খলিফার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মাহ্‌মুদের এত সব কীর্তিকলাপ এবং বিদ্বান লোকটির নিপুণ ওকালতি সত্ত্বেও তাকে একটা মাত্র অতিরিক্ত খেতাব দেওয়া হোল আর সেটা হোল আমিন-আল-মিল্লা (জাতির বিশ্বাসী) এবং সারাজীবন সুলতান মাহ্‌মুদের ইয়ামিন-আদ-দৌলা ও আমিন-আল-মিল্লা এ দুটো খেতাবই ছিল। আর আজ-কালকার দিনে নিম্নতম অফিসারদেরও সাতটা অথবা দশটার কম খেতাব থাকলে তারা অসন্তুষ্ট হয়।

যে সমস্ত সামানী বড় বড় রাজা ছিলেন এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা, গজনী, খোরাসান, খারাজম, নিমরুজ এবং দুই ইরাকে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা করে খেতাব ছিল। নূহকে বলা হোত শাহান-শাহ (মহারাজা); নূহর পিতা মনসুরকে বলা হোত আমির সাদীদ (ভাল অধিনায়ক); মনসুরের পিতা নূহকে বলা হোত আমির হামিদ (প্রশংসিত অধিনায়ক); নূহের পিতা নাসেরকে বলা হোত আমির সাইদ (ভাগ্যবান অধিনায়ক) এবং ইসমাঈল ইবনে আহমদ পরিচিত ছিলেন আমির আদিল নামে (ন্যায়পরায়ণ অধিনায়ক)। কোন লোককে তাঁর উপযুক্ততা দেখে খেতাব দেওয়া উচিত। বিচারক, ইমাম ও বিদ্বানদের সাধারণতঃ মাজিদ আদ-দীন, সারাফ আল-ইসলাম, সাইফ আস-সুন্না, জাইন আশ-শারিয়া এবং ফখর আল-উলেমা ইত্যাকার খেতাব দেওয়া হয়, কারণ বিদ্বানদের 'ধর্মীয় অনুশাসন' এবং বিশ্বাস নিয়েই কাজ করতে হয়। যদি এমন কেউ এই সমস্ত খেতাব গ্রহণ করে যে বিদ্বান নয় তাহলে শুধুমাত্র রাজা ন'ন, সব বিবেকবান ও বিদ্বান ব্যক্তিরই সেটাতে নৈতিক সমর্থন দিতে অস্বীকার করা উচিত এবং সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া উচিত—যাতে সকলেই তার

নিজ নিজ সীমারেখা মেনে চলে। এমনিভাবে সেনাপতি, আমির, রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধি এবং কমিশনারদের খেতাবও 'দৌলা' (রাজ্য) শব্দ দ্বারা আলাদা করা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ সাইফ আদ-দৌলা, হুসাম আদ-দৌলা, জহির আদ-দৌলা, আমাল আদ-দৌলা ইত্যাদি)। তেমনিভাবে বেসামরিক শাসনকর্তা, রাজস্ব আদায়কারী এবং কর্মচারীদের খেতাব 'মুলক' শব্দ দ্বারা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে (যেমন আমিদুল-মুলক, নিজামুল মুলক, জামালুল-মুলক, সরাফুল-মুলক ইত্যাদি।) তুর্কী আমীরদের বেসামরিক গণ্যমান্য-খেতাব পরা এবং বেসামরিক গণ্যমান্যদের আমীরদের খেতাব পরার রীতি কখনও প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ভাগ্যবান সুলতান আল্প আরসলানের পর থেকে নিয়ম পরিবর্তিত হয়েছে, বিবেচনাবোধ দূরীভূত হয়ে গেছে এবং খেতাবেরও মিশ্রণ হয়ে গেছে। নগণ্যতম ব্যক্তি চেয়েছে উচ্চতম খেতাব এবং তাকে সেটা দেওয়া হয়েছে আর তার ফলে খেতাবের মূল্য গেছে কমে।

দাইলামের রাজা এবং ইরাকের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শাসক বুয়াইহীদের মধ্যে একজনের খেতাব ছিল রোকনুদ-দৌলা আর অন্য একজনের ছিল অদুদ-দৌলা। অন্যদিকে তাঁদের উজিরদের খেতাব ছিল উস্তাদ জলিল এবং উস্তাদ খাতির। ইরাক ও খোরাসানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী উজির ছিলেন সাখিব ইবনে আব্বাদ আর তাঁর খেতাব ছিল কাফিল কুফাত। সুলতান মাহ্মুদের উজিরের খেতাব ছিল শামস আল-কুফাত।

আগে আদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন শব্দগুলো রাজার খেতাবের মধ্যে থাকত না। খলীফা আল-মুক্তাদিই সুলতান মালিক শাহের খেতাবের মধ্যে মুইজ আদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীনের প্রচলন করেন এবং মালিক শাহের মৃত্যুর পর থেকেই বাকিয়ারুক রোকনুদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন, মাহমুদ নাসিরুদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন, ইসমাঈল মহিউদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন এবং সুলতান মোহাম্মদ গিয়াস আদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন ইত্যাদি প্রচলিত নিয়মে ভূষিত হন। দুনিয়া এবং দীন শব্দগুলো রাজার স্ত্রী ও ছেলেদের খেতাবে ব্যবহৃত হোত। তাঁদের জন্য এটা উপযুক্ত, কারণ তাঁদের মঙ্গলের উপর নির্ভর করে দুনিয়ার উন্নতি আর তাঁদের বংশের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল রাজ্যের মঙ্গল বিধান।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সবচেয়ে নগণ্য তুর্কী ছাত্ররা বা বালক ভৃত্যরাও যারা ধর্ম ও রাজ্যের বিরুদ্ধে হাজারো রকমের অপরাধ ও অন্যায়

করেছে, তারাও নিজেরা নিজেদের মুঈন আদ-দীন এবং তাজ আদ-দীন খেতাব দিচ্ছে।

নিজাম আল-মুলক-কেই প্রথম 'দীন' শব্দে সংযুক্ত খেতাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি পেয়েছিলেন কিয়াম আদ-দীন (বিশ্বাসের সহযোগী) খেতাব। কিন্তু আজকালকার দিনে যে-কোন অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং ভুঁইফোড়কেও দীন, দৌলত এবং মুলক শব্দ সংযুক্ত খেতাব দেওয়া হয়ে থাকে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, দীন ও ইসলাম শব্দ সংযুক্ত খেতাব রাজা, উজির, বিদ্বান ও আমীর এই চার রকম মানুষের জন্য উপযুক্ত—যাঁরা সর্বদাই বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করেন। এঁরা ব্যতিরেকে অন্য যে-কেউ দীন ও ইসলাম সংযুক্ত খেতাব গ্রহণ করলে তাকে শায়েস্তা করা উচিত যাতে অন্যরা সতর্ক হয়ে যায়।

খেতাব দেওয়ার উদ্দেশ্য হোল যাতে খেতাবের মাধ্যমেই সেই লোককে চেনা যায়। উদাহরণস্বরূপ কোন এক দলে বা সভায় এক শত লোক থাকতে পারে এবং সেইদলে হয়ত দশ জনের নাম হতে পারে মোহাম্মদ। এখন কেউ যদি মোহাম্মদ বলে ডাক দেয় তাহলে দশ জন মোহাম্মদকেই বলতে হবে লাব্বাইক (আমি উপস্থিত আছি), কারণ প্রত্যেকেই মনে করবে যে তাকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু যদি এক জন মোহাম্মদকে বলা হয় মুমতাজ (স্বতন্ত্র), অন্য এক জনকে মুয়াফফাক (কৃতকার্য), অন্য এক জনকে কামিল (পবিত্র), আরেক জনকে রশিদ (নির্ভুল) ইত্যাকার সকলকে বিভিন্ন নামে ভূষিত করা হয়, তাহলে তাদের খেতাব ধরে ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারবে কাকে ডাকা হয়েছে।

উজির, জনসংযোগ বিভাগ-প্রধান, হিসাব-নিকাশ বিভাগের অধ্যক্ষ, সামরিক বিভাগ-প্রধান, গো ন তথ্য সংগ্রহকারী বিভাগ-প্রধান এবং বাগদাদ ও খোরাসানের বেসামরিক গবর্নর ছাড়া অন্য সকলকে 'মুল্ক' শব্দ সংযুক্ত ব্যতিরেকে উপাধি দেওয়া উচিত যেমন খাজা রশিদ (যথার্থ প্রধান), খাজা মুমতাজ (স্বতন্ত্র প্রধান), খাজা সাদীদ (সদাশয় প্রধান), উস্তাদ আমিন (বিশ্বস্ত প্রভু), উস্তাদ খাতির (সম্মানী প্রভু), উস্তাদ তাগিন (সাহসী প্রভু) ইত্যাদি। ফলে উঁচু-নীচু, ছোট-বড়, সম্ভ্রান্ত-সাধারণ সকলের পদ ও মর্যাদা পরিষ্কার-ভাবে বুঝা যাবে। আর শাসন ব্যবস্থার মান অপরিবর্তিত থাকবে। রাজ্যে স্থায়িত্ব থাকলে, রাজা ন্যায়পরায়ণ ও সদা সতর্ক থাকলে, সবকাজে খুব মনোযোগী হলে এবং তার পূর্ববর্তী রাজাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতে

ইচ্ছুক হলে আর তাঁর একজন সুযোগ্য, জ্ঞানী ও নিপুণ উজির থাকলে তিনি সব কাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন, খেতাব সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন আর তিনি তাঁর বিচার-বুদ্ধি, ক্ষমতা ও তরবারী দ্বারা সব কুসংস্কার দূর করে দিবেন।

একচল্লিশ অধ্যায়

একজনকে দুই পদে নিয়োগ না করা ; বেকার লোকদের চাকরি দেওয়া এবং তাদেরকে অভাবগ্রস্ত না করা ঃ যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন গোঁড়া-মতাবলম্বীদের চাকরি দেওয়া সম্পর্কে ; আর বিকৃত সম্প্রদায় এবং অসৎ নীতিবাদীদের চাকরি না দিয়ে দূরে রাখা

বুদ্ধিমান রাজারা এবং চতুর মন্ত্রীরা কোন কালেই এক ব্যক্তিকে দুই পদে নিয়োগ করতেন না বা দুই ব্যক্তিকে এক পদে নিযুক্ত করতেন না, ফলে তাঁদের সব কাজই সব সময় দক্ষতার ও যশের সঙ্গে সুসম্পন্ন হোত। একজন লোককে যখন দুটো কাজের ভার দেওয়া হয়, একটা কাজ সব সময়ই অযোগ্যতা ও ত্রুটির সঙ্গে সম্পন্ন হয়। আর সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন লোকের উপর দুটো কাজের দায়িত্ব থাকলে দুটোতেই সে অকৃতকার্য হয় এবং তার ভুল-ত্রুটির জন্য সারাক্ষণ অস্বস্তি বোধ করে। এমনিভাবে দুটো লোককে একই কাজে নিয়োগ করলে প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়, ফলে কাজটা চিরতরে অসম্পন্ন থেকে যায়। এই বিষয়ে একটা প্রবাদ আছে, 'যেখানে দুই গিন্নি সেখানেই বিশৃঙ্খলা আর যেখানে দুই মনিব সেখানে ধ্বংস অনিবার্য'। দুইজনের একজন মনে মনে চিন্তা করে, 'আমি যদি কষ্ট করে কৌশলের সঙ্গে কাজটা করি এবং যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করি, মনিব মনে করবে যে আমার সঙ্গীর যোগ্যতা ও নিপুণতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে—আমার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জন্য নয়।' অন্যজনও এই একই ধারণা পোষণ করে এবং মনে করে, 'অনর্থক পরিশ্রম কেন করব, কারণ এর জন্য কোন প্রশংসা বা ধন্যবাদ পাওয়া যায় না। আমি যতই পরিশ্রম করি এবং চেষ্টা করি, মনিব মনে করবে যে এটা আমার সঙ্গী করেছে।' আসলে কাজে সব সময় বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকবে এবং পরিচালক যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'এর কারণ কি?' তাদের দু'জনেই একে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দিবে। কিন্তু ব্যাপারটার মূলে গিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে তাদের দু'জনের কারুরই দোষ নয়, দোষটা হোল তার, যে ব্যক্তি দুইজন লোককে একই কাজে নিযুক্ত করেছে। কখনও যদি একজন কর্মচারীকে দুটো পদের ভার দেওয়া

হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে উজির অনুপযুক্ত এবং রাজা অমনোযোগী। আর এখন এমনও ব্যক্তি আছে যারা সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দশটা পদের অধিকারী এবং অন্য আরেকটা পদে লোক নেবার সময় হলে তারা সেটাও পাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং টাকা খরচ করে। কেউ ভেবে দেখবে না যে, ঐ সমস্ত লোক ঐ পদের যোগ্য কিনা, তাদের কোন যোগ্যতা আছে কিনা, কর্মসচিবী, শাসন ব্যবস্থা ও ব্যবসা সংক্রান্ত লেন-দেন তাদের জানা আছে কিনা এবং যে সমস্ত বহুবিধ কাজের ভার তারা গ্রহণ করেছে সেগুলো তারা সুসম্পন্ন করতে পারবে কিনা। সব সময়ই অনেক যোগ্য, আগ্রহান্বিত, উপযুক্ত, বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেকার অবস্থায় থেকে ঘরে বসে আলস্যে দিন কাটায় এবং কেউ অনুসন্ধান করে না, কেন পরিচিত, সম্ভ্রান্ত ও অভিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বেও অপরিচিত, অযোগ্য ও নীচ বংশজাত লোকেরা এতগুলো পদ দখল করে আছে—যদিও যে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত করা হয়েছে তাদের সন্তোষজনক ও গুণ-সম্পন্ন কাজের জন্য এই রাজবংশ অনেক ঋণী। এটা এই কারণে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, এর আগে সব সময় শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাস এবং বংশ দেখেই লোকদের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হোত। যদি কেউ পরাঙ্মুখ থাকত এবং ঐ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করত, তাহলে তার জন্য সেটা অবশ্যকরণীয় করে দেওয়া হোত এবং জোরপূর্বক তাকে দিয়ে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করান হোত। ফলে রাজস্ব অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ হতে পারত না, কৃষকদের উপরে কোন জুলুম হোত না, রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধিদের সুনাম ছিল, চাকরিতে ছিল স্থায়িত্ব আর রাজার ছিল শারীরিক ও মানসিক স্বস্তি ও শান্তি। কিন্তু এখন আর কোন ভেদাভেদ নাই। যদি কোন ইহুদী একজন তুর্কীর কাজ করে, তাহলে কোন আপত্তি উঠে না এবং খ্রীস্টান, জরথুস্ত্রবাদী ও কারামতীদের মধ্যে কোন তফাৎ আর এখন নাই। সর্বত্রই এখন উদাসীন ভাব বিদ্যমান—ধর্মের প্রতি কোন আগ্রহ নাই। রাজস্ব আদায়ের প্রতি কোন ভাবনা নাই, এমনকি কৃষকদের প্রতিও কোন সহানুভূতি নাই। অবস্থা এখন চরমে উঠেছে। আমার কুদৃষ্টির ভয় হচ্ছে; জানি না এর পরিণতি কি হবে।

সুলতান মাহ্‌মুদ, মাসূদ, তুঘরিল এবং আল্প আরসলানের সময় কোন জরথুস্ত্রবাদী, ইহুদী অথবা রাফিদীরও কোন জনসমক্ষে অথবা কোন মহৎ ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হবার দুঃসাহস ছিল না। যাঁরা তুর্কীদের সব কাজ দেখা-শুনা করতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন খোরাসান থেকে আগত

পেশাদারী আমলা এবং কর্মসচিব আর তাঁদের প্রত্যেকেই গোঁড়া হানাফী অথবা শাফী মজহাবভুক্ত। ইরাকে বিধর্মীদের কখনও কর্ম-সচিব ও রাজস্ব আদায়কারীর পদে নিযুক্ত করা হোত না এবং তুর্কীরা তাদেরকে একেবারেই কাজে নিয়োগ করত না। তারা বলত, 'এরা দাইলামী ও তাদের সমর্থকদের ধর্মে বিশ্বাসী ; তাদেরকে যদি স্থায়ীভাবে বাস করতে দেওয়া হয় তাহলে তারা তুর্কীদের স্বার্থহানি ঘটাবে এবং মুসলমানদের অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শত্রুদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখাই ভাল।' ফলে তারা নিরাপদেই ছিল। কিন্তু অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, সারা দরবার ও মন্ত্রী-পরিষদে তারাই ভর্তি এবং প্রত্যেকটা তুর্কীর পিছে দশ অথবা বিশ জন করে আছে। তাদের উদ্দেশ্য হোল যে, মুষ্টিমেয় যে কয়জন খোরাসানী আছে তাদেরকে দরবারের চাকরিতে ঢুকতে না দিয়ে তাদের জন্য এখানকার রোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়া। মন্ত্রী-পরিষদে যখন কোন খোরাসানী কর্মসচিব ও কর্মচারী থাকবে না, তখন তুর্কীরা এই লোকগুলোর অবিচারের কথা বুঝতে পারবে এবং তখন আমার এই কথাগুলো তাদের মনে পড়বে।

পূর্বে যদি কোন লোক কোন তুর্কীর কাছে প্রশাসক অথবা অন্য যে-কোন চাকরির জন্য আসত এবং সে যদি বলত যে, সে সুন্নীদের কোন এক শহর থেকে আগত এবং হানাফী অথবা শাফী সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহলে তাকে চাকরি দেওয়া হোত। কিন্তু সে যদি বলত যে, সে কুম, কাসান অথবা আবা (শিয়া-প্রধান জায়গা) থেকে আগত এবং শিয়াপন্থী, তাহলে তাকে চাকরি দেওয়া হোত না এবং বলে দেওয়া হোত, 'দূর হও, আমরা সর্পকে মেরে ফেলি, পালন করি না।' এমন কি, যদি টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য উপঢৌকনও দেওয়া হোত তাহলেও তুর্কীরা তাদেরকে নিত না বরং বলে দিত, 'নিরাপদে ফিরে চলে যাও। উপহারগুলো ফেরত নিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার কোর।' সুলতান তুঘরিল এবং আল্প আরসলান যদি কখনও শুনতেন যে একজন তুর্কী অথবা একজন আমীর তাঁর সামনে একজন রাফিদীকে ভর্তি করেছে তাহলে তার ভুলের জন্য তাকে কঠোর-ভাবে তিরস্কার করতেন।

একদা সুলতান আল্প্ আরসলান জানতে পারলেন যে, আরদাম জনৈক গ্রামের মোড়লকে তার কর্মসচিব নিযুক্ত করতে যাচ্ছে। শুনে তিনি খুব রাগান্বিত হলেন, কারণ ঐ গ্রাম্য মোড়ল বাতেনী দলের বলেই পরিচিত ছিল। তিনি দরবার-কক্ষে আরদামকে জিজ্ঞাসা করলেন

এবং বললেন, 'তুমি কি আমার দুশমন এবং দেশের শত্রু?' আরদাম শুনে ভয়ে থতমত খেয়ে বলল, 'হে প্রভু, এটা আপনি কি বলছেন? আমি ক্রীতদাসদের মধ্যে নগণ্যতম; নিজ কাজে এবং প্রভুর প্রতি আনুগত্য স্বীকারে আমি কি অন্যায় করেছি?' সুলতান বললেন, 'তুমি আমার শত্রু না হলে আমার শত্রুকে কেন চাকরি দিয়েছ?' আরদাম বলল, 'কে সেই ব্যক্তি?' তিনি বললেন, 'কে আবার—মোড়ল, যাকে তুমি কর্মসচিব নিযুক্ত করেছ।' সে বলল, 'সে কি অন্যায় করেছে? সে যদি একটা বিষধর সাপও হয় তাহলেই বা সে এ রাজ্যের কি করতে পারে?' সুলতান বললেন, 'যাও, লোকটাকে এখানে নিয়ে এস।' সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে আনা হোল। সুলতান তখন বললেন, 'হে দুরাচার, তুমি না বল যে বাগদাদের খলিফা ন্যায়পরায়ণ নয়? তুমি একজন রাফিদী নয়?' লোকটি বলল, 'হে প্রভু, আমি রাফিদী নই; আমি একজন শিয়া সম্প্রদায়ের লোক।' শুনে সুলতান বললেন, 'ওহে কুলাঙ্গার, শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি কি এমন ভাল দেখলে যার জন্য বাতিনী সম্প্রদায়ের উপরে যার সাফাই গাইছো? একটা খারাপ, অন্যটা আরো খারাপ।' তিনি লোকটাকে মারবার জন্য দণ্ডধারীদেরকে আদেশ দিলেন এবং তারা তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় প্রাসাদ থেকে বের করে দিল।

সুলতান তখন সম্ভ্রান্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই হতভাগার কোন অন্যায় ছিল না, একজন অবিশ্বাসীকে চাকরি দেওয়ার জন্য দায়ী আরদাম। আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, এদেশে আমরা বিদেশী, জোরপূর্বক আমরা এ দেশ দখল করেছি। আমরা সকলে গোঁড়া মুসলমান আর এই সমস্ত ইরাকী বিধর্মী এবং দাইলামের পক্ষভুক্ত লোক। আজ আল্লাহ্ তুর্কীদের সহায়ক হয়েছেন, কারণ তারা সকলে গোঁড়া মুসলমান এবং তারা অন্তঃসারশূন্যতা ও বিরোধী মতবাদকে সহ্য করে না।' তিনি তখন কতকগুলো ঘোড়ার বালামচি আনতে বললেন এবং তার থেকে আরদামকে একটি দিয়ে বললেন, 'এটা ছেঁড়।' আরদাম ছিঁড়ে ফেলল। তখন তিনি তাকে দশটি বালামচি দিলেন, কিন্তু এবারেও সে ছিঁড়তে সক্ষম হোল। কিন্তু যখন তিনি অনেকগুলো একত্র করে বললেন, 'এগুলো ছেঁড়।' আরদাম তখন আর ছিঁড়তে পারল না। তখন সুলতান বললেন, 'শত্রুদের বেলায়ও এরূপ ঘটে। দুই একজন থাকলে তাদেরকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু সংখ্যায় অনেক হলে আর ধ্বংস করা সম্ভব হয় না। এটাই হোল তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর, যেটা হোল, "এই হতভাগার

কি ক্ষমতা আছে এবং সে রাজ্যের কি করতে পারে''? তারা যদি এক এক করে তুর্কীদের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তাদের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে ও সব বিষয় জেনে নেয়, তাহলে সেই মুহূর্তেই ইরাকে বিদ্রোহ দেখা দিবে অথবা যদি দাইলামীরা এদেশ আক্রমণ করে, তবে তারা তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে তুর্কীদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে। তুমি একজন তুর্কী ও খোরাসানী সেনাদলের একজন অফিসার। তোমার শাসক, কার্যনবিস এবং কর্মচারীরা সকলেই খোরাসানী হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক তুর্কীরই স্বার্থের খাতিরে এটা করা উচিত। তুমি যদি তোমার শত্রুদের সঙ্গে কোন চুক্তি কর, তাহলে সেটা তোমার নিজের ও রাজার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ হয়। যদিও তুমি তোমার স্বার্থের জন্য কাজ করতে পার, কিন্তু রাজার পক্ষে সতর্কতা পরিত্যাগ করে কঠোরতা ত্যাগ করা এবং দেশদ্রোহীকে অব্যাহতি দেওয়া অসম্ভব। তোমাকে আমার রক্ষা করতেই হবে আর তুমি কি তখন আমাকে রক্ষা করবে, কারণ আল্লাহ্ তোমার কর্তা হিসাবে আমাকে সৃষ্টি করেছে, তোমাকে আমার কর্তা হিসাবে নয়। জেনে রাখ, যে রাজার শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে-ই রাজার শত্রু এবং যে ব্যক্তি চোর এবং দুষ্ট লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, তাকে তাদেরই একজন হিসাবে গণ্য করতে হবে।'

সুলতান যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন খাজা ইমাম মুশাত্তাব এবং কাজী ইমাম আবুবকর উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি যা বললাম, সেটা সম্পর্কে তোমাদের কি মতামত?' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ্ এবং রসূলের কথাই আপনি বলেছেন।'

তখন মুশাত্তাব বললেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, একদা হজরত মুহম্মদ (সঃ) হজরত আলীকে (রাঃ) বললেন, ''যদি তুমি রাফিদীদের কাউকে দেখ যে, সে ইসলামের অবমাননা করছে—তাহলে তাকে মেরে ফেলবে; কারণ তারা বহু ঈশ্বরবাদী''।'

কাজী আবুবকর বললেন, 'আবূ উমামা বর্ণনা করেছেন যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলতেন, ''সময় শেষ হলে একজন রাফিদীর আগমন ঘটবে। দেখতে পেলে তাকে মেরে ফেলবে''।'

তারপর মুশাত্তাব বললেনঃ 'সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাফিদীদেরকে বিধর্মী বলতেন এবং কোরআনের এই উক্তি উদ্ধৃত করতেন (কোরআনঃ ৪৮.২৯) ''অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারে...কারণ তারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে চটা।'' এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি

বলতেন, যে ব্যক্তি হজরত মুহম্মদের (সঃ) সাহাবাদেরকে আঘাত করে, সে-ই অবিশ্বাসী। আর হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলতেন, ''আল্লাহ্ আমাকে সাহাবা দিয়েছেন, পরামর্শদাতা দিয়েছেন, আর দিয়েছেন জ্ঞাতি। এদেরকে কেউ গালাগালি দিলে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানব জাতির অভিশাপ লাগবে। তাদের কোন তওবাই আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন না।'' আবুবকর সম্পর্কে আল্লাহ্ কোরআন পাকে বলেছেন, (কোরআন : ৯.৪০) ''দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, এবং সে তার সাথীকে বলল : দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সহায় রয়েছেন''।' (এর অর্থ—কেউ যদি আমাদের সাহায্য নাও করে তবু, হে আবুবকর, দুঃখ করো না, কেননা আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।)

কাজী আবুবকর বললেন : 'উকবা ইবনে আমীর বলেছেন যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলতেন, ''আমার পরে যদি কোন নবী আসতো তবে সে হতো উমর ইবনে আল-খাত্তাব''।'

মুশাত্তাব বললেন : 'জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) একবার এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি জানাজায় শরীক হলেন না। সকলে জিজ্ঞাসা করল, ''হে রসূলুল্লাহ্, আপনাকে ত পূর্বে কখনও জানাজার নামাজ বাদ দিতে দেখি নাই।'' তিনি জবাব দিলেন, ''সে ওসমানকে ঘৃণা করত, তাই আল্লাহ্ও তাকে ঘৃণা করে''।'

কাজী আবুবকর বললেন : 'আবূ দারদা বলেছেন যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) হজরত আলী সম্পর্কে বলতেন, ''যারা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারা দোজখের কুকুর স্বরূপ''।'

মুশাত্তাব বললেন : 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলেছেন যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলতেন, ''কাদারীদের ও রাফিদীদের জন্য ইসলামে কোন স্থান নাই''।'

কাজী আবুবকর বললেন : 'ইসমাঈল ইবনে সা'দ বলেছেন যে, হজরত (সঃ) বলতেন, ''কাদারীরা এই সম্প্রদায়ের পারসিক পুরোহিতস্বরূপ, তাদের অসুখ হলে দেখতে যেয়ো না আর তারা মারা গেলে জানাজায় যেয়ো না।'' আর রাফিদীরা সকলেই কাদারীদের মত একই মতাবলম্বী।'

মুশাত্তাব বললেন : উম্মে সালমা হজরত মুহম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বলেছেন : একদিন হজরত মুহম্মদ (সঃ) আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি

সময় হজরত আলী ও ফাতিমা তাঁকে দেখতে এলেন। রসূলুল্লাহ্ তাঁর মাথা উঁচু করে বললেন, 'হে আলী, তোমাদেরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছি, কারণ তুমি ও তোমার জ্ঞাতিরা বেহেশতে যাবে। কিন্তু তোমার পরে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের বলা হবে রাফিদী। তাদের যদি পরাভূত করতে পার তাহলে মেরে ফেলবে; কারণ তারা অবিশ্বাসী।' হজরত আলী বললেন, 'হে মহানবী, তাদের চিহ্ন কিরূপ থাকবে? মহানবী বললেন, 'তারা জুমার নামাজে হাজির হবে না, তারা জামাতেও নামাজ পড়বে না, আর জানাজার নামাজও পড়বে না। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের নিন্দা করবে।'

এই বিষয়ে কোরআনের ও হাদীসের আরও অনেক উক্তি আছে। সবগুলো একত্র করলে একটা বই হয়ে যাবে। সব ক্ষেত্রেই রাফিদীদের এই বৈশিষ্ট্য। বাতিনীরা কিন্তু রাফিদীদের চেয়েও খারাপ, তাই বুঝা যায় যে তারা কত নীচ। যে সময়েই তাদের আবির্ভাব হোক, তখনকার রাজার তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের থেকে দেশকে মুক্ত করা ছাড়া আর অন্য কোন অবশ্য-কর্তব্য থাকবে না।

খলীফা উমর (রাঃ) মদিনার মসজিদে বসেছিলেন। আবূ মসা আশ্আরী তাঁর সামনে বসে এত সুন্দর হাতের লেখায় ইস্পাহানের হিসাব দিতেছিলেন যে, যারা ঐ লেখা দেখেছিল সকলেই প্রশংসা করেছিল। আবূ মূসাকে জিজ্ঞাসা করা হোল, 'এই হাতের লেখা কার?' তিনি বললেন, 'আমার কর্মসচিবের লেখা।' সকলে বলল, 'কাউকে পাঠিয়ে তাকে আনা হোক, আমরা তাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'সে মসজিদের মধ্যে আসতে পারে না।' খলীফা উমর বললেন, 'তার কি তাহলে অজু নাই?' আবূ মূসা বললেন, 'না, সে একজন খ্রীস্টান।' হজরত উমর সঙ্গে সঙ্গে আবূ মূসার উরুতে এমন জোরে এক চড় দিলেন যে, মূসা ভাবলেন যে, তাঁর উরু ভেঙ্গে গেছে এবং তারপর বললেন, 'তুমি কি কোরআনের বাণী শোন নাই; (কোরআন: ৫.৫৬) 'হে বিশ্বাসিগণ, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোর না, কারণ তারা একে অপরের বন্ধু।' আবূ মূসা শুনে বললেন, 'এখনই আমি তাকে বরখাস্ত করে বিদায় করে দিচ্ছি।'

বন্ধুভাবাপন্ন শত্রুদের থেকে দূরে থাকা উত্তম;
বন্ধুভাবাপন্ন বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব উত্তম।

দুই প্রকারের লোক সম্পর্কে অসতর্ক হইও না।
শত্রুভাবাপন্ন বন্ধু এবং বন্ধুভাবাপন্ন শত্রু।

উপরোক্ত ঘটনার পর সুলতান আল্প্ আরসলান এক মাস ধরে আরদামের সঙ্গে কথা বলেন নি; শুধু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্ভ্রান্তরা মধ্যস্থতা করেছিলেন এবং তিনি পুনরায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এখন আমাদের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

খ্যাতনামা, বিদ্বান এবং সুন্নীদের বেকার রেখে অপরিচিত, নীচ কুলজাত এবং অমেধাবীদের চাকরি দেওয়া হলে এবং অপরাপর সকলে কোন চাকরি না পাওয়া সত্ত্বেও এক জনকে পাঁচ অথবা ছয়টা পদে নিযুক্ত করা হলে উজিরের অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতাই বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি দশ জনকে বেকার রেখে এক জনকে দশটা পদে নিযুক্ত করে, সে চরমতম শত্রুদের একজন। ঐ সমস্ত দেশে বহু লোক নিরাশ ও অলস হয়ে বসে আছে, তাদেরকে কোন কাজও দেওয়া হচ্ছে না, তাদের প্রতি কোন দৃষ্টিও দেওয়া হচ্ছে না; ফলে তারা এমন কাজে নিমগ্ন হতে পারে, যার ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। কিন্তু উজির যোগ্য ও শিক্ষিত হলে তিনি কখনও রাজার স্বার্থের হানি ঘটাতে চেষ্টা করবেন না। আর এটাই হোল তার নমুনা।

এখন সত্যিকারভাবে ঐরূপ একজন আছে যে দেশের ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে (সম্ভবতঃ নিজামুল মুলকের প্রতিযোগী তাজ আল মুলকের কথা বলা হয়েছে, যাকে মালিক শাহের স্ত্রী তুরকান খাতুন প্রেরণা দিয়েছিলেন)। সুযোগ পেলেই তিনি সুলতানের কাছে মিতব্যয়িতার কথা সুপারিশ করতেন। তিনি বলেন: দুনিয়ার কোথাও কোন শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই যে তার মোকাবেলা করতে পারে। বেতনের খাতা অনুসারে তাঁর অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল ৪,০০,০০০; কিন্তু তিনি ভাবতেন যে ৭০,০০০ অশ্বারোহীকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে যে-কোন জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করতে পারবেন। বাকী অশ্বারোহীদের বেতন বন্ধ করে দিলে তাতে অনেক মিতব্যয়িতা হবে, বছরে কয়েক হাজার দিনার বেঁচে যাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ধনাগার পূর্ণ হয়ে যাবে। সুলতান যখন এই কথাগুলো বলতেন, তখন আমি বুঝতে পারতাম কথাগুলো কার---এইগুলো সেই ব্যক্তির কথা যে দেশটাকে ধ্বংস করতে চায়। আমি উত্তরে বলতাম। 'আপনার আদেশই শিরোধার্য, তবে আপনি যদি ৪,০০,০০০ লোককে

বেতন ও ভাতা দেন তাহলে খোরাসান, ট্রান্স-অক্সিয়ানা, কাসঘার, বালাসাঘুন, খারাজম, নিমরুজ, ইরাক, পার্স, সিরিয়া, আজারবাইজান, আরমেনিয়া, আরান, এণ্টিওক, জেরুজালেম সবই আপনার অধীনে থাকবে। আপনার যদি ৪,০০,০০০-এর পরিবর্তে ৭,০০,০০০ লোক থাকতো তাহলে আরও ভাল হোত, কারণ আপনার লোকের সংখ্যা বেশী থাকলে রাজ্যের পরিধিও বড় হোত ; তখন সিন্ধু, ভারত, তুর্কীস্তান, চীন ও ম্যাচিন (ইন্দোনেশিয়া) আপনার অধীনে থাকত এবং আবিসিনিয়া, বারবেরী, রুম, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা আপনার প্রভাবান্বিত হোত। কারণ এক জন রাজার যতবেশী সৈন্য থাকে, তাঁর কর্তৃত্ব তত প্রসারিত থাকে। আর সৈন্যসংখ্যা যত কম থাকবে, রাজ্যের পরিধিও তত কম হবে। তাছাড়া আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ৪,০০,০০০ লোকের জায়গায় ৭০,০০০ লোক রাখলে বাকী ৩,৩০,০০০ লোকের নাম রেজিস্টারী বই থেকে তুলে ফেলতে হবে। এটা খুব স্পষ্ট যে ৩,৩০,০০০, ৭০,০০০-এর চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং ঐ ৩,৩০,০০০ লোক সকলেই অস্ত্রে পারদর্শী। এই সাম্রাজ্য থেকে কিছু পাবার আশা যখন তাদের আর থাকবে না, তখন তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। তারা তখন অন্য কারো অধীনে গিয়ে তাকেই তাদের নেতা মানবে। তারা তখন চারদিক থেকে আক্রমণ করে এমন বিশৃঙ্খলা লাগিয়ে দিবে যে, এত বছরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ সবই বিনষ্ট হবে এবং হয়ত তাতেও বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হবে না। কারণ দেশকে রক্ষা করা হয় মানুষ দ্বারা আর মানুষদের রাখা হয় অর্থ দ্বারা। যদি কেউ রাজাকে বলে, 'স্বর্ণ নেন, মানুষদের দিয়ে দেন' তাহলে সেই ব্যক্তি সত্যিই রাজার শত্রু এবং দেশ ধ্বংসের চেষ্টা করছে, কারণ শুধুমাত্র মানুষই স্বর্ণ সংগ্রহ করে। ঐ ব্যক্তির কথা কোনমতেই শোনা উচিত নয়।

বঞ্চিত ও নিঃস্ব বেসামরিক কর্মচারীদের ব্যাপারটাও ঠিক এইরূপ। যে সমস্ত লোক এই সাম্রাজ্যের জন্য অনেক মহৎ কাজ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেছে, তারা প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করেছে। রাজ-প্রাসাদ থেকেও তাদের কাজের পুরস্কার পেয়েছিল। তাই তাদের দাবীর প্রতি অমর্যাদা দেখান, তাদেরকে ধ্বংস, বঞ্চিত এবং নিঃস্ব করে দেওয়া এবং তাদেরকে বেকার অবস্থায় রাখা উচিতও নয় আর মনুষ্যত্বের কাজও নয়। তাদেরকে কোন চাকরি দিয়ে দিলে অথবা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী রুজী-রোজগারের বন্দোবস্ত করে দিলে কমপক্ষে তাদের কাজের পাওনা কিছু শোধ হবে এবং এই সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকবে। কিছু

লোক আছে যেমন চিকিৎসক, বিদ্বান, সম্ভ্রান্তগণ ও সাহসীরা—যাদের পাওনা ধনাগারে রয়েছে। তাদের কথা বিবেচনা করা ও তাদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত, কিন্তু তাদের কথা বিবেচনা করা হয় না। এই অবস্থায় যদি তাদেরকে তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাদের হক থেকে তাদেরকে করা হয় নিরাশ, তাহলে এমন এক সময় হয়ত আসবে যখন রাজার প্রতিনিধিরা অজ্ঞ এবং নির্দয় হওয়াতে এই সমস্ত ব্যক্তিকে কোন কাজ দিতে অবহেলা করবে, রাজার কাছে এই যোগ্য ব্যক্তিদের ব্যাপারগুলো ভালভাবে উপস্থাপিত করতে পারবে না এবং সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তাদের বেতন ও ভাতা দিতে ভুলে যাবে। সেই সময় এ সমস্ত লোক রাজ্য থেকে সব আশা-ভরসা হারিয়ে সরকারের প্রতি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। তারা তখন রাজা, রাজস্ব আদায়কারী অথবা তুর্কীদের সব রকম ভুল বের করতে চেষ্টা করবে। তখন তাদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ থাকবে, যার জমি-জমা, অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-সম্পদ এবং সৈন্য-সামন্ত থাকবে সে তাদের নেতৃত্ব দিবে এবং হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়ে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং সারা দেশে দেখা দিবে বিশৃঙ্খলা—ঠিক যেমন ঘটেছিল ফাখর আদ-দৌলার সময়ে।

ফাখর আদ-দৌলার কাহিনী

কথিত আছে যে, রায় শহরে ফাখর আদ-দৌলার সময়ে (যাঁর উজির ছিলেন বিখ্যাত সাহিব ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ) এক অগ্নি-উপাসক ধনী লোক ছিল। তার নাম ছিল বুজুরজুমিদ দিরু। সে তাবারিক পাহাড়ে নিজের জন্য একটি নিশ্চুপ দুর্গ তৈরী করেছিল (আকাশের দিকে মুক্ত ঝাঁঝরীযুক্ত দুর্গ, যার উপরে জরথুস্ত্রবাদীরা মৃত ব্যক্তিদের রেখে দিত) সেটা আজও বিদ্যমান আছে। এটাকে এখন বলা হয় সামরিক-প্রধানের সতর্ক পাহারা এবং ফাখর আদ-দৌলার গম্বুজের উপরে অবস্থিত। বুজুরজুমিদকে পাহাড়ের উপরে এই দোতলা দুর্গ তৈরী করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল, এবং অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানে জনৈক ওজন ও মাপের তদারককারী এক ব্যক্তি ছিল, তার নাম বাখির আসান। যেদিন দুর্গের নির্মাণ কার্য শেষ হোল সে কোন এক অজুহাতে দুর্গের চূড়ায় গিয়ে আজান দিল ফলে গম্বুজটা অপবিত্র হয়ে গেল। তার পর থেকে দুর্গটা সামরিক-প্রধানের সতর্ক পাহারা নামে পরিচিত হয়।

ফাখর আদ-দৌলার রাজত্বের শেষের দিকে এমনি ঘটল যে সংবাদবাহকরা খবর দিল, প্রত্যহ তিরিশ অথবা চল্লিশজন করে লোক শহর ছেড়ে দুর্গের উপরে গিয়ে উঠছে। সেখানে তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকত এবং তারপর শহরে ছড়িয়ে পড়ত। যদি তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করত কেন তারা সেখানে প্রত্যহ যাচ্ছে, তারা বলত আনন্দ উপভোগ করার জন্য। ফাখর আদ-দৌলা তখন ঐ সমস্ত লোককে এবং তাদের সঙ্গীদেরকে তাঁর সামনে আনতে হুকুম দিলেন। পারিষদবর্গ গিয়ে পাহাড়ে উঠে দুর্গের নীচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল। লোকগুলো তাদেরকে দেখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। তারা ফাখর আদ-দৌলার গৃহাধ্যক্ষকে একটা ক্ষুদ্র দলসহ দেখতে পেল। তারা ঐ দলকে উপরে উঠার জন্য মই পেতে দিল। উপরে উঠে তারা দেখতে পেল যে একটা দাবা খেলার ছক এবং পাশা খেলার ছক পাতা রয়েছে, সেখানে কলম, কালি ও কাগজ রয়েছে, একটা টেবিল-ক্লথের উপরে রয়েছে খাবার জিনিস আর রয়েছে একটা পানির কলসী ও মাদুর বিছানো। গৃহাধ্যক্ষ বলল, 'ফাখর আদ-দৌলা তোমাদেরকে ডেকেছেন।' লোকগুলোকে রাজার সামনে আনা হোল। তিনি তাদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন তারা কে এবং কেন প্রত্যেকদিন দুর্গের উপরে উঠে। তারা বলল যে, তারা প্রমোদ ভ্রমণ করছিল। তখন রাজা বললেন, 'প্রমোদ ভ্রমণ একদিন বা দু'দিন হতে পারে, কিন্তু এই গোপন কাজ তোমরা অনেক দিন ধরে করছো। আমার কাছে সত্য কথা বল।' তারা বলল, 'এটা ত গোপন করার মত কিছুই নয়; আমরা ডাকাত নই, আমরা হত্যাকারীও নই, আমরা দস্যুও নই, আমরা স্ত্রীলোক এবং শিশুদের প্রলুব্ধকারীও নই অথবা আমাদের কোন আপত্তিকর বা অযৌক্তিক কোন ব্যবহারের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে কেউ নালিশও করে নাই। আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা দেন, তাহলে আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি।' ফাখর আদ-দৌলা বললেন, 'আমি তোমাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার কথা দিচ্ছি' এবং এই মর্মে তিনি শপথ গ্রহণ করলেন।

তাদেরকে তাদের জীবনের নিশ্চয়তা দেওয়া হলে তারা বলল, 'আমরা একদল কর্মসচিব ও উচচ রাজকর্মচারী; যাদেরকে সরকারের হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং আপনার রাজত্বে বেকার রাখা হয়েছে। আমাদেরকে কোন কাজও দিচ্ছে না, আমাদের প্রতি কোন দৃষ্টিও দিচ্ছে না। আমরা শুনেছি যে, খোরাসানে মাহ্মুদ নামে একজন রাজার আবির্ভাব হয়েছে—যিনি বিদ্বান ও মেধাসম্পন্ন লোকদের সমাদর করেন এবং তাদের মেধার

অপচয় হতে দেন না। তাই এই দেশে সব আশা-ভরসা হারিয়ে তার উপর আস্থা স্থাপন করেছি। তাই প্রত্যেক দিন আমরা এই দুর্গের উপরে গিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাই ; দূর হতে কাউকে আসতে দেখলে তার কাছে আমরা মাহ্‌মুদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করি এবং সততই আমরা খোরাসানে আমাদের বন্ধুদের কাছে আমাদের অবস্থা জানিয়ে এবং খোরাসানে যাবার সঙ্গীদের খবরাখবর জানতে চেয়ে চিঠি এবং প্রস্তাব লেন-দেন করি। কারণ আমাদের সকলেরই পরিবার আছে এবং দুঃখে পতিত হয়েই নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে বিদেশে যাচ্ছি চাকরির খোঁজে। আমরা আমাদের অবস্থার বিশদ বর্ণনা করলাম, এখন আপনার যা আদেশ।'

কথাগুলো শুনে ফাখর আদ-দৌলা তাঁর উজির সাহিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি মত? আমাদের এখন কি করা উচিত?' সাহিব বললেন, 'আপনি তাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন ; তাছাড়া তারা সকলে শিক্ষিত, নামকরা এবং সম্মানী ; আমি তাদের কয়েকজনকে চিনি এবং কয়েকজন আমার আত্মীয় হয়। তাদের চাকরির ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি তাদের সকলের চাকরির বন্দোবস্ত করব এবং এ ব্যাপারে আগামী কালের মধ্যেই আপনাকে নিশ্চিন্ত করার ব্যবস্থা করব।' সঙ্গে সঙ্গে রাজা তাঁর গৃহাধ্যক্ষকে ঐ লোকগুলোকে সাহিবের বাড়ীতে পেঁীছিয়ে দিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। আদেশ অনুযায়ী কাজ করে গৃহাধ্যক্ষ ফাখর আদ-দৌলার প্রাসাদে ফিরে এল। লোকগুলো তখন জীবন-ভয়ে কাঁপছিল। তাদের ভয় হচ্ছিলো কি শাস্তি না জানি সাহিব তাদের দেয়। সাহিব রাজ-প্রাসাদ থেকে ফিরে তাদের দিকে একবার তাকালেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেলে একটা ভৃত্য এসে তাদেরকে অন্য একটা বেহেশতের ন্যায় সাজানো এবং দামী কার্পেট বিছানো কামরায় নিয়ে গেল। ভৃত্যটি তখন বলল, 'কামরাটি আপনাদেরই জন্য।' সঙ্গে সঙ্গে তারা ভিতরে গিয়ে আরাম করে গদীর উপরে বসল। তাদের জন্য শরবৎ আনা হোল ; শরবৎ খাওয়া শেষ হলে তাদের জন্য খাবার এল। খাওয়া শেষ হলে মদ আনা হোল। মদ খাওয়ার সময় চারণ কবিরা গান গাইতে লাগল। যে তিন জন ভৃত্য তাদেরকে দেখা-শুনা করছিল তারা ছাড়া অন্য কাউকে ঐ কামরায় ঢুকতে দেওয়া হয় নি এবং তাদের খবর বাইরে কেউ জানতেও পারে নি। এদিকে রাজা

শহরের পুরুষ ও মেয়েরা তাদের জন্য চিন্তিত ছিল আর তাদের ছেলে-মেয়েরা তাদের জন্য কাঁদছিল।

কিছুক্ষণ পরে সাহিবের একজন গৃহাধ্যক্ষ কামরায় ঢুকে বলল, 'সাহিব বললেন, আপনারা যেন মনে না করেন যে তাঁর বাড়ী একটা জেলখানা হয়েছে। আজ দিনের বেলা ও আজ রাত্রে আপনারা তাঁর মেহমান। যদি আপনাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকত তাহলে আপনাদেরকে এখানে পাঠানো হোত না। আপনারা আরাম করে বসুন, কারণ আগামীকাল সাহিব অফিস থেকে ফিরে এসে আপনাদের চাকরির বন্দোবস্ত করবেন।' সে তখন একজন দর্জি এনে বিশটি বুটিতোলা রেশমী কাপড়ের পোশাক ও বিশটি সিল্কের পাগড়ী তৈরী করার হুকুম দিল; সে বিশটি জিন লাগানো ও সজ্জিত ঘোড়ার কথাও বলে দিল। পরের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু প্রস্তুত ছিল। সাহিব সবাইকে ডাকলেন এবং প্রত্যেককে একটা করে পোশাক ও পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত করে সঙ্গে একটা সজ্জিত ঘোড়া দিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন রাজ-কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করলেন। কিছু লোককে অবসর-বৃত্তি দেওয়া হোল এবং সকলকেই কিছু না কিছু উপহার দেওয়া হোল। তারপর সকলকে সন্তুষ্ট করে যার যার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। পরের দিন তারা সকলে সাহিবের সঙ্গে দেখা করতে এলে সাহিব তাদেরকে বললেন, 'আপনারা এখন আর নালিশ করবেন না; মাহ্মুদের কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে আর চিঠিও লিখবেন না এবং আমাদের দেশের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা থেকে বিরত হন।'

এরপরে ফাখর আদ-দৌলার সঙ্গে সাহিবের দেখা হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ঐ লোকগুলোর জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহিব বললেন, 'জাহাঁপনা, আমি তাদের প্রত্যেককে সব সরঞ্জামসহ একটা করে ঘোড়া ও এক সেট কাপড় দিয়েছি এবং খরচের জন্য দিয়েছি টাকা। আর যখনই দেখেছি কোন লোক শাসন ব্যাপারে দুটো পদ অধিকার করে আছে তখন তার থেকে একটা পদ নিয়ে তাদের একজনকে দিয়েছি; এমনিভাবে তাদেরকে নিজ নিজ বাড়ীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তারা সকলেই সরকারী কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে।' ফাখর আদ-দৌলা সন্তুষ্ট হলেন এবং এই বলে তাঁর কাজের অনুমোদন করলেন, 'তুমি অন্য কিছু করলে সেটা ঠিক হোত না এবং তুমি এবার যা করলে কয়েক বছর আগে সেটা করলে তাদেরকে আমাদের শত্রুদের কাছে যেতে হোত না। এরপর থেকে কোন লোককে দুটো পদ দেওয়া হবে না, প্রত্যেকের

একটামাত্র পদ থাকবে যাতে সব উপযুক্ত আমলারা নিয়োজিত হতে পারে এবং প্রত্যেক পদের মর্যাদা বজায় থাকে। তাছাড়া একজনকে যখন দু'টি অথবা তিনটি পদ দেওয়া হয় তখন বহু যোগ্য লোকের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং বিদেশীরা ও সমালোচকরা বলবে যে আমাদের শহরে ও দেশে কাজের উপযুক্ত ভাল লোক নাই, কারণ আমরা একজন লোককে দু'টি পদে নিয়োগ করি। সুতরাং তারা সিদ্ধান্তে আসবে যে আমরা অযোগ্য। তুমি কি জান না যে, জ্ঞানী লোকেরা বলে থাকেন : ''সব কাজের জন্যই লোক আছেন।'' আমাদের দেশে উঁচু-নীচু এবং মধ্যম ধরনের পদ আছে এবং যোগ্যতা, জ্ঞান ও উপযুক্ততা অনুসারে প্রত্যেক কর্মচারী ও পেশাদার আমলাদেরকে একটা করে পদ দেওয়া উচিত। কারো একটা পদ থাকা সত্ত্বেও সে যদি আরেকটা পদ চায় তাহলে তার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত নয়। এইরূপ ব্যবস্থা হলে এই অন্যায় প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে এবং দেশ হবে উন্নত।'

আর রাজস্ব আদায়কারীরাই রাজ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং সব রাজস্ব আদায়কারী ও কর্মচারীর প্রধান হোল উজির। উজির দুর্নীতি-পরায়ণ হলে এবং ন্যায়পরায়ণ না হলে রাজ-কর্মচারীরাও তাঁর মত হবে বা তাঁর চেয়ে খারাপ হবে। একজন রাজ-কর্মচারী তাঁর কাজে খুব নিপুণ হতে পারেন, তিনি একজন কর্মসচিব হতে পারেন, তিনি একজন হিসাব-রক্ষক অথবা এমন একজন ব্যবসায়ী হতে পারেন সারা দুনিয়ায় যাঁর কোন তুলনা হয় না, কিন্তু তিনি যদি একটা খারাপ সম্প্রদায়ের বা গোত্রের লোক হন যেমন ইহুদী, খ্রীস্টান অথবা জরথুস্ত্রবাদী তাহলে তিনি মুসলমানদের অবজ্ঞা করবেন এবং রাজস্ব ও হিসাবের অজুহাতে তাদেরকে বিপদে ফেলবেন। ঐ অবিশ্বাসীর দ্বারা যদি মুসলমানরা অত্যাচারিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে যদি নালিশ করা হয় তাহলে তাকে অবশ্যই বরখাস্ত করতে হবে এবং শাস্তি দিতে হবে। কারুরই কখনও তার পক্ষসমর্থকদের কথায় কান দেওয়া উচিত নয়। পক্ষসমর্থকরা হয়ত বলতে পারে যে, তার মত কর্মসচিব অথবা হিসাব-রক্ষক দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নাই ; তারা হয়ত বলতে পারে যে তাকে পদচ্যুত করলে সব কাজই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার স্থান দখল করার মত আর কেউ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা কথা এবং এগুলোতে কিছুতেই কান দেওয়া উচিত নয়। আর ঐ লোককে বাদ দিয়ে অন্য লোককে রাখা আবশ্যক, যেমন করে খলীফা হযরত উমর (রাঃ) একবার করেছিলেন।

হজরত উমর (রাঃ) ও ইহুদী রাজস্ব আদায়কারীর গল্প

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সময়ে বাগদাদ, ওয়াসিত, হিত, আনবার, বাসরা এবং খুজিস্তান জেলা অঞ্চলে এক ইহুদী রাজস্ব আদায়কারী ছিল। একবার ঐ অঞ্চলসমূহের লোকেরা খলিফা উমরের কাছে সেই রাজস্ব আদায়কারীর বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্রে নালিশ করল। তারা লিখল, 'এই লোকটা রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে আমাদের প্রতি উপহাস করছে। আমরা এটা আর সহ্য করতে পারি না। অন্য কোন উপায় না থাকলে আমাদের এখানে একজন মুসলমান রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করুন। আমাদের একই ধর্মাবলম্বী হলে সে হয়ত তার কর্তৃত্বের সীমা ছাড়িয়ে যাবে না এবং আমাদের প্রতি অত্যাচারও করবে না। আর সে যদি সেটা করেই তাহলেও আমরা একজন ইহুদীর চেয়ে একজন মুসলমানের হাতে অপমান হতে বেশী পছন্দ করব।' দরখাস্তখানা পড়ে উমর (রাঃ) বললেন, 'একজন ইহুদীর জন্য কি দুনিয়াতে বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়? সে কি মুসলমানদের উপরেও অগ্রাধিকার চায়?' তিনি তৎক্ষণাৎ সাদ ওয়াক্কাসকে চিঠি লিখে দিতে হুকুম করলেন যেন তিনি ইহুদীকে বরখাস্ত করে একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করেন।

চিঠি পেয়ে সাদ ওয়াক্কাস ইহুদী রাজস্ব আদায়কারীটিকে কুফাতে আনতে অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দিলেন এবং পারস্য প্রদেশের সব মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীকেও আনবার জন্য পাঠালেন। ইহুদী ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীরা এসে পৌঁছল। তদন্ত করে দেখা গেল আরবদের কেউ ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত নয় এবং পারসী মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে কেউ ইহুদী রাজস্ব আদায়কারীর মত যোগ্যতাসম্পন্ন নেই অথবা রাজস্ব আদায় করা, দেশ উন্নত করা, লোকের সঙ্গে লেন-দেন করা এবং বকেয়া আদায় সংক্রান্ত কোন কিছুই কারো জানা নাই। সাদ ওয়াক্কাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। প্রয়োজনের তাগিদে ইহুদীকে নিযুক্ত রেখে তিনি খলীফাকে লিখলেন, 'আমি আপনার আদেশ মত ইহুদীটিকে এবং আরব ও পারস্যের সব রাজস্ব আদায়কারী ও কর্মচারীদের ডেকেছিলাম। কিন্তু আরবদের মধ্যে কাউকে পাওয়া গেল না যে পারস্যের ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকেফ্‌হাল আছে এবং এমন কাউকে পেলাম না যে সে ইহুদীর ন্যায় রাজস্ব আদায় ও শাসন ব্যবস্থায় পারদর্শী। তাই আমি ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়া রোধ করতে তাকে তার পদে অধিষ্ঠিত রাখতে বাধ্য হয়েছি। আপনার কি আদেশ?'

চিঠি পেয়ে খলীফা উমর (রাঃ) বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, 'এটা খুবই বিস্ময়ের কথা যে একটা লোক আমার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে আমার আদেশ অমান্য করেছে।' তিনি কলম নিয়ে চিঠিখানার উপরিভাগে লিখলেন, 'ইহূদীটা মরে গেছে!' এবং সেটা সাদ ওয়াক্কাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই মরতে হবে এবং ঐ রাজস্ব আদায়কারীও মৃত্যুর কবলে পতিত হতে পারে। আর একজন রাজস্ব আদায়কারী মরে গেলে অথবা তাকে বরখাস্ত করলে তার কাজ কখনও পড়ে থাকতে পারে না। তাই এখনই তোমার অন্য কাউকে নিয়োগ করা উচিত; তুমি এত দুর্বল ও অসহায় কেন? মনে কর যে ইহূদীটি মরে গেছে।' সাদ চিঠিখানা পেয়ে তাতে খলীফা উমরের মন্তব্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে ইহূদীটিকে পুনরায় ডেকে এনে তাকে বরখাস্ত করলেন এবং তার জায়গায় একজন মুসলমানকে নিয়োগ করলেন। এক বছর পরে দেখা গেল যে, মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীটি সেই ইহূদীর চেয়েও দক্ষতার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করেছে---একই পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়েছে, কৃষকরা সন্তুষ্ট ছিল এবং জনকল্যাণমূলক কাজও বেড়েছিল। সাদ ওয়াক্কাস তখন আরবের সম্ভ্রান্তদের বললেন, 'খলিফা উমর কত মহান। ঐ ইহূদী সম্পর্কে আমরা তাঁকে এক লম্বা চিঠি লিখেছিলাম। তিনি তার উত্তর দিয়েছিলেন মাত্র দু'টি শব্দে আর তিনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য হয়েছে—আমরা যা ভেবেছিলাম তা নয়।'

দুই ব্যক্তি দু'টি প্রবাদ বলেছেন। দুটোই প্রশংসিত হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আরবদের কাছে ও অ-আরবদের কাছে প্রবাদ হিসাবে প্রচলিত থাকবে। একটা ছিল খলীফা উমরের ঐ কথাগুলো। 'ইহূদীটা মরে গেছে!' কখনও কোন রাজস্ব আদায়কারীকে অথবা অন্য কোন কাজে বিশেষ পারদর্শী অথচ অত্যাচারী এবং অবিচারক অথবা বিধর্মী কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে ইচ্ছা করলে তাকে কিছু লোক এই বলে সমর্থন করবে, 'তাকে বরখাস্ত কোর না, কারণ সে একজন ভাল কর্মচারী এবং সুচতুর কর্মচারী; তার চেয়ে ঐ কাজ আর কেউ ভাল জানে না' ইত্যাদি। এই অবস্থায় শাসকের তখনই বলা উচিত, 'ইহূদীটা মরে গেছে।' এই কথাগুলোর দ্বারা তাদের সব যুক্তি-তর্ক খণ্ডিত হয়ে যাবে এবং রাজস্ব আদায়কারীও বরখাস্ত হয়ে যাবে। মহানবী হজরত মুহম্মদ (সাঃ) ইন্তিকাল করলে তাঁর সাহাবাদের মধ্যে কারো বলতে সাহস হয়েছিল না যে তিনি মরে গেছেন। হজরত আবু বকর খিলাফতে আরোহণ করে

ঘোষণা করে দিলেন, 'তোমরা যদি হজরত মুহম্মদের (সঃ) আরাধনা করে থাক, তিনি মারা গেছেন, আর যদি হজরত মুহম্মদের আল্লাহ্‌র আরাধনা করে থাক, তাহলে তিনি জীবিত আছেন এবং চিরকালই থাকবেন। তিনি কোন-দিনই মরেন নাই এবং মরবেনও না।' মুসলমানরা সকলে এই উক্তি অনুমোদন করল এবং আরবদের মধ্যে এটা প্রবাদে পরিণত হোল। তাদের উপর কোন দুর্যোগ নেমে এলে অথবা কোন নিকটতম কেউ মারা গেলে তারা ঐ শোক ও বিলাপের বোঝা কমাতে গিয়ে বলত, 'মুহম্মদ মরে গেছে! কারণ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে যদি একজন মাত্র মানুষের না মরা সম্ভব হোত, তাহলে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি হতেন হজরত মুহম্মদ (সঃ)।

আমাদের আগের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

আমরা বলেছি যে, রাজস্ব আদায়কারীরা ও তাদের কার্যাদি উজিরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভাল উজির থাকলে রাজার সুনাম ও চরিত্র-বল বৃদ্ধি পায় আর যে সমস্ত রাজার নাম কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে তাদের সকলেরই ভাল উজির ছিল। শুধু তাই নয়, নবীদের বেলায়ও সেটা প্রযোজ্য। বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসাবে সোলায়মানের (আঃ) ছিল আসাফ ইবনে বারখিয়া, মূসার (আঃ) ছিল তাঁর ভাই হারুন, ঈসা (আঃ)-এর ছিল সিমন আর হজরত মুহম্মদের (সঃ) ছিল আবুবকর (রাঃ)। বড় বড় রাজাদের মধ্যে কায়খসরুর ছিল গাউদার্জ, মানুচিহরের ছিল সাম, আফ্রাসইয়াবের ছিল পিরান উইজা, গুসতাশের ছিল জামাস্প, রুস্তমের ছিল জাওয়ারা, বাহরাম গুরের ছিল খুরারুজ এবং নওশেরওয়াঁর ছিল বুজুর্চমিহর; আর আব্বাসীয় খলীফাদের তেমনি ছিল বার্মাসিদরা, সামানীদের ছিল বালামিজরা, সুলতান মাহ্‌মুদের ছিল আহমদ ইবনে হাসান, ফাখর আদ-দৌলার ছিল সাহিব ইসমাঈল ইবনে আব্বাস, সুলতান তুঘরিলের ছিল আবু নাসের কুন্দুরী, আল্প আরসলান এবং মালিক শাহের নিজাম উল-মুলক—এইরূপ আরো অনেক।

উজিরের প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস থাকা দরকার আর তাঁকে হানাফী অথবা শাফী মাজহাবের হতে হবে। তাছাড়া তাঁকে যোগ্য, সুচতুর ও ভাল লেখকও হতে হবে এবং রাজার খুব অনুগত থাকতে হবে। আর যদি তিনি নিজে উজিরের ছেলে হন তাহলে আরো ভাল। কারণ আর্দাসির বাবাকানের সময় থেকে ইয়াজদিজিরড ইবনে শাহরিয়ার (পারস্য রাজাদের শেষ ব্যক্তি) সময় পর্যন্ত উজির হতে হলে উজিরের ছেলে হওয়া প্রয়োজন ছিল যেমনি ছিল রাজার ছেলে রাজা হওয়ার নিয়ম। পারস্যের

রাজাদের থেকে রাজত্ব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উজিরদেরও উজারতি চলে যায়।

সোলায়মান ইবনে আবদুল মালিক এবং জাফর ইবনে বারমাকের গল্প

(তারিখে বারামিকা বইতে এই ধরনের একটা গল্প আছে, কিন্তু সেখানে উজির বারমাক—জাফর নয়।)

কথিত আছে যে, একদা সোলায়মান ইবনে আবদুল মালিক তাঁর অমাত্যবর্গ এবং বন্ধুদের উপস্থিতিতে বিচারে বসেছিলেন। বিচার চলাকালে খলীফা নিম্নোক্ত উক্তি করলেন: 'আমার সাম্রাজ্যের পরিধি সোলায়মান ইবনে দাউদের চেয়ে বড় না হলেও ছোট নয়। তবে তাঁর বাতাস, দৈত্য-দানব, জিন-পরী এবং জীব-জানোয়ারের উপর কর্তৃত্ব ছিল—যেটা আমার নাই। কিন্তু সম্পত্তি, জাঁকজমকপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম, ভৌগোলিক-সীমারেখা, সামরিক-শক্তি ও ক্ষমতায় দুনিয়াতে এখন আমার সমান কেউ আছে বা পূর্বে কেউ ছিল কি? আমার এই রাজ্যে এমন কিছুর অভাব আছে কি—যা আমার থাকা উচিত ছিল?' একজন সভাসদ তাঁকে বললেন, 'একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস যা পূর্বে সকল রাজাদের ছিল এবং দেশের প্রয়োজন আছে, সেটা আপনার নাই।' সোলায়মান জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা কি জিনিস?' তিনি বললেন, 'আপনার তুলনায় যোগ্য উজির আপনার নাই।' সোলায়মান জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে?' উক্ত ব্যক্তি বললেন, 'আপনি রাজা, রাজবংশে আপনার জন্ম; তাই আপনার উজিরও এমন ব্যক্তি হওয়া উচিত যাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন উজির এবং তিনি নিজে মেধাবী ও ভাগ্যবান।' সোলায়মান বললেন, 'তোমার বর্ণনাগত দুনিয়াতে কোন উজির আছে কি?' তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আছে।' সোলায়মান আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?' তিনি বললেন, 'বাল্খে আছে।' সোলায়মান জানতে চাইলেন, 'সে কে?' তিনি বললেন, 'জাফর ইবনে বারমাক, যাঁর পূর্বপুরুষরা আর্দাসির বাবাকান থেকে উজিরের পদ দখল করে আসছেন। বাল্খের নিকটে নাওবাহারে যে অগ্নিমন্দির আছে সেটা ঐ পরিবারের ধর্মীয় মানত হিসাবে আছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর যখন পারস্য-রাজাদের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে, তখন বারমাকের পূর্বপুরুষরা বাল্খে বসতি স্থাপন করেন এবং পরে সেখানেই বাস করতে থাকেন। উজিরের পদ তাঁদের

পরিবারে বংশানুক্রমে চলে আসছিল এবং উজিরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত বই তাঁদের কাছে ছিল। তাঁদের ছেলেরা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখলে তাঁদেরকে ঐ সমস্ত বই পড়তে দেওয়া হোত আর এভাবে ছেলেরা পিতার গুণাবলী আয়ত্ত করে নিত। আপনার উজির হবার জন্য জাফরই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সে সম্পর্কে আপনিই ভাল জানেন।' তথাপি উমাইয়া ও মারওয়ানীদের মধ্যে সোলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের চেয়ে বড় এবং বেশী শক্তিশালী শাসনকর্তা আর কেউ ছিলেন না।

এই কথা শুনে তিনি জাফর ইবনে বারমাককে বাল্খ থেকে এনে উজিরের পদ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি ভাবলেন, হয়ত সে এখন অগ্নিপূজক না-ও থাকতে পারে এবং পরে তিনি অনুসন্ধান করে যখন জানতে পারলেন যে মুসলমান পরিবারেই তাঁর জন্ম, তখন তিনি খুব আনন্দিত হলেন। তিনি বাল্খের শাসনকর্তাকে এই নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখলেন যে তিনি যেন জাফরকে দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে পাঠাতে যদি ১,০০,০০০ দিনারও খরচ হয় তাহলেও তাকে পূর্ণ মর্যাদা সহকারে রাজধানীতে পাঠাতে হবে।

যা-ই হোক, জাফরকে দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। আসার পথে প্রতি শহরে সম্ভ্রান্তরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল এবং তাঁর প্রতি খুব আতিথেয়তা দেখাল। তিনি দামেশ্‌কে এসে পেঁাছলে সোলায়মান নিজে ছাড়াও তাঁর রাজ্যের বড় বড় রাজ-কর্মচারীরা সকলে এল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। যতদূর সম্ভব জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁকে শহরে এনে একটা সুন্দর রাজকীয় বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হোল। তিন দিন পরে তাঁকে সোলায়মানের দরবারে হাজির করা হোল। তিনি যখন প্রাসাদের মধ্যে ঢুকছিলেন তখন প্রথম দর্শনেই সোলায়মান তাঁর চেহারায় সন্তুষ্ট হলেন। জাফর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলে গৃহাধ্যক্ষরা আস্তে আস্তে তাঁকে নিয়ে গেল সিংহাসনের দিকে এবং তাঁকে সিংহাসন দেখিয়ে দিয়ে তারা সরে পড়ল। আর যখনই জাফর আসনে বসলেন, সোলায়মান তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং ভ্রূকুটি করে রাগের সঙ্গে বললেন, 'আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও!' গৃহাধ্যক্ষরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল এবং ঝাপটা মেরে বের করে দিল। কারণটা কেউ জানত না। তবে পরে জোহরের নামাজ বাদ পারিষদবর্গের সম্মিলিত এক পানের আসরে সাধারণভাবে আমোদ স্ফূর্তি করা হোল।

পরে সোলায়মানের মেজাজ শান্ত হলে জনৈক সভাসদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি জাফরকে বাল্‌খ থেকে মর্যাদা ও পূর্ণ আড়ম্বরের সঙ্গে আনলেন বড় এক পদ দেবার জন্য। তাকে আপনার সামনে আনলে প্রথম দৃষ্টিতেই আপনি তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। এর পিছনে কি কারণ ছিল? আমরা দেখে অবাক হয়ে গেছি।' সোলায়মান বললেন, 'সে যদি সম্ভ্রান্ত বংশীয় না হোত এবং বহুদূর থেকে যদি না আসত তাহলে আমি তখনই তাকে সেখানে ফাঁসি দিতাম; কারণ তার কাছে মারাত্মক বিষ ছিল এবং সে আমার সঙ্গে প্রথমবার দেখা করতে এসেই উপহার হিসাবে বিষ এনেছে!' সম্ভ্রান্তদের একজন বলল, 'আপনার আদেশ পেলে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতাম তার কি বক্তব্য, সে অন্যায় স্বীকার করে, না অস্বীকার করে।' তিনি বললেন, 'জিজ্ঞেস করে দেখতে পার'। সে তখন সেখান থেকে উঠে গিয়ে জাফরের কাছে গেল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল। 'আপনি যখন আজ সোলায়মানের সামনে গিয়েছিলেন তখন কি আপনার সঙ্গে বিষ ছিল?' তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ ছিল, এখনও আছে এবং আমার আংটির পাথরের নীচে আছে। এইরূপ আংটি আমার পূর্বপুরুষদের সকলের ছিল এবং এটা পেয়েছি আমি আমার পিতার কাছ থেকে। আমি এবং আমার পূর্বপুরুষেরা এই আংটি দ্বারা কারো এতটুকু ক্ষতি সাধন করেন নি। বরং এটা আমরা রাখি বিজ্ঞতা ও সাবধানতার খাতিরে; কারণ আমার পূর্ব পুরুষেরা অর্থাভাবে বহুবার বহু কষ্ট ভোগ করেছেন এবং আমার ব্যাপারেও সোলায়মান যখন আমাকে ডেকেছেন তখন আমি সত্যিকারভাবে জানতাম না যে কি জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, যদি তিনি আমার কাছে ধনাগারের তালিকা চেয়ে বসেন অথবা অন্য কোন কিছু দাবী করেন এবং আমি সেগুলো পূর্ণ করতে না পারলে তিনি যদি আমার প্রতি কোন রকম অত্যাচার করেন যা আমার পক্ষে অসহ্য তখন আমি দাঁত দিয়ে আংটির পাথর খুলে বিষটা গিলে ফেলবো যাতে অত্যাচার ও দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।'

এই যুক্তি শুনে উক্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সোলায়মানের কাছে গিয়ে সব বলল। তিনি শুনে জাফরের বিজ্ঞতা, সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করে অবাক হয়ে গেলেন; তাঁর আর কোন সন্দেহই রইলো না এবং তিনি তাঁর ব্যাখ্যা মেনে নিলেন। তখন তিনি সব সম্ভ্রান্তদের তাঁর নিজস্ব ঘোড়া নিয়ে জাফর যে কামরায় আছেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে সসম্মানে মর্যাদার সঙ্গে দরবারে আনতে হুকুম দিলেন। পরের দিন তাই করা হোল। জাফর

সোলায়মানের সামনে এলে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাঁর পথভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন। তিনি নিজে তাঁকে বসালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উজিরের পোশাক পরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর উপস্থিতিতে কতকগুলো সরকারী দলীলপত্রে সই করানোর জন্য জাফরের সামনে কালির দোয়াত রাখলেন। সোলায়মানকে ঐ দিনের ন্যায় উৎফুল্ল আর কখনও দেখা যায় নি। বিচার শেষ হলে তিনি পান-ভোজনের এক আসরের বন্দোবস্ত করলেন এবং আসর-কক্ষ স্বর্ণ, মণি-মুক্তা এবং স্বর্ণখচিত কার্পেট দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত করে-ছিলেন যে পূর্বে কখনও আর ঐরূপ দেখা যায় নি।

পানাহার শুরু হলে এক সময় জাফর সোলায়মানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর এত হাজার লোকের মধ্যে কি করে আপনি বুঝতে পারলেন যে আমার কাছে বিষ ছিল?' সোলায়মান বললেন, 'আমার কাছে আমার ধনাগার ও আমার সব বিষয় সম্পত্তির চেয়েও মূল্যবান একটা জিনিস আছে যেটা ছাড়া আমি কোথাও যাই না। জিনিসটা কয়েকটা পুঁতিমাত্র। দেখতে এক রকম মণি-বিশেষ; কিন্তু সত্যিকারভাবে সেটা নয়। আমি রাজ-ধনাগার থেকে সেটা জোগাড় করেছিলাম এবং আমি সেটা আমার হাতে বেঁধে রাখি। তাদের ধর্ম হোল কোথাও বিষ থাকলে সেটা কোন লোকের সঙ্গেই হোক, কোন খাবারের সঙ্গেই হোক আর মদের সঙ্গেই হোক এবং তার গন্ধ তাদের কাছে পৌঁছলেই সঙ্গে সঙ্গে তারা একে অন্যকে আঘাত করে অস্থিরভাবে নড়তে থাকে। তখন আমি বুঝতে পারি যে কামরায় কোথাও বিষ আছে এবং তার থেকে সাবধান হবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করি। তুমি কামরায় প্রবেশ করতেই পুঁতিগুলো নড়তে শুরু করে; তুমি যতই নিকটে আসছিলে তারা ততই দ্রুতবেগে নড়ছিল আর তুমি আমার সামনে বসে পড়লে তারা খটখট শব্দ করতে শুরু করল। আমার কোন সন্দেহই রইল না যে তোমার কাছে বিষ আছে এবং তুমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হোত তাহলে আমি তাকে জীবন্ত ছেড়ে দিতাম না। তোমাকে যখন তারা ধরে নিয়ে গেল তখন পুঁতিগুলোও শান্ত হোল কিন্তু তোমাকে প্রাসাদ থেকে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের নড়া-চড়া থামে নি।' তখন তিনি হাতের বেষ্টনী থেকে পুঁতিগুলো খুলে জাফরকে দেখালেন এবং বললেন, 'তুমি কি কখনও এর চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু দেখেছ?' জাফর এবং অন্যান্য সকলে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। তখন জাফর বললেন, 'আমার জীবনে আমি দুটো অতুলনীয় পাথর দেখেছি, তার মধ্যে একটা আপনি দেখালেন আর দ্বিতীয়টি দেখেছি তাবারিস্তানের

রাজার কাছে।' সোলায়মান জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা কি ছিল? আমাকে বল, আমি শুনতে চাই।'

জাফর নিম্নোক্ত গল্প বললেন: আমাকে দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে আপনার আদেশ বাল্‌খের শাসনকর্তার কাছে পৌঁছলে আমি রওয়ানা হবার জন্য সব জিনিসপত্র বেঁধে নিলাম এবং আপনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। নিশাপুর থেকে তাবারিস্তানের পথে রওনা হলাম, কারণ সেখানে আমার কিছু জিনিসপত্র ছিল। তাবারিস্তানে পৌঁছলে সেখানকার রাজা এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং আমাকে আমুল শহরের প্রাসাদে নিয়ে আপ্যায়ন করলেন। প্রত্যহ রাজা ও আমি একত্রে খেতাম, বসে বসে গল্প করতাম এবং প্রত্যেকদিন বিভিন্ন জায়গাতে বেড়াতাম। এক দিন এক উৎফুল্ল মুহূর্তে তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি কি কখনও সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছেন?' আমি বললাম, 'না আমি যাই নি।' তিনি তখন বললেন, 'আগামীকল্য আপনাকে আমার সঙ্গে সমুদ্র ভ্রমণে যেতে দাওয়াত করছি।' আমি উত্তর দিলাম, 'আপনার যা মর্জি।' তিনি নৌকার মাঝিদের নৌকা তৈরী করে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হুকুম দিলেন। পরের দিন রাজা আমাকে সমুদ্রের নিকটে নিয়ে গেলেন এবং আমরা এক নৌকায় চড়ে বসলাম। চারণ কবিরা সুর ধরল এবং নৌকার মাঝিরা আমাদেরকে সমুদ্রের দিকে বেয়ে নিয়ে চলল আর মদ পরিবেশকরা সব সময়ই আমাদেরকে মদ ঢেলে দিতে লাগল। রাজা ও আমি খুব কাছাকাছি বসেছিলাম; আমাদের মাঝখানে কেউ ছিল না। রাজার হাতে ছিল একটি আংটি যার পাথরটি ছিল অতি মনোরম—একটা লাল চুনি যা আমি কখনও দেখি নাই। ওটা এত দীপ্তিময় ছিল যে, তার থেকে আমি চোখ আর তুলতে পারি নাই।

রাজা যখন দেখতে পেলেন যে আমি সব সময়ই আংটিটার দিকে তাকাচ্ছি, তখন তিনি সেটা হাত থেকে খুলে আমাকে দিলেন। আমি তাঁর প্রতি মাথা নত করলাম এবং তারপর আংটিটাকে চুম্বন করে তাঁকে ফেরত দিয়ে দিলাম। রাজা সেটা তুলে নিয়ে আবার আমাকে দিয়ে বললেন, 'আমার হাত থেকে যে আংটি উপহারস্বরূপ চলে গেছে সেটা আর আমার হাতে আসতে পারে না।' আমি বললাম, 'এই আংটিটা আপনার হাতেই একমাত্র শোভা পায়।' এবং সঙ্গে সঙ্গে আংটিটা তাঁকে ফেরত দিলাম। রাজা পুনরায় আংটিটা আমাকে দিয়ে দিলেন। আংটিটার এত বেশী সৌন্দর্য ও মূল্য বিবেচনা করে আমি বললাম, 'আপনি নেশার ঘোরে এই কথা বলছেন, আপনি শান্ত হয়ে এর জন্য অনুশোচনা

করেন এবং বিপদে পতিত হন, সেটা আমি চাই না।' আমি আংটিটা আবার রাজার কাছে ফেরৎ দিলাম। রাজা ওটা নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওহ্, কি দুঃখের কথা! আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে রাজা আর তাঁর হাতে আংটিটা পরবেন না এবং ওটা সমুদ্রে ফেলে দিবেন, তাহলে আমি ওটা নিয়ে নিতাম; কারণ ঐ রকম চুনি আমি আর কখনও দেখি নাই।' রাজা বললেন, 'আপনাকে আমি ওটা কয়েকবার দিয়েছি; আমি যখন দেখলাম যে ওটার উপরে আপনার নজর পড়েছে, তখন আমি হাত থেকে খুলে আপনাকে দিয়ে দেই, যদিও আমার কাছে আংটিটা খুব সুন্দর লাগত এবং যদি আমার কাছে আপনি আংটির চেয়ে বেশী মূল্যবান না হতেন তাহলে ওটা আমি আপনাকে দিতাম না। ওটা গ্রহণ না করা আপনার অন্যায় হয়েছে। এখন যেহেতু আমি ওটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি, আপনি দুঃখিত হয়েছেন। যা-ই হোক, আমি হয়তো আপনার জন্য ওটা ফেরত পাবার ব্যবস্থা করতে পারি।' তিনি তখন একটা ভৃত্যকে বললেন, 'একটা ছোট নৌকা নিয়ে পাড়ে ফিরে যাও। পাড়ে নেমে একটা ঘোড়া নিয়ে দ্রুতবেগে প্রাসাদে গিয়ে কোষাধ্যক্ষকে বলবে মনি-মুক্তা রাখবার একটা বিশেষ রূপার পাত্র আছে সেটা দিতে এবং পাত্রটা সঙ্গে করে অতি তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসবে। ভৃত্যটিকে পাঠানোর পূর্বে তিনি নৌকার মাঝিকে পুনরায় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ জায়গায়ই নৌকা রাখতে বললেন। আদেশমত মাঝিও নৌকা ওখানেই রাখল। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভৃত্য পাত্রটা নিয়ে এসে রাজার সামনে রাখল—ততক্ষণ আমরা মদ খেয়েই চলছিলাম। রাজা তাঁর কোমরে গচ্ছিত একটা ব্যাগ থেকে একটা রূপার চাবি বের করে সেটা দ্বারা পাত্রটা খুলে একটা স্বর্ণনির্মিত মাছ বের করলেন এবং সেটাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। মাছটা অদৃশ্য হয়ে পানির নীচে চলে গেল।' কিছুক্ষণ পরে মাছটা আংটিটা মুখে নিয়ে পানির উপরে ভেসে উঠল। রাজার আদেশে সঙ্গে সঙ্গে একজন মাঝি একটা ছোট নৌকা নিয়ে ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আংটিটাসহ মাছটাকে তুলে নিয়ে রাজার সামনে এনে রাখল। মাছের মুখ থেকে আংটিটা নিয়ে রাজা আমাকে দিলেন। আমি মাথা নত করে আংটিটা তুলে নিয়ে হাতে পরে নিলাম। আর রাজা মাছটাকে পুনরায় পাত্রের মধ্যে রেখে সেটার তালা বন্ধ করে চাবিটা আবার তাঁর ব্যাগের মধ্যে রাখলেন।

কথা বলার সময় জাফরের হাতে আংটিটা ছিল। তিনি সেটাকে হাত থেকে খুলে সোলায়মানের সামনে রেখে বললেন, 'হে প্রভু, এই সেই আংটি।' সোলায়মান তুলে নিয়ে আংটিটা দেখলেন এবং তারপর তাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'তোমার এইরূপ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্মারক হারান উচিত নয়।'

এই জাতীয় গল্প বলা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, তবে কোন বিশেষ গল্প অসাধারণ বলে প্রতীয়মান হলে এবং বর্ণনার যোগ্য হলে সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমার বক্তব্য বিষয় ছিল খারাপ সময় পরিবর্তিত হয়ে সত্যের যুগ এলে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজার আবির্ভাব হয়,—যিনি সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে যোগ্য লোকদের প্রতিষ্ঠা করেন। মন্ত্রীরা ও রাজ-কর্মচারীরা হবে গুণ-সম্পন্ন ও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রতি কাজের ভার দেওয়া হয় আর কোন ব্যক্তিকেই দুটো পদের ভার দেওয়া হয় না। সৈনিকরা ও কৃষক সম্প্রদায় রাজাকে মান্য করে চলে। বালকদেরকে উচ্চপদে উন্নীত করা হয় না। পরিপূর্ণ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের থেকে উপদেশ চাওয়া হয়; সব বিষয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়, ফলে ধর্মীয় ও পার্থিব সব বিষয় এলোমেলো থাকে না এবং প্রত্যেক মানুষকেই তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করতে দেওয়া হয়। এর বাইরে কিছুই করতে দেওয়া হয় না আর ছোট-বড় সব কাজই ন্যায়বিচার এবং ধর্মবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

বিয়াল্লিশ অধ্যায়

অবগুণ্ঠনবতীদের তাবেদার হওয়া প্রসঙ্গে

রাজার তাবেদার যারা তাদের কোন মতেই ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয় ; কারণ তাদের ক্ষমতা দিলে তাতে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয় এবং তাতে রাজার মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। এই নিয়ম বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের বেলায় প্রযোজ্য ; কারণ তারা অবগুণ্ঠন পরে এবং তাদের পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা নেই। তাদের কাজই হোল বংশ রক্ষার কাজে সহায়তা করা ; তাই তারা যত সম্ভ্রান্ত হবে ততই মঙ্গল আর তাদের আচরণ যত সুরুচি-সম্পন্ন হবে তারা ততই প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয় হবে। কিন্তু রাজার স্ত্রীরা ক্ষমতা দখল করলে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের কথামতই তারা আদেশ দেয় ; কারণ পুরুষরা যেভাবে দেশ-বিদেশের ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে তাদের নিজেদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। গৃহাধ্যক্ষ, ভৃত্য প্রভৃতি যারা তাদের সঙ্গে থাকে স্ত্রীলোকেরা তাদের কথা-মতই আদেশ দেয়। ফলে তাদের আদেশ সব সময়ই অন্যায় এবং দুরভিসন্ধিমূলক হয়, রাজার মর্যাদা কমে যায় ; লোকেরা বিপদগ্রস্ত হয় ; রাজ্যে ও ধর্মে নেমে আসে পতন ; সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শাসকদেরকে ফেলা হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে। সব যুগেই স্ত্রীরা রাজার উপর কর্তৃত্ব করলে সেখানেই লজ্জা, অপযশ, মতভেদ এবং দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়েছে। ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মানোর জন্য এই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

স্ত্রীর কথামত চলাতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন প্রথম মানব হজরত আদম (আঃ) যিনি বিবি হাওয়ার কথামত গন্দম বৃক্ষের ফল (গম) খেয়ে বেহেশ্ত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র কৃপা লাভ করতে তাঁকে দুইশত বছর ধরে কেঁদে কেঁদে অনুশোচনা করতে হয়েছে।

কায়কাউসের স্ত্রী সাউদাবা ও স্বামীর উপর তাঁর কর্তৃত্বের কাহিনী

কায়কাউসের ছেলে সিয়াউস রুস্তমের কাছে বাল্যকালে প্রতি-পালিত হয়েছিল। ছেলেকে দেখতে ইচ্ছা হলে কায়কাউস রুস্তমের কাছে ছেলেকে ফেরত দেবার জন্য লোক পাঠালে রুস্তম সিয়াউসকে পাঠিয়ে

দিলেন। সিয়াউস দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। সাউদাবা পর্দার আড়াল থেকে তাকে দেখে তার প্রণয়াসক্ত হয়ে গেলেন। তিনি কায়কাউসকে বললেন, 'সিয়াউসকে মেয়েদের কামরায় আসতে বলুন, যাতে তার বোনরা তাকে দেখতে পারে।' কায়কাউস সিয়াউসকে বললেন, 'মেয়েদের কামরায় যাও, তোমার বোনরা তোমাকে দেখবে।' সিয়াউস বলল, 'আপনার যা আদেশ। তবে এটা ভাল হোত যদি তারা তাদের কক্ষে থাকত এবং আমি এই হল-কক্ষে থাকতাম।' সে যখন শোবার ঘরে গেল, সাউদাবা তাকে আক্রমণ করলেন এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে তার কাছে টেনে নিলেন। সিয়াউস রাগান্বিত হয়ে নিজেকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে মেয়েদের কামরা পরিত্যাগ করে নিজের ঘরে চলে এল। সে তার পিতার কাছে কিছু বলতে পারে এই ভয়ে সাউদাবা ভীতা হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, 'তার বিরুদ্ধে আগেই রাজার কাছে বলা দরকার।' তাই তিনি কায়কাউসের কাছে গিয়ে বললেন, 'সিয়াউস আমাকে আক্রমণ করে জড়িয়ে ধরেছিল এবং আমি তার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছি।' কায়কাউস সিয়াউসের প্রতি খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং দু'জনের মধ্যে খুব ঝগড়া হোল ও কথা কাটাকাটি হোল। শেষে সিয়াউসকে বলা হোল যে তাকে আগুন দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। সিয়াউস বলল, 'রাজার আদেশ শিরোধার্য ; তিনি যা বলবেন আমি তাতেই রাজী আছি।' প্রচুর জ্বালানী কাঠ যোগাড় করে অর্ধ ফারসাং বর্গ পরিমাণ জায়গা ভর্তি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোল।

আগুন যখন প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠে পর্বতসম উঁচুতে উঠল তখন তারা সিয়াউসকে বললেন, 'এখন ভিতরে যাও।' সিয়াউস শাবরাং-এ চড়ে ছিল। সে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ঘোড়াসহ অগ্নিশিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্তর্ধান হোল। কিছুক্ষণ পরে তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদে অগ্নিকুণ্ড থেকে দূরে দেখা গেল। আল্লাহ্‌র রহমতে তার অথবা তার ঘোড়ার একটি পশমও আগুনে পোড়ে নাই। উপস্থিত সকলে বিস্মিত হোল। ধর্মযাজকরা ঐ আগুন নিয়ে তাদের অগ্নি-মন্দিরে রাখল---যে আগুন ন্যায়বিচার করেছিল তা এখনও জ্বলছে।

এই বিচারের পর কায়কাউস সিয়াউসকে বাল্‌খের শাসনকর্তা করে তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সিয়াউস সাউদাবার কারণে তার পিতার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে ; তাই ওখানে সে বিক্ষুব্ধ ছিল। সে মনস্থ করেছিল যে ইরান দেশে আর থাকবে না, হিন্দুস্তানে, চীনে অথবা ইগো

চীনে যাবে। আফ্রাসিয়াবের সেনাপতি পিরান উইসা সিয়াউসের গোপন উদ্দেশ্য জানতে পারলেন। তিনি সিয়াউসের সঙ্গে দেখা করে আফ্রাসিয়াবের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানালেন। সিয়াউসও তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁর সঙ্গে এক চুক্তি করল। পিরান উইসা বললেন যে, তাদের ঘর এবং পরিবার এক। আফ্রাসিয়াব তাকে নিজের ছেলেদের চেয়েও বেশী আদর করবেন এবং সে যদি কখনও তার পিতার সঙ্গে মিটমাট করে ইরানে ফিরে যেতে চায়, আফ্রাসিয়াব তার মধ্যস্থতা করে তার পিতার সঙ্গে (কায়কাউস) এক চুক্তিবদ্ধ হয়ে সসম্মানে তাকে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিবেন। সিয়াউস তাই বল্‌খ থেকে তুর্কিস্তানে গেলো। আফ্রাসিয়াব তাকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করলেন। এদিকে আফ্রাসিয়াবের ভাই গারসিফাজ সিয়াউসের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে আফ্রাসিয়াবের সামনে তার দুর্নাম করল। সিয়াউস নিরপরাধ ছিল, তবু তাকে তুর্কিস্তানে হত্যা করা হয়। সারা ইরানে শোকের ছায়া পড়ল আর তাঁর যোদ্ধারা হোল ক্রুদ্ধ। রুস্তম সিস্তান থেকে রাজধানীতে এলেন। কারো অনুমতি না নিয়েই তিনি কায়কাউসের প্রাসাদে প্রবেশ করে মেয়েদের কামরায় গিয়ে সাউদাবাকে চুলের মুঠি ধরে বাইরে নিয়ে এলেন এবং নিজ তরবারি দ্বারা তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। 'ঠিক করেছ' অথবা 'অন্যায় করেছ'—একথা বলতে কেউ সাহস পেল না। তখন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে তুর্কিস্তানে গেল সিয়াউসের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য। অনেক বছর ধরে যুদ্ধ চলল এবং দুই পক্ষের হাজার হাজার লোক মারা গেল। আর এই সমস্তের মূলে ছিল সাউদাবা এবং রাজা কায়কাউসের উপর তার কর্তৃত্ব।

সুষ্ঠু বুদ্ধিসম্পন্ন রাজারা ও লোকেরা এমনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং এমন পন্থা অবলম্বন করেন যে, তাঁদের গোপনীয় কথাগুলো কখনও স্ত্রীদেরকে জানতে দেন না এবং স্ত্রীদের ইচ্ছা ও আদেশের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন না ও তাদের কাছে মাথা নত করেন না। আলেকজাণ্ডার ছিলেন ঐরূপ এক ব্যক্তি।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আলেকজাণ্ডার রুম থেকে এসে পারস্যের রাজা দারায়ুসের পুত্র দারায়ুসকে পরাজিত করলে পালাবার সময়ে তার নিজের এক ভৃত্য দ্বারা দারায়ুস নিহত হয়। দারায়ুসের একটা সুন্দরী ও কমনীয় মেয়ে ছিল আর তার একটা বোন ছিল ঠিক তারই মত সুন্দরী, প্রাসাদে আরো মেয়ে ছিল এবং সকলেই ছিল রূপবতী। লোকে

আলেকজাণ্ডারকে বলল, 'আপনার উচিত প্রাসাদের শয়ন-কক্ষগুলোতে গিয়ে চন্দ্রমুখীদের দেখে আসা, বিশেষ করে দারায়ুসের কন্যাকে, সৌন্দর্যে যার তুলনা হয় না।' যারা এই কথা বলল তাদের ইচ্ছা ছিল যে আলেকজাণ্ডার দারায়ুসের মেয়েকে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করবেন। আলেকজাণ্ডার উত্তর দিলেন, 'আমরা তাদের পুরুষদেরকে পরাজিত করেছি; আমরা এখন আবার তাদের স্ত্রীলোকদের দ্বারা পরাজিত হতে চাই না।' তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং দারায়ুসের শয়ন-কক্ষে গেলেন না।

অন্য একটা অতি পরিচিত গল্প আছে খসরু এবং শিরিঁ-ফরহাদের। যেহেতু খসরু শিরিঁকে এত ভালবাসতেন যে তিনি তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন ছিলেন এবং শিরিঁ যা বলত তিনি তা-ই করতেন, তাই শিরিঁ খুব সাহসী হয়ে যায় এবং এত বড় এক রাজার রাণী হয়েও সে ফরহাদের প্রতি আসক্ত হতে থাকে।

বুজুরচমিহরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি তাদের উপদেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সাসান বংশের পতন হোল কেন? দুনিয়াতে আজ আপনার সমতুল্য তো আর কেউ নাই।' তিনি বললেন, 'পতনের দুটো কারণ ছিল: প্রথমতঃ সাসান বংশের লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করত ছোট ছোট অজ্ঞ অফিসারদের উপরে; দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার পরিবর্তে তাঁরা কাজ চালাতেন স্ত্রীলোক এবং বালকদের দ্বারা। এটা পরিণামদর্শিতা এবং বিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ কোন রাজা রাজ্যের ভার স্ত্রীলোক এবং বালকদের উপর অর্পণ করলে পতন সেখানে অবশ্যম্ভাবী।'

কথিত আছে যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলতেন, 'স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর, কিন্তু তারা যা বলবে ঠিক তার উল্টোটা কর, সেটাই ঠিক হবে।' হাদীসে আছে, 'তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের বিরোধিতা কর।' স্ত্রীলোকদের যদি পূর্ণ জ্ঞান থাকত তাহলে মহানবী (সঃ) একথা বলতেন না।

অন্য এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, হজরত মুহম্মদের (সঃ) অসুখ বেড়ে গেলে তিনি খুব বেশী দুর্বল হয়ে পড়লেন। ফজরের নামাজের সময় হলে নামাজ পড়ানোর জন্য তাঁর আশায় সাহাবারা সকলে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসা ছিলেন আয়েশা এবং হাফজা। আয়েশা মহানবীকে বললেন, 'হে মহানবী নামাজের সময় হয়েছে; নিশ্চ

আপনার ত মসজিদে যাবার অবস্থা নাই। কাকে আপনি ইমামতি করতে হুকুম দিবেন?' হজরত মুহম্মদ (সঃ) বললেন, 'আবুবকরকে (রাঃ) নামাজ পড়তে বল।' আয়েশা তখন বললেন, 'হে মহানবী, আবুবকর (রাঃ) একজন দুর্বলচেতা লোকঃ তাঁর দ্বারা হয়ত আপনার স্থান পূরণ করা সম্ভব হবে না।' মহানবী বললেন, 'আবুবকরকে নামাজ পড়াতে বল।' আয়েশা পুনরায় বললেন, 'তিনি দুর্বল এবং ক্ষীণচেতা লোক'। মহানবীও পুনরায় বললেন, 'আবুবকরকেই বল নামাজ পড়াতে।' আয়েশা তখন হাফজাকে বললেন, 'তুমি নবীর (সঃ) সঙ্গে কথা বল, কারণ আমি তাঁকে কয়েকবার বলেছি যে আবুবকর খুব দুর্বলচেতা এবং তিনি মহানবীকে অন্যান্য সাহাবাদের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাই তিনি যদি নামাজে দাঁড়িয়ে দেখেন যে মহানবীর জায়গা শূন্য, তাহলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন; ফলে তাঁর এবং অন্যান্য সকলের নামাজ যাবে নষ্ট হয়ে। উমর ইবনে আল খাত্তাব একজন বলিষ্ঠচেতা লোক এবং তাঁকে এই কাজের ভার দিলে কোন অসুবিধাই হবে না।' হাফজাও ঠিক এইভাবে মহানবীকে বললেন। শুনে মহানবীর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল; তিনি বললেন, 'তোমরা গল্পে বর্ণিত ইউসুফ এবং কিরসুফের মত। তোমরা যা চাচ্ছ তা আমি করব না; মুসলমানদের যাতে মঙ্গল হবে আমি তাই করব। যাও, আবুবকরকে গিয়ে নামাজের ইমামতি করতে বল।'

এগুলো হাদীসের কথা। আয়েশার এতসব পদমর্যাদা, বিদ্যা, ভক্তি এবং কর্তব্যবোধ থাকা সত্ত্বেও হজরত মুহম্মদ (সঃ) যা চেয়েছিলেন তার বিরোধিতা করেছিলেন। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্যান্য স্ত্রীলোকের কথার কি মূল্য থাকতে পারে।

ইউসুফ ও কিরসুফের গল্প

কথিত আছে যে, বনি-ইসরাঈলদের সময় নিয়ম ছিল কোন ব্যক্তি যদি চল্লিশ বছর ধরে কোন মারাত্মক অন্যায় বা পাপকার্য থেকে বিরত থাকতেন, তিনি যদি সময় মত উপাসনা বা উপবাস করতেন এবং কারো কোন ক্ষতি না করতেন তাহলে আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির তিনটা ইচ্ছা পূরণ করতেন। ঐ সময়ে বনি-ইসরাঈলদের মধ্যে একজন ছিলেন ইউসুফ। তিনি খুব সৎ এবং ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল কিরসুফ; তিনি ছিলেন তাঁর মতই ধর্মনিষ্ঠ এবং পবিত্র। তিনি এই ভক্তিমূলক কার্য

সম্পন্ন করলেন এবং চল্লিশ বছর ধরে ক্রমাগত আল্লাহ্‌র উপাসনা করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে এখন আমি কি চাইব? আমার যদি একজন বন্ধু থাকত উপদেশ দেবার জন্য যে কি প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া যায়।' বহু চিন্তা-ভাবনা করেও তিনি উপযুক্ত কিছু চিন্তা করে বের করতে পারলেন না। নিজ বাড়ীতে ঢুকবার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 'সারা দুনিয়াতে স্ত্রীর চেয়ে আমার কাছে প্রিয় আর কেউ নাই। সে আমার সঙ্গী ও আমার ছেলে-মেয়েদের মা। আমার মঙ্গলই তার মঙ্গল এবং দুনিয়ার অন্য সকলের চেয়ে সে আমার মঙ্গল বেশী চায়। তাই আমার উচিত হবে এই ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করা।'

তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'আমার চল্লিশ বছর তপস্যা শেষ হয়েছে, তাই আল্লাহ্ আমার তিনটি ইচ্ছা পূরণ করবেন। দুনিয়াতে তোমার চেয়ে আমার মঙ্গল আর কেউ বেশী চায় না। তাই বল, আল্লাহ্‌র কাছে কি চাওয়া যায়।' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'তুমি জান যে দুনিয়াতে আমার শুধু তুমিই আছ। তোমাকে দেখেই আমার তৃপ্তি আর স্ত্রীরা ত পুরুষদেরকে শান্তি দেবার জন্যই। আমি তোমার সঙ্গী, আমাকে দেখেই তুমি সর্বদা সুখী এবং আমাকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে তোমার জীবন ধন্য। তাই আল্লাহ্‌র কাছে চাও যেন আমাকে এমন সৌন্দর্য দেয় যা অন্য কোন স্ত্রীলোককে দেওয়া হয় নি; তাহলে তুমি দরজায় এসে আমাকে এত সুন্দর ও মোহনীয় দেখলে তোমার অন্তর খুশীতে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং যত দিন আমরা দুনিয়াতে থাকতে সম্মত হব, তত দিন আনন্দ ও সুখে কাটবে।' ইউসুফ তাঁর স্ত্রীর কথায় খুশী হলেন। তিনি প্রার্থনা করে বললেন, 'হে খোদা, তুমি এই স্ত্রীলোককে এমন সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দাও—যা অন্য কোন স্ত্রীলোককে দাও নাই।' আল্লাহ্ শুনে ইউসুফের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা গেল যে তাঁর স্ত্রীর কাল রাত্রে শোবার সময় যে রূপ ছিল সেটা আর বিদ্যমান নাই। তাঁর এমন এক লাবণ্যপূর্ণ রূপ হয়েছে যা কোন মানুষ কখনও দেখে নাই।

ইউসুফ তাঁকে এত সুন্দরী দেখে বিস্মিত হলেন এবং আনন্দে নেচে উঠলেন। প্রত্যেক দিন তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বাড়তে বাড়তে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছল, যখন কোন দর্শকেরই তাকিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁর সৌন্দর্যের কথা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল এবং অসংখ্য লোক তাঁকে দেখতে আসতে লাগল। তখন তিনি এক দিন আয়নায়

তাঁর সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত ও গর্বিত হলেন। তিনি বললেন, 'দুনিয়াতে এখন আমার মত কে আছে? আমার মত রূপ ও সৌন্দর্য কার আছে? এই নিঃসম্বল লোককে দিয়ে আমি কি করব, যে রুটি বালি খেয়ে দুনিয়ার সব ভাল ভাল জিনিস পরিত্যাগ করে একটা শোচনীয় জীবন যাপন করে? আমি দুনিয়ার বড় বড় রাজা এবং বাদশাহ্‌দের উপযুক্ত এবং তারা দেখলে আমাকে স্বর্ণ, মুক্তা এবং বুটিতোলা রেশমী বস্ত্র দ্বারা সাজিয়ে রাখবে।' এই জাতীয় নিষ্ফল ইচ্ছা ও অভিলাষ তার মাথায় চেপে বসল। সে তার স্বামীর সঙ্গে খারাপ মেজাজ দেখিয়ে বিবাদ করতে শুরু করে এবং তাকে মাঝে মাঝে বলত, 'তুমি আমার উপযুক্ত নও। এমন কি তোমার আমার মত প্রচুর রুটিও নাই।' ইউসুফের ঘরে তার তিন-চারটা বাচ্চা ছিল। সে তাদের দেখা-শুনা করা বন্ধ করে দিল এবং এমন অদমনীয় হয়ে উঠল যে ইউসুফ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, 'হে খোদা, এই স্ত্রীলোককে একটা ভল্লুকে পরিণত কর।' সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি ভল্লুকে পরিণত হোল এবং উৎপাতের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সে শিকার অন্বেষণে সর্বদা প্রাচীর ও ছাদের উপরে ঘুরাঘুরি করতে লাগল; সে ঘর ছেড়ে কখনও দূরে গেল না এবং সারা দিন তার চোখ দিয়ে পানি বেরুতে লাগল। ইউসুফ তাঁর বাচ্চাদের দেখা-শুনা নিয়ে বিপদে পড়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র জেকের করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তাঁর নামাজ ক্রমাগত কাজা হতে লাগল। পুনরায় তিনি বিপদে পড়লেন এবং এমন ক্লেশে পড়লেন যে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, 'হে খোদা, এই ভল্লুককে ঠিক পূর্বের মত একজন স্ত্রীলোকে পরিণত করে তাকে একটা পরিতৃপ্ত মন দাও যাতে সে তার ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাদের যত্ন নেয়। আর আমি তখন তোমার আরাধনায় নিয়োজিত থাকবো।' অবিলম্বে স্ত্রীলোকটি তার পূর্বের রূপ নিল। কি ঘটেছিল তা সে কিছুই কখনও মনে করতে পারে নি; তবে সে ভেবেছিলেন যে, সে স্বপ্ন দেখেছিল। এইভাবে ইউসুফের চল্লিশ বছরের বন্দেগী ধূলিসাৎ হয়ে গেল—সবই একমাত্র একজন স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় ও কামনার জন্য।

এরপরে এই গল্প স্ত্রীলোকদের কথার বিরুদ্ধে সুবিদিত সাবধানবাণী হিসাবে ব্যবহৃত হোত।

খলীফা আল-মামুন এক দিন বলেছিলেন: 'এমন যেন কোন রাজা কখনও না আসেন যিনি স্ত্রীলোকদের তাঁর কাছে রাজ্য, সেনাবাহিনী, ধনাগার

এবং সরকার সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুমতি দেন অথবা এই সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেন অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে সুযোগ দেন। কারণ তাদের কথায় যদি কর্ণপাত করা হয় তাহলে তাদের নির্দেশে হয়ত রাজা একজনকে উচ্চাসনে বসাবেন এবং অন্য একজনকে দিবেন শাস্তি অথবা একজনকে নিয়োগ করে অন্য একজনকে বরখাস্ত করবেন এবং অবস্থা যদি এইরূপ হয়ই, তাহলে লোকেরা নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদের কাছে গিয়ে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করবে, কারণ তাদের মন সহজেই জয় করা যায়। আর স্ত্রীলোকেরাও নিজেদেরকে সুযোগ্য ভেবে এবং তাদের কাছে সর্বদা সৈনিকরা ও কৃষকরা আসাতে নিষ্ফল অভিলাষ কামনা করবে এবং সবরকম দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবে। শীঘ্রই বিধর্মীরা স্থান পেতে থাকবে। অচিরেই রাজার মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে। দারবার ও সরকারের মান এবং জাঁকজমক আর থাকবে না। রাজা তাঁর সম্মান হারাবেন এবং আশে-পাশের দেশগুলো শুরু করবে নিন্দা করতে। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা নেমে আসবে, সৈন্যরা হবে বিদ্রোহী আর এইগুলো দমন করার কোন ক্ষমতাও উজিরের থাকবে না।'

রাজার জন্য প্রচলিত রীতিই মেনে চলা সবচেয়ে উত্তম যা সব বড় বড় জ্ঞানী রাজা অনুসরণ করতেন এবং আল্লাহ্ও তাই বলেছেন। (কোরআন ঃ ৪.৩৮) 'স্ত্রীলোকদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্যই পুরুষদের সৃষ্টি করা হয়েছে।' স্ত্রীলোকদের যদি নিজেদের উপর কর্তৃত্ব করার সামর্থ্য থাকত, তাহলে আল্লাহ্ তাদের কর্তা হিসাবে পুরুষদের সৃষ্টি করতেন না। তাই কোন লোক যদি পুরুষদের কোন ভুল এবং দুরভিসন্ধির জন্য স্ত্রীলোকদেরকে তাদের উপরে স্থান দেয় তাহলে সে প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

কায়খসরুর অনুশাসন ছিল যে, কোন রাজা তাঁর বংশকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাইলে, তাঁর রাজ্যকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইলে এবং তাঁর নিজের আড়ম্বর ও মার্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে চাইলে স্ত্রীলোকদের শুধুমাত্র অধীনস্থদের ও ভৃত্যদের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়। এইভাবে চললে তাঁরা প্রাচীন রীতিনীতি বজায় রাখতে সক্ষম হবেন এবং দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবেন।

উমর ইবনে আল-খাত্তাব বলেছেন, 'স্ত্রীলোকদের কথাগুলো তাদের শরীরের ন্যায় অপবিত্র (অশ্লীল)। জনগণ সমক্ষে তাদের শরীর প্রদর্শন করা যেমন অন্যায় তেমনি তাদের কথাগুলো পুনর্বার বলা অশোভনীয়।'

এই বিষয়ে যা বলা হোল, সেটা গ্রহণীয় নয় শুধু, কথাগুলো উপকারীও বটে।

তাবেদারদের সম্পর্কে

আল্লাহ্ রাজাকে সব মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্টতর করে সৃষ্টি করেছেন আর দুনিয়াবাসীরা সকলেই তাঁর তাবেদার এবং তাঁর থেকেই তারা পায় জীবিকা ও পদ। তাই রাজার উচিত তাদেরকে এমনভাবে রাখা যেন সব সময়ই তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকতে পারে এবং যার যার কাজ পরিত্যাগ না করে অথবা অবাধ্য না হয়। সব সময়ই তাদেরকে তাদের ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে সজাগ রাখতে হবে যাতে তারা নিজেদের অবস্থা ভুলে না যায় বা তাদের ইচ্ছামত কাজ না করে। রাজাকে প্রত্যেকের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকতে হবে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা অনুসন্ধান করতে হবে যাতে তারা তাঁর আদেশ অমান্য করতে না পারে।

একদিন বুজুরচমিহর ন্যায়পরায়ণ রাজা নওশেরওয়াঁকে বললেন, 'দেশটা রাজার আর রাজা এটাকে দিয়েছেন সৈনিকদের হাতে—জনগণের কাছে নয়। সৈনিকরা যদি দেশের প্রতি অনুরক্ত না হয়, জনগণের প্রতি তাদের যদি কোন দয়া এবং সহানুভূতি না থাকে এবং তারা যদি শুধু নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে তাহলে দেশ ছেড়ে সকলে চলে যাক, অন্যথায় কৃষক সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়লে সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপই করবে না। দেশে সৈনিকদের যদি হরতাল করার, জেলে দেবার, শাস্তি দেবার, বিশ্বাসঘাতকতা করার, নিয়োগ করার এবং বরখাস্ত করার ক্ষমতা থাকে তাহলে রাজা এবং তাদের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? এইগুলো সব সময়ই রাজার বিশেষ অধিকার হিসাবে চলে আসছে, সৈনিকদের সীমারেখার মধ্যে নয়, এই জাতীয় ক্ষমত ও কর্তৃত্ব চর্চা করার অধিকার সৈনিকদের কখনও দেওয়া হয় নি। সব যুগেই রাজমুকুট, স্বর্ণনির্মিত অশ্বারোহীর পাদান, স্বর্ণমণ্ডিত পেয়ালা, সিংহাসন এবং মুদ্রা প্রস্তুতকরণ অধিকার একমাত্র রাজারই থাকে।' তিনি আরো বললেন, 'রাজা যদি অন্যান্য সকল রাজার চেয়ে বেশী যশ ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করতে চান তাহলে তাঁর নৈতিক গুণাবলী মার্জিত করতে হবে।' রাজা বললেন, 'আমি কিভাবে এটা করব।' তিনি বললেন, 'আপনার মধ্য থেকে খারাপ গুণাবলীকে বর্জিত করে সদ্‌গুণাবলী আঁকড়ে ধরুন এবং সেগুলোর

চর্চা করুন। সদ্‌গুণাবলী হচ্ছেঃ বিনয়, শান্ত মেজাজ, কোমলতা, ক্ষমা, নম্রতা, উদারতা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, দয়া, জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ন্যায়বিচার; আর খারাপগুলো হোলঃ বিদ্বেষ, হিংসা, গর্ব, ক্রোধ, লোভ, কামপ্রবৃত্তি, কামনা, ঈর্ষা, অসভ্যতা, লোভ, বদমেজাজ, নির্দয়তা, স্বার্থপরতা, হঠকারিতা, অকৃতজ্ঞতা এবং চাপল্য।'

এই গুণাবলী সম্পর্কে যে জ্ঞাত আছে, সে জানে কিভাবে সব কাজ পরিচালনা করতে হয় এবং অধীনস্থদের তদারক করতে ও রাজ্য পরিচালনা করতে, তার কোন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হবে না।

তেতাল্লিশ অধ্যায়

দেশ ও ইসলামের শত্রু ও বিধর্মীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

বিভিন্ন বিদ্রোহীরা কিভাবে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠে সে সম্পর্কে কয়েকটা অধ্যায় আমি রচনা করতে চেয়েছিলাম, যাতে সারা দুনিয়া জানতে পারে যে এই রাজ্যের প্রতি আমার কত দরদ ছিল এবং সেলজুক-দের সাম্রাজ্যের প্রতি আমার আনুগত্য এবং ভক্তি ছিল কত অকপট—বিশেষ করে রাজার এবং তাঁর পরিবারের প্রতি।

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সব যুগেই ছিল এবং হজরত আদমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সব দেশেই তারা রাজা এবং নবীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু আজ যারা দেওয়ালের অন্তরালে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং ধর্মকে বিনষ্ট করতে চাচ্ছে তাদের মত এত নীচ, দুর্নীতিপরায়ণ এবং অধার্মিক কখনও আর ছিল না। তারা রাজ-দ্রোহীদের কথা শুনতে এবং কুচক্রীদের পথ অবলম্বন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। যদি কোনভাবে কোন দৈব দুর্ঘটনায় এদেশে কোন দুর্যোগ দেখা দেয় তাহলে এই সমস্ত কুচক্রী মাথা-চাড়া দিয়ে উঠবে এবং শিয়াদের সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। রাফিদী এবং খুররামীদের থেকেই এঁরা বেশী সাহায্য পাবে ; কারণ তারা অনিষ্ট করতে, খুন করতে এবং ধর্মের বিরোধিতা করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। কথায় তারা মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু সত্যিকারভাবে তারা অবিশ্বাসীদের মত কাজ করে। তাদের বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে আসল উদ্দেশ্যের কোন মিল নাই। তারা কথায় যা বলে কাজে তার ঠিক উল্টো করে। তাদের মত দুষ্ট শত্রু আর ইসলাম ধর্মের নাই এবং রাজার পক্ষে তাদের মত এত বড় শত্রুও আর নাই।

এমনও কিছু লোক আছে যারা এখনও এই সাম্রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে এবং যারা শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়েও এখানে থেকে গোপনে গোপনে তাদের কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আব্বাসীদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য রাজাকে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করছে এবং আমি যদি তাদের এই দুরভিসন্ধির কথা ফাঁস করে দিতে পারতাম, তাহলে দেখা যেত অনেক অশোভনীয় বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার চেয়ে দুঃখের কথা যে, তাদের প্রতিনিধিত্বের ফলেই খলীফা তাঁর হতভাগ্য উজিরের

কথায় তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না এবং এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না, কারণ এই লোকগুলো মিতব্যয়ের কথা সুপারিশ করে রাজাকে অর্থলোভী করে তুলেছে। তারা বুঝাতে চায় যে আমি স্বার্থপর, তাই আমার উপদেশে কোন কাজই হয় না। এক দিন খলীফা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য, বিশ্বাসঘাতকতা এবং হীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন; কিন্তু সেদিন আমি এ জগতে থাকব না। তখন তিনি বুঝবেন যে, এই সাম্রাজ্যের প্রতি আমার আনুগত্য ও ভক্তি ছিল কত প্রগাঢ়। কারণ তাদের চরিত্র এবং দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আমি কখনও অজ্ঞ ছিলাম না এবং সুযোগ পেলেই তা রাজাকে জানিয়ে দিতাম, সেগুলো গোপন রাখতাম না। তবে যখন দেখতাম যে আমার কথাগুলো বিশ্বাস করা হচ্ছে না, তখন আর সেগুলো বলতাম না।

যাই হোক, আমি রাজার শাসন-বিধি সম্পর্কিত এই পুস্তকে বিধর্মীদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছি—তারা কে, কি তাদের বিশ্বাস, কোথায় তাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ, তারা কতবার বিদ্রোহ করেছে এবং প্রত্যেক বার তাদের দমনের মূলে কে ছিল ইত্যাদি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার জন্য যাতে আমার মৃত্যুর পর এই পুস্তকখানা খলীফার জন্য স্মারক হিসাবে থাকতে পারে। কেননা এই ধরনের অভিশপ্ত দলাদলির ফলে সিরিয়া, ইয়েমেন এবং স্পেনে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। আমি শুধুমাত্র পারস্যে যা ঘটেছে, সেটাই সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে বর্ণনা করব। যারা তাদের সম্পর্কে এবং তারা সাম্রাজ্যের ও ধর্মের যা ক্ষতি করেছে সেটা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, তাদের ইতিহাস পড়া উচিত—বিশেষ করে ইস্পাহানের ইতিহাস। আমি এখন পারস্যে তারা যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছে, তার অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র বর্ণনা করছি।

চুয়াল্লিশ অধ্যায়

মাজদাকের বিদ্রোহ, তার গোত্রের নীতি এবং যে অবস্থায় নওশেওয়াঁর হাতে তার মৃত্যু হয়েছিল

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নাস্তিকতা মতবাদের প্রচলন করে, পারস্য দেশে তার আবির্ভাব হয়েছিল। সে ছিল ন্যায়পরায়ণ রাজা নওশেরওয়াঁর পিতা কোবাদ ইবনে ফিরোজের সময়ের একজন জরথুস্ত্রপন্থী ধর্মযাজক। তার নাম ছিল মাজদাক বামদাদান। সে জরথুস্ত্রের মতবাদে বিশ্বাসীদের অসুবিধা করার জন্য জরথুস্ত্রের মতবাদকে কলুষিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সারা দুনিয়াতে রটিয়েছিল দুর্নাম। এদিকে মাজদাক ছিল জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং সে নক্ষত্র গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করল, ঐ যুগে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যে জরথুস্ত্রবাদ, ইহুদী, খৃস্টান এবং প্রতিমা পূজার মতবাদকে বিসর্জন দিয়ে নিজে এক ধর্মের প্রবর্তন করবে। এই ধর্মকে সে মন্ত্র এবং শক্তি বলে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত এই ধর্ম বলবৎ থাকবে। মাজদাক অসার কল্পনায় মত্ত হোল যে, সে নিজেই ঐ ব্যক্তি এবং চিন্তা করতে লাগল কিভাবে লোকদের দীক্ষিত করে নতুন ধর্ম প্রচার করা যায়। সে জানত যে, রাজ্য পরিষদে তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। পারিষদবর্গের মধ্যে তার কথার মূল্য সবচেয়ে বেশী এবং নবীত্ব দাবী করা পর্যন্ত তার কোন কথা বিফলে যায় নাই। সে তার চাটুকারদের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় একটা সুড়ঙ্গ-পথ নির্মাণ করতে বলল। তারা আস্তে আস্তে এমনভাবে একটা গর্ত খনন করল যে, তার মুখটা এলো অগ্নি-মন্দিরে। ঠিক যে জায়গায় আগুন ধরানো হয়, সেটা ছিল শুধুমাত্র একটা ছোট ছিদ্রের মত। তখন সে তার নবীত্ব দাবী করতে লাগল এবং বলল, 'জরথুস্ত্রের মতবাদে পুনর্জাগরণ আনবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে, কারণ লোকেরা জেন্দ-আবেস্তার অর্থ ভুলে গেছে এবং জরথুস্ত্রের নীতিগুলো তারা মানছে না, যেমনিভাবে বনি-ইসরাঈলরা আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌরাতে প্রাপ্ত মূসার আইন অমান্য করলে, তিনি বনি-ইসরাঈলদের অবাধ্যতা বিদূরিত করে তৌরাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক পথে চালিত করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন একজন নবীকে।' এই কথাগুলো রাজা কোবাদের কানে পৌঁছল।

পরের দিন অন্যায়ের প্রতিবিধান করার জন্য তাঁর পারিষদবর্গ ও ধর্মযাজকদের ডাকলেন। মাজদাককে ডেকে তিনি জনগণের সামনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি নবী বলে দাবী কর?' সে বলল, 'হাঁ, আমি দাবী করি। আমি এসেছি, কারণ আমাদের শত্রুরা জরথুস্ত্রের ধর্ম-বিশ্বাসকে কলুষিত করে এটাতে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। এটাকে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত করব। লোকেরা জেন্দ-আবেস্তার প্রায় অংশকেই ভুল ব্যাখ্যা করছে। আমি তাদেরকে আসল অর্থ দেখিয়ে দিব।' কোবাদ বললেন, 'তোমার কি প্রমাণ আছে?' সে বলল, 'আমার মজেজা হোল যে, আমি আগুনকে দিয়ে কথা বলাব—যে আগুনকে সকলে কেবলার মত পবিত্র মনে করে। আমি আল্লাহ্‌কে আগুন দ্বারা আমার নবীত্বের সাক্ষ্য দেবার কথা বলব, যাতে রাজা এবং তাঁর অন্য সঙ্গীরা শুনতে পারে।' রাজা বললেন, 'হে পারিষদবর্গ ও ধর্মযাজকগণ, মাজদাকের এই সমস্ত কথায় আপনাদের কি মত?' ধর্মযাজকরা বললেন, 'প্রথমতঃ সে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের কথা বলছে এবং সে জরথুস্ত্রকে অমান্য করছে না। এটা সত্য কথা যে, জেন্দা-আবেস্তায় অনেক জায়গা আছে যার দশ রকম অর্থ করা যায় এবং প্রত্যেক ধর্মযাজক ও পণ্ডিত সেগুলোর অর্থ বিভিন্নভাবে করে। হয়ত সে সেগুলোর ভাল ব্যাখ্যা করে আরো উপযোগী অর্থ করতে পারে। কিন্তু সে যে বলছে যে, আগুন—যাকে আমরা পূজা করি, তার দ্বারা সে কথা বলাবে—এটা একটা যাদু, কারণ এটা মানুষের শক্তির আওতার মধ্যে নয়। এর বেশী আপনিই ভাল জানেন।' তখন কোবাদ মাজদাককে বললেন, 'তুমি যদি আগুন দ্বারা কথা বলাতে পার, তাহলে আমিই সাক্ষী থাকব যে তুমি একজন নবী।' মাজদাক বলল, 'আপনি একটা সময় নির্দিষ্ট করেন, যখন আপনি আপনার পারিষদবর্গ ও ধর্মযাজকদের সহ অগ্নি-মন্দিরে আসবেন এবং আমার কথামত আল্লাহ্ আগুন দ্বারা কথা বলাবেন। আপনি যদি চান, তাহলে আজই হোক অথবা এখনই হোক।' কোবাদ বললেন, 'আমরা অগ্নি-মন্দিরে আগামী কাল আসতে চাই।' পরের দিন মাজদাক তার চাটুকারদের একজনকে গর্তের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, 'যখনই আমি চীৎকার করে আল্লাহ্‌কে ডাকব, তুমি গর্তের ভিতরে থেকে বলবে: 'সকল, প্রার্থনাকারীই যেন মাজদাকের কথা শুনে এবং কাজে পরিণত করে তাহলেই তারা ইহকালে পরকালে উন্নতি লাভ করতে পারবে এবং ভাগ্যবান হবে।'

কোবাদ এবং পারিষদবর্গ ও ধর্মযাজকরা সকলে অগ্নি-মন্দিরে গেলেন। মাজদাককে ডাকা হোল। সে এসে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে আল্লাহ্‌কে ডাকল, জরথুস্ত্রকে আশীর্বাদ করল এবং তারপর চুপ করে রইলো। পূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুযায়ী আগুনের মধ্য থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল এবং রাজা ও অন্যান্য সকলে শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কোবাদ মাজদাকের কথা বিশ্বাস করতে মনস্থ করলেন এবং তাঁরা অগ্নি-মন্দির থেকে ফিরে এলেন। তারপরে কোবাদ প্রত্যেক দিন মাজদাককে কাছে ডেকে আনতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করলেন। তিনি তাকে মুক্তা-খচিত একটা স্বর্ণের সিংহাসন দিলেন এবং সেটাকে দরবার-কক্ষের মঞ্চের উপর স্থাপন করতে হুকুম করলেন। জনসমক্ষে বিচারের সময় কোবাদ মঞ্চের উপর বসবেন আর মাজদাককে বসাবেন সিংহাসনে এবং মাজদাক থাকবে কোবাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। তখন লোকেরা মাজদাকের ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। কিছু লোক করল ভাল লাগার জন্য এবং সহানুভূতি জানানোর জন্য আর কিছু লোক করল রাজার সঙ্গে একমত হবার জন্য। বিভিন্ন প্রদেশ, জেলা থেকে রাজধানীতে লোক এসে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে মাজদাকের ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সৈনিকদের এটার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না, তবে রাজার সম্মানের জন্য কিছু বলতে সাহস পেল না। ধর্মযাজকদের কেউ মাজদাকের ধর্ম গ্রহণ করলেন না। তাঁরা বললেন, 'দেখা যাক, সে জেন্দ-আবেস্তা থেকে কি প্রমাণ উদ্ধৃত করে।'

মাজদাক যখন দেখল যে, রাজা তার ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং দেশ-বিদেশের লোকেরা তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে, তখন সে সম্পত্তির বিষয়ে তার মত প্রকাশ করে বলল, 'সম্পত্তি সব লোকদের মধ্যে বণ্টন করা একান্ত প্রয়োজন; কারণ সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আর্যদের সন্তান। কোন লোকের কিছু প্রয়োজন হলে সেটা জনসাধারণের তহবিল থেকে দেওয়া একান্ত উচিত যাতে কোন বিষয়ে কোন লোকের কষ্ট না হয় এবং প্রয়োজনের সময় অসুবিধা না হয়।' সম্পদ বণ্টন বিষয়ে কোবাদকে ও তার মতবাদে বিশ্বাসীদেরকে রাজী করানের পর সে বলল, 'আপনাদের স্ত্রীরা আপনাদের অন্যান্য সম্পদের মত। তাদেরকেও সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা উচিত। যদি কোন লোকের কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামনা জাগে তাহলে তাদেরকে একত্র হবার সুযোগ দিতে হবে। আমাদের ধর্মে ঈর্ষা বা ক্রোধের স্থান নাই এবং কোন লোককেই আনন্দ লাভের

এবং কামনা তৃপ্ত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় না। বাসনা ও সন্তোষ লাভ করার অধিকার সকলেরই আছে।' সম্পত্তি ও স্ত্রীলোকদের সাধারণ সম্পদে পরিণত করার কারণে সাধারণ লোকেরা তার ধর্ম গ্রহণ করতে বেশী আগ্রহান্বিত হোল। তাছাড়া সে নিয়ম করে দিল যে যদি কোন লোক তার বাড়ীতে বিশজন লোককে দাওয়াত করে তাহলে তাদেরকে শুধু রুটি, মাংস, মদ ও কবিদের দ্বারা আপ্যায়ন করলেই হবে না তাদের প্রত্যেককেই একের পর এক তার স্ত্রীকে উপভোগ করতে দিতে হবে এবং এটাকে তারা অন্যায় মনে করত না। তাদের নিয়ম ছিল কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের কাছে গেলে তাকে তার টুপি দরজায় রেখে তারপর তার ঘরে ঢুকতে হোত। অন্য কোন পুরুষও সেখানে যাবার ইচ্ছা করলে সে ঐ টুপী ঝুলানো দেখে ফিরে আসত, কারণ সে বুঝতে পারতো যে অন্য কেউ ভিতরে রয়েছে।

নওশেরওয়াঁ গোপনে এক ব্যক্তিকে ধর্মযাজকদের কাছে পাঠিয়ে বললেন, 'আপনারা কেন অসহায়ভাবে চুপচাপ আছেন? আপনারা কেন মাজদাককে কিছু বলেন না এবং আমার আব্বাকে কিছু উপদেশ দেন না? আপনারা এ কি মনোভাব নিয়েছেন? আপনারাও কি এই প্রতারকের প্ররোচনায় পড়লেন? এই কুকুরটা কি লোকের সম্পত্তি নষ্ট করে নি, স্ত্রীলোকদের অবগুণ্ঠন ফেলে দেয় নি এবং সাধারণ লোকদেরকে সকলের প্রভু করে নি? আর তাই যদি হয়, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কোন অধিকারে এবং কার নির্দেশে এগুলো করছে। কারণ আপনারা যদি চুপ করে থাকেন, তাহলে আপনারা আপনাদের সম্পত্তি ও স্ত্রীদেরকে হারাবেন এবং আমাদের পরিবার থেকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চলে যাবে। আপনারা যান, আমার পিতার কাছে গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটা বিস্তারিত খুলে বলুন এবং তাঁকে উপদেশ দিন। তারপর মাজদাকের সঙ্গে যুক্তি তর্ক করুন, দেখুন সে কি বলে।' আর ওমারাদের তিনি সংবাদ পাঠিয়ে বললেন, 'আমার পিতা একজন লম্পটের কাছে দুঃখজনকভাবে পরাভূত হয়েছেন; তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি এত দুর্বল করা হয়েছে যে, তিনি ভাল-মন্দ নির্ণয় করতে পারেন না। অনুগ্রহ করে চিন্তা করে দেখবেন তাঁকে কি করে আরোগ্য করা যায়, তা না হলে তিনি মাজদাকের কথামত কাজ করবেন এবং আপনারাও সাবধান হোন যেন আমার পিতার দ্বারা প্রবঞ্চিত না হন। কারণ এগুলো সবই অসার জিনিস আর অন্তঃসারশূন্যতা বেশী দিন থাকে না আর এটা দ্বারা ভবিষ্যতে আপনাদের কোন উপকার হবে না।'

ওমারাগণ নওশেরওয়াঁর কথায় এবং সতর্কতায় ভীত হলেন এবং যদিও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মাজদাকের ধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু নওশেরওয়াঁর জন্য তাঁরা সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে বললেন, 'দেখা যাক, মাজদাকের ব্যাপারগুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আর নওশেরওয়াঁর যুক্তির ভিত্তি পরীক্ষা করা যাক।' এই সময় নওশেরওয়াঁর বয়স ছিল আঠারো বছর।

ধর্মযাজকরা সকলে একমত হয়ে কোবাদের নিকট গিয়ে বললেন, 'আদমের (আঃ) সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনও মাজদাকের ন্যায় বক্তব্য পেশ করতেও শুনি নাই আর তার মত হুকুম দিতেও শুনি নাই অথবা সিরিয়ার অন্য কোন নবীর থেকেও এই জাতীয় কথা শুনি নাই। আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর মনে হচ্ছে।' কোবাদ বললেন, 'মাজদাকের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, সে কি বলে।' তাঁরা মাজদাককে ডেকে বললেন, 'তোমার এই আদেশবাণীর কি যৌক্তিকতা আছে?' মাজদাক বলল, 'জরথুস্ত্র এইরূপ বলে গেছেন এবং জেন্দ-আবেস্তায়ও এরূপ লেখা আছে, কিন্তু মানুষ তার ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে নাই। আমাকে যদি বিশ্বাস না হয় তবে আগুনকে জিজ্ঞাসা করুন।' তাঁরা পুনরায় অগ্নি-মন্দিরে গিয়ে আগুনকে প্রশ্ন করলেন। আগুনের মধ্য থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, 'মাজদাকের কথাই ঠিক, আপনাদের কথা নয়।' ধর্মযাজকরা এবারও অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এলেন। পরের দিন তাঁরা নওশেরওয়াঁর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা খুলে বললেন। নওশেরওয়াঁ শুনে বললেন, 'মাজদাক কৃতকার্য হচ্ছে কারণ দুটো দিক ছাড়া তার ধর্মে ও অগ্নি-পূজারীদের ধর্মে সম্পূর্ণ মিল আছে।

এই ঘটনা কিছু দিন পরে একদা কোবাদ ও মাজদাক আলাপ করছিলেন। কোবাদ সুযোগ পেয়ে বললেন, 'লোকেরা কি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসুক হয়ে পড়েছে?' মাজদাক বলল, 'নওশেরওয়াঁ বাধা না দিলে সকলেই আসত, কিন্তু সে খুব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং এই ধর্ম গ্রহণ করে নাই।' কোবাদ বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও যে সে আমাদের ধর্মে বিশ্বাস করে না।' সে বলল, 'না, তা নয়।' কোবাদ বললেন, 'নওশেরওয়াঁকে ডাক।' নওশেরওয়াঁকে ডেকে আনা হোল। কোবাদ তাঁকে বললেন, 'তুমি কি মাজদাকের ধর্মে বিশ্বাস কর না?' তিনি বললেন, 'না, আমি বিশ্বাস করি না।' তাঁর পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বিশ্বাস কর না?' তিনি বললেন, 'কারণ সে একজন

প্রতারক এবং প্রবঞ্চক। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কারণে সে প্রবঞ্চক? সে কি আগুন দ্বারা কথা বলায় নি?' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'পানি, আগুন, মাটি ও বাতাস এই চারটা জিনিস একে অন্যের বিপরীত এবং এদের কোন রং নাই। সে যদি পানি, বাতাস ও মাটিকে দিয়ে কথা বলাতে পারে তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করব।' কোবাদ বললেন, 'কিন্তু সে যা বলছে সবই জেন্দ-আবেস্তার ব্যাখ্যা থেকে বলছে।' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'যে ব্যক্তি জেন্দ-আবেস্তা রচনা করেছিলেন তিনি ত বলেন নাই যে সম্পদ ও স্ত্রীলোকদেরকে সকলের মধ্যে বণ্টন করতে হবে এবং সেইরূপ ব্যাখ্যা এত দিন কোন পণ্ডিতও দেন নাই। ধর্মে রয়েছে সম্পদ ও স্ত্রীদেরকে রক্ষা করার, কিন্তু এ দুটোই যদি খুব সহজলভ্য হয় তাহলে মানুষ ও পশুর মধ্যে তফাৎ কোথায়; কারণ পশুদেরই খাওয়ার এবং যৌনসংসর্গের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ নাই, জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের নয়।' কোবাদ বললেন, 'তা হোক, কিন্তু তুমি তোমার পিতার বিরোধিতা কেন করছ?' তিনি বললেন, 'সেটা ত আমি আপনার থেকেই শিখেছি, যদিও পূর্বে এটা প্রচলিত ছিল না। আপনার দ্বারা আপনার পিতার বিরোধিতা করতে দেখে আমিও আপনার বিরোধিতা করেছি। এখন আপনি যদি সেটা পরিত্যাগ করেন আমিও আপনার পথে ফিরে আসব।' কোবাদ ও মাজদাক নওশেরওয়াঁর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছলেন, যখন তাঁরা নওশেরওয়াঁকে পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন, 'তুমি মাজদাকের এই ধর্মকে মিথ্যা বা ভুল প্রমাণ কর এবং তার যুক্তিকে খণ্ডন কর অথবা এমন একজনকে আন যার যুক্তি মাজদাকের যুক্তির চেয়েও তীক্ষ্ণ। অন্যথায় অন্যদেরকে সাবধান করার জন্য তোমাকে আমরা শাস্তি দিব।' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'আমাকে চল্লিশ দিন সময় দিন। আমি আপনাদেরকে প্রমাণ দেব অথবা মাজদাকের কথার উত্তর দেবার জন্য অন্য একজনকে আনব।' তাঁরা বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' তারপরে তাঁরা সকলে চলে গেলেন।

পিতার নিকট থেকে ফিরে এসে নওশেরওয়াঁ সে-দিনই একজন দূতকে দিয়ে পার্স-এর গুল নগরীতে পত্র মারফত সেখানকার জনৈক বৃদ্ধ ও জ্ঞানী ধর্মযাজককে লিখলেন, 'দ্রুত চলে আসুন, কারণ আমার পিতা, মাজদাক ও আমার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে।'

চল্লিশ দিনের দিন কোবাদ দরবার বসালেন। তিনি মঞ্চের উপরে বসলেন আর মাজদাক এসে বসল সিংহাসনে। কোবাদ নওশেরওয়াঁকে

আনতে হুকুম দিলেন। মাজদাক কোবাদকে বলল, 'তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদেরকে জবাব দিবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছে।' কোবাদ বললেন, 'বল তোমার কি বক্তব্য আছে?' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'আমি আমার ব্যবস্থা করছি।' তখন মাজদাক বলল, 'ব্যবস্থার সময় চলে গেছে, তাকে শাস্তি দেওয়া হোক।' কোবাদ চুপচাপ রইলেন। মাজদাক নওশেরওয়াঁকে গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দিল। ভৃত্যরা তাঁকে ধরতে গেলে তিনি রেলিং-এর উপরে হাত রাখলেন এবং তাঁর পিতাকে বললেন, 'আপনি আপনার নিজ বংশকে ধ্বংস করবার জন্য এত ত্বরান্বিত হচেছন কেন?' সময় এখনও অতিবাহিত হয় নি।' তাঁরা বললেন, 'সেটা কিভাবে হয়?' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'আমি পুরা চল্লিশ দিনের সময় চেয়েছিলাম এবং আজকার দিনটা চল্লিশ দিনের অন্তর্গত। এরপরে আপনার যা ইচছা করতে পারেন।' সেনাপতিরা ও ধর্মযাজকরা চীৎকার করে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'সে সত্য বলেছে। কথা ছিল চল্লিশ দিনের, তার এক দিনও কম নয়।' তখন কোবাদ বললেন, 'তাকে আজকের জন্য যেতে দাও।' তারপর তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হোল।

কোবাদ তখন দরবার-কক্ষ পরিত্যাগ করলেন এবং অন্যান্য সকলেও বিদায় নিল। মাজদাক ও নওশেরওয়াঁও যার যার বাড়ীতে ফিরে গেল। ঠিক তখনই নওশেরওয়াঁ পার্স থেকে যে ধর্মযাজককে ডেকেছিলেন, তিনি একটা দ্রুতচালিত উটের পিঠে চড়ে এসে হাজির হলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে তিনি নওশেরওয়াঁর প্রাসাদে এসে পৌঁছলেন। তিনি শান্তভাবে একজন ভৃত্যকে বললেন, 'যাও, নওশেরওয়াঁকে গিয়ে বল যে পারস্ থেকে ধর্মযাজক এসেছে এবং সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।' ভৃত্যটি দ্রুত গিয়ে নওশেরওয়াঁকে বলল। নওশেরওয়াঁ কামরা থেকে বের হয়ে এসে আনন্দে ধর্মযাজককে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে ধর্মযাজক, আজ আমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।' এবং তিনি তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললেন।

ধর্মযাজক বললেন, 'চিন্তা করো না, তুমি যা বলেছ সেটাই ঠিক। মাজদাক ভুল বলেছে। তোমার প্রতিনিধি হিসাবে আমি মাজদাককে উত্তর দেব এবং তার কৃতকর্মের জন্য কোবাদকে আমি অনুশোচনা করতে বাধ্য করাব ও পুনরায় তাকে সৎপথে আনব। কিন্তু আমি এখানে এসেছি সেটা মাজদাককে জানাবার পূর্বে আমাকে কোবাদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা কর।' নওরেশওয়াঁ বললেন, 'সেটা খুব সহজ। আজ রাত্রেই

আপনার জন্য রাজার সঙ্গে গোপনে দেখা করার ব্যবস্থা করব।' বিকাল বেলা নওশেরওয়াঁ তাঁর পিতার প্রাসাদে গিয়ে দেখা করতে চাইলেন। দেখা করার সময় তিনি তাঁর পিতার প্রশংসা করে বললেন, 'পারস্ থেকে একজন ধর্মযাজক এসেছেন, তিনি মাজদাককে উত্তর দিবেন। কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন যে, রাজা যেন আজ রাত্রে গোপনে তাঁর বক্তব্য শুনেন, তাঁর সব প্রমাণ দেখেন এবং তারপর যেন রাজা তাঁর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।' কোবাদ বললেন, 'ঠিক আছে, তাঁকে নিয়ে আস।'

নওশেরওয়াঁ ফিরে এসে রাত্রিতে ধর্মযাজককে নিয়ে তাঁর পিতার কাছে গেলেন। ধর্মযাজক কোবাদকে আশীর্বাদ করলেন, তাঁর পূর্ব-পুরুষদের প্রশংসা করলেন এবং তারপর রাজাকে বললেন, 'মাজদাক ভুল করছে; এই কাজ তার শোভা পায় না।' রাজা বললেন, 'কেন?' ধর্মযাজক বললেন, 'আমি তাকে ভালভাবে চিনি এবং আমি তার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কেও জানি। সে জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে কিছু জানে কিন্তু তাদের বিধান সম্পর্কে তার ধারণা ভুল। এটা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন একজন লোকের আবির্ভাব হবে যে নবীত্ব দাবি করবে। সেই লোক একটা নতুন পুস্তক নিয়ে আসবে, অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করবে এবং চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করবে (কোরআন: সুরা ৫৪—চন্দ্র সম্পর্কিত), সে লোকদের ডেকে ভাল কথা বলবে এবং পারসিক পুরোহিতমণ্ডলীদের ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মকে বাদ দেবার জন্য একটা ধর্মের প্রচলন করবে। সে বেহেশ্‌তের আশা দেখাবে এবং দোজখের ভয় দেখাবে। সে ঐশ্বরিক আইন দ্বারা লোকের সম্পত্তি ও স্ত্রীদেরকে রক্ষা করবে। সে শয়তানকে শায়েস্তা করবে এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। সে অগ্নি-মন্দির ও প্রতিমা-মন্দির বিনষ্ট করবে এবং তার ধর্ম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে ও কেয়ামতের দিন পর্যন্ত থাকবে। বেহেশ্‌ত ও দুনিয়া তার নবুয়তের সাক্ষ্য দিবে। আর এই মাজদাকের সাধ জেগেছে যে সে সেই ব্যক্তি হবে। প্রথমতঃ ঐ লোক পারস্যবাসী হবে না কিন্তু মাজদাক একজন পারস্যবাসী। সে লোকদের অগ্নিপূজা করতে বারণ করবে এবং জরথুস্ত্রকে অস্বীকার করবে কিন্তু মাজদাক জরথুস্ত্রপন্থী এবং সে অগ্নিপূজায় বিশ্বাসী। সেই অনাগত নবী কোন লোককে অন্যের স্ত্রীর প্রতি তাকাতে দিবে না বা কারো সম্পত্তি থেকে এক কণাও সে নিতে দিবে না। অন্যায়ভাবে অর্জিত একটা দিরহামের জন্য সে হাত কেটে ফেলার হুকুম দিবে কিন্তু মাজদাক সম্পত্তি ও স্ত্রীলোকদেরকে সাধারণের সম্পত্তি করেছে। সেই নবী

আসমান থেকে আদেশ পাবে এবং ফেরেশ্‌তাদের প্রেরণায় কথা বলবে কিন্তু মাজদাক আগুনকে অনুসরণ করে। মাজদাকের ধর্মের কোন ভিত্তি নাই। কালই আপনার সামনে তাকে আমি অপমানিত করব, কারণ সে ভুল করছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হোল আপনার পরিবার থেকে রাজত্ব নেওয়া এবং আপনার ধনাগার শেষ করে আপনাকে প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষের সমান করে দেওয়া।' তাঁর কথাগুলো কোবাদের কাছে ভাল লাগল এবং গ্রহণীয় মনে হল।

পরের দিন কোবাদ দরবার বসালেন। মাজদাক সিংহাসনে বসল, নওশেরওয়াঁ দাঁড়িয়ে রইলেন মঞ্চের সামনে আর পারিষদবর্গ ও ধর্মযাজকরা বসলেন যাঁর যাঁর জায়গায়। তখন পারস্ থেকে আগত ধর্মযাজক মাজদাককে বললেন, 'তুমিই কি প্রথমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, না আমি করব?' মাজদাক বলল, 'আমিই জিজ্ঞাসা করব।' ধর্মযাজক বললেন, 'তুমি যদি চাও যে তুমি প্রশ্ন করবে এবং আমি উত্তর দিব, তাহলে তুমি আমার জায়গায় এস আমি যাই তোমার জায়গায়।' মাজদাক লজ্জিত হয়ে বলল, 'রাজা নিজেই আমাকে এখানে বসিয়েছেন; আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর দিব।' ধর্মযাজক বললেন, 'তুমি সম্পত্তি বণ্টনের কথা ঘোষণা করেছ; এটা কি সত্য নয় যে লোকেরা সরাইখানা, পুল এবং মসজিদ তৈরী করে পরকালে পুণ্য লাভের জন্য?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি তখন বললেন, 'সম্পদ যদি অন্যান্য সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে সৎ কাজ করলে পুণ্যটা কে পাবে?' মাজদাক উত্তর দিতে পারল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি স্ত্রীলোকদেরকে সাধারণ সম্পত্তিরূপে গণ্য কর; মনে কর, বিশজন লোক একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করায় স্ত্রীলোকটী অন্তঃসত্বা হয়; সে সন্তান প্রসব করলে বাচ্চাটা কার হবে?' মাজদাক উত্তর দিতে সক্ষম হোল না। তখন তিনি বললেন, 'তোমার উদ্দেশ্য হোল লোকদের বংশ বিবরণ এবং অধিকৃত বস্তুসমূহ একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়া। আমাদের এই রাজার কথাই ধর। তিনি হলেন ফিরোজ রাজার ছেলে এবং এই সিংহাসন তিনি তাঁর পিতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, যেমনি করে পেয়েছিলেন ফিরোজ রাজা তাঁর পিতার থেকে। দশজন বিভিন্ন লোক যদি রাজার পত্নীর সঙ্গে সহবাস করে এবং তার ফলে যদি একটা শিশুর জন্ম হয় তাহলে তাঁরা কিভাবে নির্ধারণ করবেন যে সেটা কার শিশু? বংশানুক্রমতা কি নষ্ট হয়ে যাবে না? আর সেটা ঘটলে রাজত্ব

নিশ্চয়ই অন্য পরিবারে চলে যাবে। ধনী অথবা দরিদ্র হওয়ার উপর নির্ভর করে পদমর্যাদা। কোন লোক যদি দরিদ্র হয় তাহলে প্রয়োজনের তাগিদে সে কোন ধনী লোকের অধীনে চাকরি নিতে বাধ্য হয় আর এভাবেই উঁচু-নীচু পদভেদ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সব সম্পত্তি বণ্টন করে দিলে দুনিয়াতে পদমর্যাদার পার্থক্য আর থাকবে না। ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি হবে রাজার সমান এবং সত্যিকারভাবে রাজার কোন পদ-মর্যাদাই থাকবে না। তুমি পারস্যের রাজপরিবারের সম্পত্তি ও সার্বভৌমত্ব পদদলিত করতে এসেছ।' মাজদাকের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হোল না, সে নিশ্চুপ হয়ে রইল। কোবাদ বললেন, 'তাঁর প্রশ্নের উত্তর দাও।' মাজদাক বলল, 'আমার উত্তর হোল আপনার এক্ষুণি তার শিরশ্ছেদ করার হুকুম দেওয়া উচিত।' কোবাদ বললেন, 'কোন প্রমাণ ছাড়া একটা লোকের শিরশ্ছেদ করা যায় না।' সে বলল, 'আমি আগুনকে জিজ্ঞাসা করব দেখি কি বলে, কারণ আমি যা বলছি সেগুলো আমার কথা নয়।' নওশেরওয়াঁর লোকেরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল কিন্তু এখন যেহেতু সে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছে তাই তারা আনন্দিত হোল। মাজদাক কোবাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হোল, কারণ সে ধর্মযাজক ও নওশেরওয়াঁকে হত্যা করতে বলেছিল কিন্তু তিনি তা করেন নাই। মাজদাক মনে মনে ভাবল, 'কৃষক সম্প্রদায় ও সৈনিকদের মধ্যে এখন আমার অনুচরের সংখ্যা অনেক। কোবাদকে আমার সরানোর বন্দোবস্ত করতেই হবে এবং তারপর আমি নওশেরওয়াঁ ও আমার অন্যান্য শত্রুদের হত্যা করব।' যাই হোক তারা সকলে মনস্থ করল যে, পরের দিন অগ্নি-মন্দিরে গিয়ে দেখবে সেখান থেকে কি হুকুম হয় এবং তারপর সকলে বিদায় নিল।

রাত্রি হলে মাজদাক তার দুই চাটুকারকে ডেকে টাকা-পয়সা উপহার দিল এবং তাদেরকে সেনাপতি করার প্রতিজ্ঞা করল। তখন তাদেরকে এই কথা কাউকে না বলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তাদের হাতে দুটো তলোয়ার দিয়ে সে বলল, 'আগামীকাল কোবাদ ধর্মযাজক ও ওমারাদের সহ অগ্নি-মন্দিরে এলে আগুন যদি কোবাদকে হত্যা করতে হুকুম দেয় তাহলে তোমরা সোজা তলোয়ার তুলে তাকে মেরে ফেলবে। অন্য কেউ সশস্ত্রভাবে অগ্নি মন্দিরে আসবে না।' তারা বলল, 'আমরা রাজি আছি।' পরের দিন ধর্মযাজক ও ওমারাদের সঙ্গে কোবাদ অগ্নি-মন্দিরে গেলেন। তখন ধর্মযাজক নওশেরওয়াঁকে বললেন, 'তোমার অধীনস্থদের দশজনকে অগ্নি-মন্দিরে যাবার সময় কাপড়ের ভিতরে তলোয়ার নিয়ে

বল, কারণ মাজদাক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। নওশেরওয়াঁ অনুরূপভাবে প্রস্তুত হয়ে অগ্নি-মন্দিরে গেলেন। মাজদাক অগ্নি-মন্দিরের ভিতরে যাবার পূর্বেই তার চাটুকারকে বলে রাখত গর্তের ভিতর থেকে কি বলতে হবে। সুতরাং সে চাটুকারকে কি বলতে হবে সেটা বলে নিজেই মন্দিরের ভিতরে গেল। সে ধর্মযাজককে বলল, 'আপনিই আগুনকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলুন।' ধর্মযাজক আগুনকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন কিন্তু কোন উত্তরই পেলেন না। তখন মাজদাক আগুনকে বলল, 'আমাদের মধ্যে বিচার করে সাক্ষ্য দাও যে আমিই সত্য বলছি।' আগুনের মধ্য থেকে শব্দ বেরিয়ে এল, কাল থেকে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। কোবাদের হৃৎপিণ্ড এবং কলিজা খেতে দিলে আমি শক্তিশালী হয়ে তোমাদেরকে বলতে পারব কি করতে হবে। মাজদাক তোমাদের শাশ্বত শান্তির পথদিশারী।' তখন মাজদাক বলল, 'আগুনকে শক্তিশালী কর।' সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোক দু'টি তলোয়ার নিয়ে কোবাদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করল। ধর্মযাজক নওশেরওয়াঁকে বললেন, 'কোবাদকে রক্ষা কর।' নওশেরওয়াঁ তাঁর ঐ দশজন লোকসহ তলোয়ার নিয়ে লোক দু'টিকে প্রতি-আক্রমণ করে কোবাদকে আঘাত করতে দিলেন না। এদিকে মাজদাক অনবরত বলছিল, 'আগুন আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করেছে।' লোকেরা তখন দুই দলে বিভক্ত হোল। একদল বলল, 'কোবাদকে মৃত অথবা জীবিত অবস্থায় আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হোক।' অন্যেরা বলল, 'ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করা হোক।' দিন শেষে তারা ফিরে গেল এবং কোবাদ বলছিলেন, 'সম্ভবতঃ আমি কোন পাপ করেছি যার জন্য আগুন আমাকে খেতে চাচ্ছে। যাই হোক, পরকালের আগুনের চেয়ে ইহকালের আগুনে ভস্মীভূত হওয়াই বরং আমার পক্ষে ভাল।'

এরপরে ধর্মযাজকের সঙ্গে কোবাদের একাকী দেখা হলে তিনি তাঁকে পূর্বতন ধর্মযাজক ও রাজাদের গল্প বর্ণনা করে সেগুলোকে যুক্তিস্বরূপ দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে মাজদাক কোন নবী নয়, বরং রাজপরিবারের শত্রু। তার প্রমাণ সে প্রথমে নওশেরওয়াঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। সেটা যখন পারল না, তখন কোবাদকে মারতে উদ্যত হোল। সে কেন খেয়াল-খুশিমত বলছে যে আগুন ঐ কথা বলেছে—যদিও আগুন পূবে কোন কথাই বলেনি আর তখন হঠাৎ করে বলতে যাবে কেন। তিনি তার প্রতারণা প্রকাশ করে দেবার পন্থা বের করবেন এবং রাজাকে দেখিয়ে

দেবেন যে আগুনই কথা বলেছে, না অন্য কেউ কথা বলেছে। তিনি রাজাকে এমনিভাবে বিগলিত করে ফেললেন যে রাজা তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করলেন। তখন ধর্মযাজক পুনরায় বললেন, 'নওশেরওয়াঁকে শিশু মনে করবেন না, কারণ সে সারা দুনিয়ার খবরাখবর রাখে। সিংহাসন যদি নিজ বংশে রাখতে হয়, তাহলে তার কাজে বাধা দিবেন না। আর আপনার কোন গোপনীয় কথা মাজদাককে বলবেন না।'

ধর্মযাজক তারপর নওশেরওয়াঁকে বললেন, 'আমি চাই, তুমি মাজদাকের একজন ভৃত্যকে টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করে আগুন সম্পর্কে সত্য কথা বলাতে চেষ্টা কর যাতে আমি তোমার পিতার মন থেকে সব সন্দেহ দূর করে দিতে পারি।' নওশেরওয়াঁ এক ব্যক্তিকে মাজদাকের এক চাটুকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে তাঁর কাছে আনবার জন্য পাঠালেন। চাটুকার এলে নওশেরওয়াঁ তাকে তাঁর এক গোপন কামরায় নিয়ে বসালেন এবং তার সামনে এক হাজার দিনার রেখে বললেন, 'আমি তোমার কাছে একটা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব ; যদি সত্য বল, তাহলে তোমাকে এই এক হাজার দিনার দিব এবং তোমাকে আমার অন্তরঙ্গদের একজন করে উচ্চপদে উন্নীত করব। আর মিথ্যা বললে তোমার শিরশ্ছেদ করব।' লোকটি ভীত হয়ে বলল, 'আমি যদি সত্য বলি আপনি কি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশী করব।' তখন লোকটি বলল, 'আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সত্য কথা বলব।' নওশেরওয়াঁ তখন বললেন, 'আমাকে বল, মাজদাক কি কৌশল অবলম্বনে আগুনকে দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলিয়েছে।' লোকটি বলল, 'এ বিষয়ে আপনাকে যদি আমি সত্য কথা বলি, আপনি কি মাজদাক থেকে আমাকে ও আমার গোপনীয়তাকে রক্ষা করতে পারবেন?' তিনি বললেন, 'আমি পারব।' লোকটি তখন বলল, 'অগ্নি-মন্দিরের কাছে একটু জায়গা আছে; মাজদাক সেটাকে কিনে নিয়ে তার চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। সেখান থেকে শুরু করে অগ্নি-মন্দিরের মধ্যস্থল পর্যন্ত সে একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে আর তার মুখের উপরে তৈরী করেছে একটি গর্ত। সে সব সময় তার একজন চাটুকারকে সুড়ঙ্গের ভিতরে নিয়ে গর্তের সামনে মুখ রেখে বিশেষ বিশেষ কথা বলতে নির্দেশ দেয়— যাতে যে-কেউ শুনলে মনে করবে যে আগুনই কথা বলছে।' নওশেরওয়াঁ এই কথা শুনে বুঝলেন যে লোকটা সত্য কথা বলছে তাই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে লোকটাকে এক হাজার দিনার দিয়ে দিলেন।

রাত্রিবেলা নওশেরওয়াঁ লোকটাকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে তার মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলো আবার বলান হোল। কোবাদ মাজদাকের ধড়িবাজি ও ঔদ্ধত্য দেখে বিস্মিত হলেন এবং তাঁর মনে আর কোন সন্দেহই রইল না। অবিলম্বে ধর্মযাজককে ডেকে আনা হোল। কোবাদ তাঁর খুব প্রশংসা করলেন এবং তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। ধর্মযাজক তখন বললেন, 'হে রাজা, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে সে একজন প্রবঞ্চক।' কোবাদ বললেন, 'এখন আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু তাকে ধ্বংস করার সবচেয়ে উত্তম কি পথ আছে?' ধর্মযাজক বললেন, 'সে নিশ্চয়ই জানে না যে আপনি তার প্রতারণা সম্পর্কে জেনে গেছেন এবং ভুল স্বীকার করে পূর্বের মত প্রত্যাহার করেছেন। তাই আপনি আরেকটা সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেন যেখানে আমি সকলের সামনে তার সঙ্গে বিবাদ বাধাব। শেষ পর্যন্ত আমি তার কাছে হার মেনে পারসে ফিরে যাব। তারপরে আপনি নওশেরওয়াঁর কথামত কাজ করবেন যাতে ব্যাপারটা মীমাংসা হয়ে যায়।' কয়েকদিন পরে কোবাদ পারস্ থেকে আগত ধর্মযাজকের পক্ষ নিয়ে মাজদাকের সঙ্গে বিবাদ করে তার দাবীকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওমারা ও ধর্মযাজকদেরকে ডাকলেন।

পরের দিন দরবার বসল। কোবাদ বসলেন মঞ্চের উপর আর মাজদাক বসল সিংহাসনে। সব ধর্মযাজকই একে একে তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। তখন পারস্ থেকে আগত ধর্মযাজক বললেন, 'আগুনের কথা বলাটাই আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়।' মাজদাক বলল, ''আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই। আপনাদের কি মনে নাই কিভাবে মূসা একটি যষ্টিকে সর্পে পরিণত করেছিলেন; এক টুকরো পাথর থেকে বারটা ঝরণা বইয়ে দিয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি সমুদ্রের পানি বিভক্ত করে বলেছিলেন, 'হে খোদা ফেরাউনকে তার দলবলসহ ডুবিয়ে দাও' আর আল্লাহ্‌ও তাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন? আল্লাহ্ মাটিকেও মূসার কথা শুনতে বাধ্য করেছিলেন এবং যখন মূসা বলেছিলেন, 'হে মাটি, কারূনকে গ্রাস করে ফেল', মাটি তাকে গ্রাস করেছিল। আর মূসাও মৃতদেরকে জীবিত করেছিলেন। এগুলো মানুষের শক্তির আওতার মধ্যে নয় কিন্তু আল্লাহ্ সবই পারেন। আমিও একজন ধর্মপ্রচারক মাত্র এবং আল্লাহ্‌ই আগুনকে আমার বাধ্য করেছে। আপনি যদি আমি যা বলি এবং আগুন যা হুকুম করে সেমত চলেন, তাহলে ইহকালে ও পরকালে মুক্তি লাভ করবেন আর যদি না শুনেন তাহলে আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে

ধ্বংস করে দিবেন।'' পার্‌স্‌ থেকে আগত ধর্মযাজক দাঁড়িয়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও আগুনের কথা শুনে তার সম্পর্কে আমার বক্তব্য কিছুই নাই। আমি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আর ঝগড়া করতে চাই না—যিনি এমন কিছু করতে পারেন যা আমি পারি না। আমি চলে যাচ্ছি; আমার অনুমান আমি আর দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি না।' এই বলে তিনি পার্‌সের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। কোবাদ দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করলেন আর মাজদাক গেল অগ্নি-মন্দিরে আগুনকে সাত দিনের অর্ঘ দিতে। অন্যান্য সকলে বাড়ী ফিরে গেল এবং যারা মাজদাকের ধর্মে আস্থা স্থাপন করেছিল, তারা তাকে আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করল ও আনন্দিত হোল।

রাত্রিবেলা কোবাদ নওশেরওয়াঁকে ডেকে বললেন, 'ধর্মযাজক চলে গেছেন আর আমাকে রেখে গেছেন তোমার মর্জির উপর, কারণ তুমি এই ধর্মের পতন ঘটিয়ে দেবার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তুমি এখন কি উপায় অবলম্বন করতে চাও?' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'আপনি যদি আমার উপর সব কাজের ভার ছেড়ে দেন এবং কাউকে কিছু না বলেন তাহলে আমি মাজদাক ও মাজদাকের ধর্মাবলম্বীদের চিহ্ন দুনিয়া থেকে মুছে দেবার উপায় অবলম্বন করতে পারব।' কোবাদ বললেন, 'এই ব্যাপারে তুমি ছাড়া আর কারো কাছে কিছু বলব না। এটা শুধু তোমার-আমার মধ্যে গোপন থাকবে।' তখন নওশেরওয়াঁ বললেন, 'আপনি জানেন যে পার্‌সের ধর্মযাজক ভান করেই পরাজয় স্বীকার করে চলে গেছেন আর তার ফলে মাজদাক ও তার মতাবলম্বীরা উৎসাহী ও উত্তেজিত হয়েছে। সুতরাং তারা আমাদের বেড়াজালের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। এরপরে তাদের সঙ্গে আমরা যে ব্যবহারই করি না কেন, সবই বাঞ্ছনীয় হবে। মাজদাককে মারা খুব সহজ কিন্তু তার অনুচরদের সংখ্যা অনেক। মাজদাককে মেরে ফেললে তার অনুচররা সারা দুনিয়ার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়বে; তারা লোকদেরকে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করবে, তারা বড় বড় দুর্গ দখল করে আমাদেরকে ও আমাদের দেশকে বিপদে ফেলবে। আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়, কেউ পরিত্রাণ না পায়।' কোবাদ বললেন, 'কোন্‌টা তুমি সবচেয়ে ভাল উপায় মনে কর?' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'আমাদের কর্তব্য হবে মাজদাক অগ্নি-মন্দির ছেড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলে তার পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া এবং আগের চেয়ে বেশী সম্মান করা; এমনিভাবে আপনার নিজস্ব কামরায় একদিন কথা বলতে বলতে আপনি তাকে বলবেন যে

যেহেতু পার্সের ধর্মযাজক বশ্যতা স্বীকার করে পরাজয় বরণ করেছে, তাই আপনি আরো বশীভূত হয়েছেন, আপনি অনুশোচনা করছেন এবং তাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক।'

সপ্তাহ শেষে মাজদাক কোবাদের কাছে এলে, কোবাদ তার প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করলেন এবং পূর্বের শর্ত অনুসারে তার কাছে নওশেরওয়াঁর কথা বললেন। মাজদাক বলল, 'বেশীর ভাগ লোক নওশেরয়াঁর উপর নির্ভরশীল এবং তারা তার কথা ও কাজকে মান্য করে। সে যদি এই ধর্ম গ্রহণ করে, সারা দুনিয়া তাকে মেনে নিবে। এক্ষুণি আমি আপনাকে আমার মধ্যস্থতা করতে বলছি এবং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই ধর্মই নওশেরওয়াঁ গ্রহণ করে।' কোবাদ বললেন, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কারণ সে আমার উত্তরাধিকারী এবং সৈনিক ও কৃষকরা তাকে ভালবাসে।' মাজদাক বলল, 'সে আমার ধর্ম গ্রহণ করলে সারা দুনিয়ার আর কারো কোন অজুহাত থাকবে না।' কোবাদ বললেন, 'নওশেরওয়াঁ তোমার ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহ্র কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে গুগতাসদ যেমনি করে জরথুস্ত্রের সম্মানে সাইপ্রাসের কীসমারের উপরে একটি সোনার মণ্ডপ তৈরী করেছিলেন তেমনিভাবে আমিও তোমার সম্মানে তাইগ্রীসের মধ্যস্থলে একটা পাথরের চূড়া তৈরী করে তার উপরে এমন একটা স্বর্ণনির্মিত মণ্ডপ স্থাপন করব যেটা হবে সূর্যের মত উজ্জ্বল।' মাজদাক বলল, 'আপনি তাকে উপদেশ দেন, ততক্ষণ আমি প্রার্থনা করি; আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ্ আমার কথা শুনবেন।'

রাত্রিবেলা কোবাদ নওশেরওয়াঁকে সব খুলে বললেন। শুনে নওশেরওয়াঁ বললেন, 'এক সপ্তাহ পরে আপনি মাজদাককে ডেকে বলবেন, গত রাত্রে নওশেরওয়াঁ একটা স্বপ্ন দেখে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিল: খুব ভোরে সে আমার কাছে এসে বলল, সে স্বপ্ন দেখেছে যে, একটা বিরাট আগুন তাকে আক্রমণ করেছিল এবং সে কোথাও আশ্রয় খুঁজছিল, এমন সময় একজন সুপুরুষ এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল আগুন তার কাছে কি চেয়েছিল। সে বলল যে, আগুন তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছে কারণ সে আগুনকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে কিভাবে এটা জানল। সে বলল যে, ফেরেশ্তা সবকিছু সম্পর্কেই জ্ঞাত। তারপর সে জেগে যায়। এখন সে অগ্নি-মন্দিরে যাচ্ছে এবং আগুনের মধ্যে ফেলবার জন্য সঙ্গে নিচ্ছে অনেক তিমি মাছের অন্ত্রজাত চর্বি এবং মুসব্বর কাঠ (aloes-wood)। তিন দিনের জন্য সে আগুনের সেবা ও আল্লাহ্র

কাছে প্রার্থনা করতে যাচ্ছে।' কোবাদ এগুলো বললেন আর মাজদাক হোল অত্যন্ত খুশী।

এক সপ্তাহ পরে নওশেরওয়াঁ তাঁর পিতাকে মাজদাককে বলতে বললেন যে, নওশেরওয়াঁ তাঁকে বলেছে, 'আমি এখন নিশ্চিত যে এই ধর্মই সত্য এবং মাজদাক একজন আল্লাহ্-প্রেরিত ধর্মপ্রচারক। আমি তাকে অনুসরণ করতে চাই কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে কারণ বেশীর ভাগ লোকই এই ধর্মের বিরোধী। আমাদের নিশ্চয়ই তাদেরকে বিদ্রোহ করতে দেওয়া উচিত নয় এবং দেশটাকে জোরপূর্বক দখলও করতে দেওয়া উচিত নয়। আমি যদি জানতে পারতাম কতলোক এই ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তারা কে কে। তারা যদি সংখ্যায় অনেক এবং শক্তিশালী হয় তাহলে নিশ্চয়ই ভাল, নতুবা সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়ে শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব এবং তাদেরকে আমি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করব। তারপরে আমাদের হাতে পুরা ক্ষমতা এলে আমরা আমাদের ধর্ম প্রচার করব এবং এটা গ্রহণ করতে লোকদের প্রতি জোর করব।' নওশেরওয়াঁ আরও বললেন, 'মাজদাক যদি বলে যে তার অনুচরদের সংখ্যা অনেক তাহলে তাকে বলবেন একটা রেজিস্টারী খাতায় তাদের প্রত্যেকের নাম লিখতে, যাতে আমাকে দেখিয়ে উৎসাহিত করতে পারে এবং এর থেকে দূরে থাকার কোন অজুহাত না থাকে। এর দ্বারা আমরা মাজদাকের ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এবং তারা কারা, সেটা জানতে পারব।' কোবাদ কথাগুলো মাজদাকের কাছে বললেন, মাজদাক সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'বহু লোক এই ধর্ম গ্রহণ করেছে।' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে একটা রেজিস্টারী খাতা তৈরী করে আমার নির্দেশ মত কাজ কর যাতে নওশেরওয়াঁর আর কোন অজুহাত না থাকে।' মাজদাক তাই করে রেজিস্টারী খাতা কোবাদকে দেখাতে আনল। তাঁরা নামগুলো গুণে দেখলেন শহরবাসী, গ্রামবাসী এবং সৈনিকদের মিলে মোট ১২,০০০ জন। কোবাদ বললেন, 'আজ রাত্রেই আমি নওশেরওয়াঁকে ডেকে খাতাটা তাকে দিব; সে যদি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি ঢাক এবং তূরী বাজিয়ে সেটা এমন জোরে ঘোষণা করে দেব যে—তুমি তোমার প্রাসাদে থেকেও ঢাক ও তূরীর শব্দ শুনে বুঝতে পারবে যে নওশেরওয়াঁ আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে।'

মাজদাক চলে গেলে রাত্রিবেলা কোবাদ নওশেরওয়াঁকে ডেকে খাতাটা দেখালেন এবং মাজদাকের সঙ্গে বন্দোবস্তকৃত সঙ্কেতের কথা তাঁকে বললেন। নওশেরওয়াঁ বললেন, 'চমৎকার হয়েছে; তাদেরকে

এখন ঢাক ও তূরী বাজাতে বলুন এবং আগামীকল্য মাজদাকের সঙ্গে আপনার দেখা হলে তাকে বলবেন যে নওশেরওয়াঁ খাতায় সদস্য সংখ্যা দেখে বিগলিত হয়ে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাকে আরো বলবেন যে, আমি বলেছি সদস্যসংখ্যা মাত্র ৫,০০০ হলেও চলত; যেহেতু সদস্য-সংখ্যা আছে ১২,০০০ সারা দুনিয়া আমাদের বিরোধিতা করলেও ভীত হবার কিছুই নাই এবং এরপরে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে আমি, আপনি ও মাজদাক একত্রে পরামর্শ করে করব।'

রাত্রি কিছুটা হলেই মাজদাক ঢাক ও তূরীর শব্দ শুনতে পেল। খুব আনন্দিত হয়ে সে বলল, 'নওশেরওয়াঁ আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে।' পরের দিন মাজদাক দরবার-কক্ষে গেল। কোবাদ মঞ্চের উপরে বসে নওশেরওয়াঁ যা বলেছেন সব মাজদাককে বললেন। মাজদাক শুনে খুব সন্তুষ্ট হোল। সকলে বিচার-কক্ষ পরিত্যাগ করলে, কোবাদ ও মাজদাক নিজস্ব কামরায় বসলেন এবং তাঁরা নওশেরওয়াঁকে ডেকে পাঠালেন। নওশেরওয়াঁ এসে মাজদাকের সামনে অসংখ্য স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান উপহার রাখলেন এবং উৎসবের সময়ের মত অকাতরে মুক্তা ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তাঁর পূর্ব ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং তারপরে তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। শেষ পর্যন্ত নওশেরওয়াঁ তাঁর পিতার কাছে এই কথা বললেন এবং তাঁরা সকলে এটা মেনে নিলেন, 'আপনি সারা দুনিয়ার রাজা আর মাজদাক হোল আল্লাহ্-প্রেরিত ধর্মপ্রচারক। আমার উপর সৈনিকদের ভার অর্পণ করুন; আমি দেখতে চাই দুনিয়াতে এমন কে আছে যে আমাদেরকে এবং আমাদের ধর্মকে মানবে না। সকলেই স্বেচ্ছায় এবং কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে।' কোবাদ ও মাজদাক বললেন, 'তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হোল।' নওশেরওয়াঁ বললেন, 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি মাজদাক প্রতি জেলায় তার অনুচরদের কাছে চিঠি লিখে এবং সংবাদদাতা পাঠিয়ে তাদের প্রত্যেককে তিন মাস পরে অমুক সপ্তাহের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে আমাদের প্রাসাদে উপস্থিত হতে বলে দেয়। আজ থেকে ঐ দিন পর্যন্ত আমরা তাদের জন্য সব রকমের বন্দোবস্ত করতে থাকব কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কেউ জানবে না। নির্দিষ্ট দিনে আমরা একটা বিরাট ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশী লোকের জন্য একটা ভোজের বন্দোবস্ত করব। খাবারের পর তাদেরকে মদ্যপানের জন্য অন্য একটা কক্ষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তারা প্রত্যেকে সাত পেয়ালা করে মদ খাবে। তারপরে বিশ জন অথবা তিরিশ জন করে

এক এক করে নিয়ে তাদেরকে সসম্মানে ভূষিত করব যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলেই উপাধি পায়। যদি কোন লোক অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণভাবে সজ্জিত না থাকে তাহলে তাকে তার প্রয়োজনীয় সবকিছু অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে সেগুলো পরিধান করতে বলব। সেই রাত্রেই আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়ব ধর্ম প্রচারার্থে। যারা এই ধর্ম গ্রহণ করবে তাদেরকে কিছু বলা হবে না আর যারা এই ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে।' কোবাদ ও মাজদাক বললেন, 'তোমার কথা সম্পূর্ণ ঠিক।' এই কথায় রাযী হয়ে সকলে বিদায় নিল। মাজদাক সর্বত্র দূর বিদেশের সকল লোকের কাছে সাবধান বাণী উচচারণ করে চিঠি লিখল যে অমুক মাসের অমুক দিন তাদেরকে অস্ত্রেশস্ত্রে সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত থাকতেই হবে। সে তাদেরকে নিশ্চিত করল যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ীই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে ১২,০০০ সদস্যের সকলেই রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হোল। সেখানে তারা তাদের জন্য এমন ভোজের বন্দোবস্ত দেখল যা তারা আর কখনও দেখে নাই। কোবাদ মঞ্চের উপরে বসলেন, মাজদাক বসল সিংহাসনে আর নওশেরওয়াঁ দাঁড়িয়ে রইলেন যেন তিনি নিজেই অতিথিসেবক। মাজদাক আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। নওশেরওয়াঁ তখন প্রত্যেককে তার পদ অনুসারে টেবিলে বসিয়ে দিল। খাবার শেষ হলে তারা এই কক্ষ থেকে অন্য এক কক্ষে চলে গেল। সেখানে তারা এমন এক মিলনায়তন দেখতে পেল যা তারা পূর্বে কখনও দেখে নাই। কোবাদ ও মাজদাক মঞ্চের উপরে বসে রইলেন এবং সব অতিথিকে পূর্বের ন্যায় বসিয়ে দেওয়া হোল। চারণ কবিরা গান গাইতে শুরু করল আর মদ-পরিবেশকরা পরিবেশন করল মদ। কয়েক দফা খাওয়া হলে রেশমী কাপড় মণ্ডিত প্রায় দুই শত লোক এসে জনতার এক পার্শ্বে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে নওশেরওয়াঁ ঘোষণা করলেন, 'বিশেষ সম্মানিত পোশাক নিয়ে তারা অন্য হল কক্ষে চলে যাক কারণ এখানে খুব লোকের ভীড় হয়েছে ; অতিথিরা বিশ জন করে এবং ত্রিশ জন করে প্রবেশ করে তাদের এই বিশেষ পোশাক পরে নিবে, তারপরে তারা সেখান থেকে পোলো খেলার মাঠে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলের পোশাক পরা হয়। সবাইকে খেতাব দেওয়া হয়ে গেলে রাজা ও মাজদাক পোলো খেলার মাঠে এসে তাদেরকে পরিদর্শন করবেন। এর মধ্যে আমি অস্ত্রাগার খুলে অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবস্থা করব।' এর আগে নওশেরওয়াঁ

প্রাসাদ ও মাঠ থেকে ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার করার অজুহাতে কাউকে পাঠিয়ে গ্রাম থেকে তিন শত শ্রমিক আনিয়েছিলেন যাদের কোন বাঁধাধরা কাজ ছিল না। আর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একখানা করে কোদাল। শ্রমিকদেরকে পোলো খেলার মাঠে এনে জমায়েত করা হোল এবং দরজা বন্ধ করা হোল শক্ত করে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'আজ দিন ও রাত্রের মধ্যে এই মাঠে এক একটা দেড়গজ গভীর গর্ত করে মোট ১২,০০০ গর্ত করতে হবে। উঠানো মাটিগুলো গর্তের পার্শ্বেই রাখতে হবে।' তিনি দারোয়ানকে হুকুম দিলেন, গর্ত খনন করার পর ঐ লোকগুলো যেন চলে না যায়। ভোজের দিন রাত্রে তিনি পোশাক পরার কামরায় চার শত লোককে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করে লুকিয়ে রাখলেন এবং তাদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিলেন, 'বিশ অথবা ত্রিশ জনের প্রত্যেক দলকে মিলনায়তন থেকে পোশাক পরার রুমে আমি পাঠালে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাবে ; তাদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তাদের মাথা থেকে নাভি পর্যন্ত গর্তের ভিতরে রাখবে আর পা থাকবে উপরে তারপর কোদাল দিয়ে তাদের চারদিকে মাটি দিয়ে দিবে এবং পরে চাপ দিয়ে মাটিটা নীচের দিকে বসিয়ে দিবে যাতে তারা গর্তের সঙ্গে শক্তভাবে এঁটে যায়।'

কাপড় চোপড় ও বিশেষ পোশাকগুলো মিলনায়তন থেকে পোশাক পরার কক্ষে নিয়ে যাবার পর তারা সোনা ও রৌপ্যের সাজ, স্বর্ণনির্মিত ঢাল, বেল্ট ও তরবারীসহ দুইশত ঘোড়া আনল। নওশেরওয়াঁ তাদেরকে পোশাক পরার কক্ষে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি বিশ জন এবং ত্রিশ জনের দল করে তাদেরকে মিলনায়তনে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে তাদেরকে পোলো খেলার মাঠে নিয়ে মাথা নিচু করে গর্তের মধ্যে রেখে গর্ত ভর্তি করে দেওয়া হোল মাটি দিয়ে। এইভাবে তাদের সকলকে মেরে ফেলা হোল। তখন নওশেরওয়াঁ তাঁর পিতা ও মাজদাককে বললেন, 'তারা সকলে তাদের বিশেষ পোশাক পরে পোলো খেলার মাঠে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা এসে তাদেরকে দেখে যান।' কোবাদ ও মাজদাক উঠে মাঠের দিকে গেলেন। মাজদাক মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল শুধুমাত্র পাগুলো ছড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে। নওশেরওয়াঁ মাজদাকের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার মত লোক যে বাহিনীর সেনাপতি তাদের অভিষেক উৎসব এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? তুমি এসেছ শুধুমাত্র লোকের সম্পত্তি ও স্ত্রীদেরকে লুণ্ঠন করে নিতে এবং আমাদের পরিবার থেকে রাজত্ব

নিয়ে নিতে।' তারা মাঠের এক প্রান্তে একটা ছোট পাহাড় তৈরী করে তার মধ্যে খনন করেছিল একটা গর্ত। নওশেরওয়াঁর নির্দেশে তারা মাজদাককে নিয়ে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর তারা গর্তের ভিতরটা মাটি দিয়ে ভর্তি করে দিল যাতে উপর থেকে তার ঘাড় ও মাথা দেখা যায়। নওশেরওয়াঁ বললেন, 'এখন তোমার ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি তাকিয়ে দেখ!' আর পিতাকে বললেন, 'জ্ঞানীদের জ্ঞানকেই আঁকড়ে ধরুন! আপনার উচিত, আপাততঃ ঘরের ভিতরে অবস্থান করা যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকেরা এবং সেনাবাহিনী শান্তভাব ধারণ করে। কারণ এই বিপদটা আপনার দুর্বলতার জন্যেই হয়েছিল।' তাই তিনি তাঁর পিতাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দিলেন না। তাঁর হুকুমে যে সমস্ত গ্রামবাসীকে গর্ত খনন করতে আনা হয়েছিল, তাদেরকে বিদায় দেওয়া হোল; লোকেরা যাতে দৃশ্যটা দেখতে পারে সেজন্য খুলে দেওয়া হোল গেটগুলো আর তারা মাজদাকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার দাড়ি ও মোচগুলো উৎপাটিত করছিল। নওশেরওয়াঁ তখন তাঁর পিতাকে বন্দী করে রেখে ওমরাহ্‌দের ডেকে অবিসংবাদিত রাজা হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করে ন্যায় ও উদারতার সঙ্গে রাজত্ব শুরু করলেন। গল্পটা তাঁর স্মৃতি হিসাবে রয়েছে।

পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়

পারসিক পুরোহিত সিনবাদের বিদ্রোহ এবং খুররামীদের আবির্ভাব

নওশেরওয়াঁর সময় থেকে হারুন-অর-রশিদের সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে মাজদাক গোত্রের কারো আবির্ভাব হয় নাই। ঘটনাক্রমে মাজদাকের পত্নী খুররামা বিনতে ফাদা সাদাইন থেকে দুটো লোকের সঙ্গে পালিয়ে এসে রায় গ্রামে বাস করতে লাগল এবং লোকজনের কাছে তার স্বামীর ধর্মের কথা বলতে শুরু করল, ফলে কিছু সংখ্যক জরথুস্ত্রবাদী এই ধর্ম গ্রহণ করে। লোকেরা তাদের নাম দেয় খুররামী। তারা ধর্মের কথা গোপন রেখে সর্বদা সেটাকে জাগিয়ে তোলার অজুহাত খুঁজতে থাকে। ১৩৭ হিজরীতে আবু জাফর আল মনসুর যখন আবু মুসলিম শাহিব আদ-দৌলাকে বাগদাদে হত্যা করে, তখন নিশাপুর শহরে এক জরথুস্ত্রপন্থী মেয়র ছিল। তার নাম ছিল সিনবাদ। আবু মুসলিমের সঙ্গে এই লোকটার খুব গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং পরে তিনি তাকে সেনাপতির পদে উন্নীত করেছিলেন। আবু মুসলিমকে হত্যা করার পর সে বিদ্রোহ করে নিশাপুর থেকে রায়-এ চলে আসে এবং রায় ও তাবারিস্তানের জরথুস্ত্রপন্থীদের ক্ষেপিয়ে তুলে, কারণ সে জানতো যে কোহিস্তান ও ইরাকের লোকেরা বেশীর ভাগই রাফিদী এবং মাজদাকের ধর্মাবলম্বী। তার ধর্ম প্রচার করার জন্য সে প্রথমে হানাফী গোত্রের বা'উবাইদাকে হত্যা করে—যে ছিল আল-মনসুরের তরফ থেকে রায়-এর শাসনকর্তা। পরে রায়-এ আবু মুসলিমের ধনাগার লুণ্ঠন করে এবং এই ভাবে কিছু শক্তি সঞ্চয় করে সে আবু মুসলিমের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইলো। সে আবু মুসলিমের শিষ্যত্ব দাবী করলো এবং ইরাক ও খোরাসানের লোকদের বললো যে, 'আবু মুসলিম নিহত হন নি ; আল-মনসুর তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলে তিনি সুরা পড়ে একটা সাদা পায়রায় পরিণত হয়ে তার কাছ থেকে পালিয়ে গেছেন ; তারপরে তিনি একটা পিতল নির্মিত দুর্গে গিয়ে মেহদী ও মাজদাকের সঙ্গে বাস করছেন আর এই তিনজন শীঘ্রই আবির্ভূত হবেন ; আবু মুসলিম থাকবেন তাদের নেতা আর উজির হবে মাজদাক।' সে প্রচার করে বেড়াতো যে তার কাছে আবু মুসলিমের চিঠি আছে।

রাফিদীরা এবং মাজদাক ধর্মাবলম্বীরা যখন যথাক্রমে মেহদী ও মাজদাকের কথা শুনল, তখন রায়-এ এক বিরাট জনসমাবেশ হোল এবং সিনবাদের

অনুচরদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত ১,০০,০০০-তে এসে পেঁাছল। যখনই সে জরাথুস্ত্রপন্থীদের সঙ্গে একা থাকতো সে বলতো, 'সাসানীদের একটা বইয়ের বক্তব্য অনুসারে আরব সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গিয়েছে। কাবাকে শেষ না করে আমি ফিরব না, কারণ সূর্যের জায়গায় এটাকে স্থাপন করা হয়েছে (ভুলক্রমে); প্রাচীনকালের ন্যায় সূর্যকেই আমরা আমাদের কেবলাহ্ করব।' আর খুররামিদেরকে সে বলতো, 'মাজদাক শিয়া-গোত্রভুক্ত ছিল আর শিয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই ছিল তার নির্দেশ।' এইভাবে সে তিন গোত্রের লোকদেরকেই সন্তুষ্ট রাখতো। সে আল-মনসুরের সৈন্যদের কয়েকবার পরাজিত করেছিল এবং তাঁর কয়েকজন সেনাপতিকে হত্যা করেছিল, তাই সাত বছর পরে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আল-মনসুর জওহার ইজলীকে নিয়োগ করলেন। জওহার খুজিস্তান ও পার্সের সৈন্যদের তলব করে ইস্পাহানে গেলেন; তিনি ইস্পাহান ও কুম থেকে মিত্রসৈন্য যোগাড় করলেন এবং ইজলী-বাসীদেরকে তাঁর সঙ্গে নিলেন। তারপর রায়-এর দিকে অগ্রসর হয়ে সিনবাদের সঙ্গে তিনদিন ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। চতুর্থ দিনে জওহারের হাতে সিনবাদ প্রাণ হারাল এবং তার সঙ্গীরা হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল। তখন খুররামী ও জরাথুস্ত্রবাদ একত্র হয়ে গেল এবং দুই ধর্মের লোকেরা গোপনে আলোচনা চালাতে লাগল। আস্তে আস্তে তারা আরো সংঘবদ্ধ হয়ে এমন একটা স্তরে এসে পেঁাছল, যখন মুসলমানেরা ঐ সম্প্রদায়কে খুররামী বলা শুরু করল। জওহার সিনবাদকে হত্যা করার পর রায়-এ প্রবেশ করে সব জরথুস্ত্রবাদীকে মেরে ফেলেন এবং তাদের বাড়ীঘর লুট করে তাদের স্ত্রীদের ও ছেলে-মেয়েদের এনে বন্দী করে রাখেন।

ছেচল্লিশ অধ্যায়

কোহিস্তান, ইরাক ও খোরাসানে কারামাতী ও বাতিনীদের উত্থান

কারামাতী ধর্মের উৎপত্তি ছিল নিম্নরূপ : জাফর আস-সাদীকের ইসমাঈল নামে একটি পুত্র ছিল; পিতার মৃত্যুর পূর্বেই সে মুহম্মদ নামক এক পুত্র রেখে মারা যায়। এই মুহম্মদ হারূন-অর-রশিদের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল। যোবাইরীদের একজন হারূন-অর-রশিদকে ইঙ্গিত দেয় যে, মুহম্মদ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে এবং খেলাফত কেড়ে নেবার জন্যে গোপনে প্রচার কার্য চালাচ্ছে। হারূন-অর-রশিদ মুহম্মদকে মদিনা থেকে বাগদাদে ডেকে এনে তাকে জেলে দিলেন। জেলে থাকা অবস্থায়ই সে মারা যায় এবং তাকে কোরাইশদের গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়। মুহম্মদের মোবারক নামে এক হিজাজী ভৃত্য ছিল আর সে ছিল হস্তলিপি বিশারদ—যার পারদর্শিতা ছিল মুকারমাত লেখায়; এই জন্য তাকে বলা হোত কারামাতবী। এই মোবারকের আহবাজ নগরীতে আবদুল্লাহ ইবনে মাইমুন আল কাদদাহ নামে এক বন্ধু ছিল। আবদুল্লাহ একদিন মোবারকের সঙ্গে গল্প করতে করতে বলল, 'তোমার মনিব মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমার বন্ধু ছিলেন এবং তিনি আমার কাছে তাঁর গোপনীয় সবকিছু বলতেন।' মোবারক সেগুলো জানবার জন্য অস্থির হোল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাইমুন মোবারককে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাল যে সে যেন উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া তার এই কথা কাউকে না বলে। তখন সে ইমামদের ভাষা থেকে কতকগুলো অস্পষ্ট শব্দ, নিসর্গীদের প্রবাদ এবং দার্শনিকদের বক্তৃতা সংমিশ্রণে কতকগুলো উক্তি করল যার বহুলাংশে উল্লেখ ছিল হযরত মুহম্মদ ও ফেরেশ্তাদের কথা আর ছিল লিখনফলক ও কলম এবং বেহেশ্ত্ ও খোদার আরশের কথা। তারপর তারা বিদায় নিল। মোবারক গেল কুফার দিকে আর আবদুল্লাহ কোহিস্তান ও ইরাকের দিকে শিয়া গোত্রের লোকদের মন জয় করার জন্য।

এই ঘটনা ঘটেছিল মুসা ইবনে জাফর যখন জেলে ছিলেন। মুবারক গোপনে তার কার্য চালাতে লাগল এবং কুফা অঞ্চলে সম্প্রসারিত করল তার প্রচার কার্য। যারা তার মন্ত্র গ্রহণ করল সুন্নীরা তাদের

একদলকে বলল মুবারকী আর অন্যদেরকে কারামাতী। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাইমুন কোহিস্তানে এই ধর্ম প্রচার করছিল। সে খুব চতুর ভেল্কীবাজ ছিল এবং মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া (বাজী) তাঁর মাখারিক আল আম্বিয়া (নবীদের প্রবঞ্চনা) পুস্তকে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর সে খালাফ নামে একজনকে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে তাকে বলল, 'রায় অঞ্চলের দিকে যাও কারণ রায়, কুম এবং কাসান অঞ্চলের লোকেরা সকলে রাফিদী ; তারা শিয়া মতবাদ প্রচার করছে সুতরাং তারা এই মতবাদ মেনে নিবে।' আবদুল্লাহ নিজে বসরার দিকে রওনা হোল।

কাজেই খালাফ রায়-এর দিকে গেল। কাসাবুয়া জেলায় কিলিন নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে অবস্থান করে সে সূচিকার্যের কাজ করতে লাগল—এ কাজে সে খুব পারদর্শী ছিল। সে কিছুদিন যাবৎ তার গোপন কথা বলবার কোন লোক পেল না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টার ফলে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার কাছে এই ধর্মমত ব্যক্ত করল। সে প্রমাণ করতে চাইল যে, এই ধর্ম নবীর ঘরোয়া ব্যাপার এবং সেটা লুক্কায়িত রয়েছে। সে বলল, 'কাইয়ুমের (মেহদী) আবির্ভাব হলে এই ধর্ম প্রকাশ হয়ে যাবে আর তাঁর আসার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। তোমার এক্ষুণি লিখে নেবার সময়, কারণ যখন তাঁকে দেখবে তখন তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে না।' তাই সে গোপনে গোপনে গ্রামের লোকদেরকে ধর্মে দীক্ষা দিতে শুরু করল। একদিন কিলিনের সর্দার যখন গ্রামের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ থেকে ভেসে আসা একটা আওয়াজ শুনল। সে নিকটে গিয়ে শুনতে লাগল। খালাফ কিছু লোকের কাছে তার ধর্ম প্রচার করছিল। সর্দার গ্রামে ফিরে এসে বলল, 'হে জনগণ, এই লোকটার উদ্দেশ্য বিফল কর। তার নিকটে যেয়ো না। তাকে যা বলতে শুনেছি তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের গ্রামের লোকেরা তার কার্যকলাপের শিকার হতে পারে।' ঘটনাক্রমে খালাফের বক্তৃতা ছিল অশুদ্ধ এবং সে 'তে' ও 'হে' অক্ষরগুলো উচচারণ করতে পারে নাই। তার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে গেলে সে সেই গ্রাম থেকে পালিয়ে রায়-এর দিকে চলে যায় এবং সেখানে তার মৃত্যু হয়। সে কিলিন গ্রামের মাত্র কয়েকজন লোককে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপরে তার পুত্র আহমদ ইবনে খালাফ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পিতার ধর্ম প্রচার করতে শুরু করে। আহমদ ইবনে খালাফ গিয়াস নামে এক

লোকের সন্ধান পেয়েছিল, সে ছিল সাহিত্য ও ব্যাকরণে পারদর্শী। প্রচারকার্য চালিয়ে যাবার জন্য আহমদ তাকে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে।

গিয়াস তখন কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি, আরবী প্রবাদ এবং অন্যান্য উদ্ধৃতি ও গল্পের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার কার্য চালাচ্ছিল। সে 'কিতাব আল বয়ান' (ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পুস্তক) নামে একখানা পুস্তক রচনা করে তার মধ্যে অভিধানের ধরনে নামাজ, রোজা ইত্যাদি জাতীয় ধর্মীয় অনুশাসন-গুলোর ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে। তারপর সে সুন্নী মতবাদের লোকদের সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করে। কুম ও কাসানে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, কিলিন গ্রাম থেকে গিয়াস নামে এক ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়েছে, সে ভাল কথা বলছে এবং ধর্ম প্রচার করছে। এই দুই শহরের লোকেরা গিয়াসের কাছে দলে দলে সমবেত হয়ে তার এই নতুন ধর্মে দীক্ষা নিতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত খবরটা গিয়ে পোঁছল আইনজ্ঞ আবদ আল্লাহ জাফারানীর কাছে, আর তিনি জানতেন যে এই ধর্ম প্রচলিত ধর্মের বিরোধী। তাই তিনি রায়-এর লোকদের কাছে এই বিধর্মীদেরকে আক্রমণ করার জন্য আবেদন করলেন। এদের কিছু লোককে সুন্নীরা বলত খালাফী, আর কিছুদের বলত বাতিনী। হিজরী ২০০ সালের মধ্যে এই ধর্ম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঐ বছর সাহেব আল-হাল নামে এক ব্যক্তি সিরিয়াতে বিদ্রোহ করে সেখানকার বেশীর ভাগ এলাকা দখল করে। গিয়াসকে রায় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল আর সে খোরাসানে গিয়ে মার্ভ-আর-রুদে অবস্থান করে সেখানে সে আমীর হোসাইন ইবনে আলীকে ধর্মান্তরিত করল। হোসাইন নতুন ধর্মে দীক্ষিত হল। তার আধিপত্য বিস্তার লাভ করল খোরাসানে, বিশেষ করে তালিকান, মায়মানা, পারয়াব, ঘরচিস্তান এবং ঘুরে। নব ধর্মে দীক্ষা লাভ করে সে এই সমস্ত জেলার বহু লোককে ধর্মান্তরিত করে।

গিয়াস তখন মার্ভ-আর-রুদে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদেরকে দেখাশুনা করার জন্য এবং এদের সংখ্যা আরো বাড়ানোর জন্য সেখানে একজনকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে নিজে রায়-এ ফিরে গিয়ে পুনরায় ধর্ম প্রচার শুরু করে। তখন সে আরবী কবিতা ও মুখরোচক গল্পে পারদর্শী আবূ হাতিম নামে ফাসাবুয়া জেলার জনৈক লোককে প্রচারকার্য পরিচালনার ভার দেয়। এমন কি, খোরাসানে যাবার পূর্বেও সে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে অমুক বছরে মেহেদীর আবিভাব হবে এবং কারমাতিরা

তার কথায় বিশ্বাস করে। সুন্নীরা দেখতে পেল যে, গিয়াস ফিরে এসে পুনরায় বাতিনীদের ধর্ম প্রচার শুরু করেছে। 'এদিকে সে প্রচার করতে লাগল যে, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে মেহেদীর আবির্ভাব হবে এবং তার প্রচারকার্যে এই প্রবঞ্চনার কথা বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসছিল। যাই হোক, তার নির্দেশিত মেহেদীর আবির্ভাবের সময় হোল, কিন্তু তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হোল। শিয়ারা তখন তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে তাকে গালাগালি করল এবং তার বদনাম করল আর সুন্নীরা চাইল তাকে মেরে ফেলতে। কিন্তু সে পালিয়ে গেল, কেউ আর তার খোঁজ পেল না।

ঐ ঘটনার পর রায় শহরের একদল লোক খালাফের পৌত্রের সঙ্গে এক চুক্তি করে তার নেতৃত্ব মেনে নিল। তার যখন মৃতপ্রায় অবস্থা, তখন সে তার পুত্র আবু জাফরকে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করল। কিন্তু সে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার প্রতিনিধিরূপে কাজ করবার জন্য আবু হাতিম নামে জনৈক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হল। আবু জাফর সুস্থ হোতে হোতে আবু হাতিম ক্ষমতা জোরদার করে নিয়ে নিল এবং আবু জাফরের কোন তোয়াক্কা না করে নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করল। এইভাবে খালাফ পরিবার থেকে নেতৃত্ব চলে গেল। আবু হাতিম ও রায়-এর অঞ্চলের তাবারিস্তান, গুরগান, ইস্পাহান এবং আজারবাইজান জেলাগুলোতে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে লোকদেরকে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করল। রায়-এর আমীর আহমদ ইবনে আলী তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাতিনী ধর্ম গ্রহণ করল।

তখন ঘটনাক্রমে দাইলামীরা তাবারিস্তানের আলাভীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তারা বলল, 'তোমরা বল যে তোমাদের ধর্ম সত্য, কিন্তু আশে পাশের অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আমাদেরকে তোমাদের কথা শুনতে নিষেধ করছে; কারণ তোমরা বিধর্মী। তোমরা বলতে চাও যে, আমাদের গোত্র থেকে জ্ঞানের আলো চলে গেছে। কিন্তু জ্ঞান ত সাধারণের সম্পত্তি, জ্ঞান চলে যায় না। বিদ্যা শিখলেই জানা যায়; যে-ই বিদ্যা শিক্ষা করবে, সে-ই জ্ঞানী হবে। জ্ঞান কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। আল্লাহ্ মহানবীকে পাঠিয়েছিলেন সকলের জন্যই; তিনি কিছু লোককে আশরাফ বলে এবং অন্য সকলকে আতরাফ বলে আলাদা করেন নাই আর আশরাফদের জন্য এবং আতরাফদের জন্যও তাঁর কোন আলাদা নির্দেশ ছিল না। তাই আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি যে তোমরা মিথ্যাবাদী।' তাবারিস্তানের আমীর ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং

তিনি আলাভীদের সমর্থন করেছিলেন; দাইলামরা তাঁকেও অগ্রাহ্য করল এবং বলল, 'তোমাদের ধর্মে পুরাপুরি ইসলামী বিশ্বাস নাই আর এই সম্পকে বাগদাদ, ইস্পাহান ও খোরাসান থেকে দলিলপত্র আনা হয়েছে। তোমরা যদি শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলের কথামত চল, তাহলেই আমরা তোমাদেরকে মেনে নেব এবং তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করব। অন্যথায় তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। আমরা পর্বতের মানুষ এবং কারিগর; ধর্মীয় আইন সম্পর্কে আমরা খুব কম বুঝি।' ঘটনাক্রমে আবু হাতিম সেই সময় রায় থেকে তাবারিস্তানে গিয়ে দাইলামীদের সঙ্গে দেখা করে---যাদের নেতা ছিলেন সিরুই ইবনে বিরদাদাবান্দী। সে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এক চুক্তি করে এবং আলাভীদের নিন্দাবাদ করে। সে তাঁদের দুর্নাম করে তাঁদেরকে নাস্তিক ও বেধার্মিক বলে আখ্যায়িত করল এবং বলল, 'শীঘ্রই দাইলামীদের মধ্যে থেকে একজন ইমামের আবির্ভাব হবে আর তাঁর মতবাদ ও আলোচ্য বিষয় কি হবে তা আমি জানি।' দাইলামী ও গিলানবাসীরা তার কথায় বিশ্বাস করে তার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করল। এই সমস্ত ঘটেছিল মারদাভিজের সময়ে। 'বৃষ্টি থেকে পালিয়ে এসে তারা পড়েছিল নরদমার মধ্যে।' তারা গোঁড়া হতে গিয়ে বিধর্মীপনার ফাঁদে পতিত হোল। কিছুদিন যাবৎ এইরূপ চলল।

তারা যখন দেখল যে, তার নির্দেশিত ইমামের আবির্ভাবের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে তখন বলল, 'এই ধর্ম ভিত্তিহীন; মনে হয় এটা নগণ্য প্রবঞ্চকের পরিকল্পনা মাত্র।' তারা তাকে পুরাপুরিভাবে বর্জন করল এবং মহা নবীর পরিবারের প্রতি তাদের নূতনভাবে শ্রদ্ধা জাগল। তারা আবু হাতিমকে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করল, কিন্তু সে পালিয়ে গেল এবং পালিয়ে যাবার সময় মারা গেল। তারপর থেকে শিয়াদের ধর্ম প্রচারের ব্যাপারটা বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসে পর্যবসিত হোল। তাদের অনেক মতাবলম্বী পূর্বমত প্রত্যাহার করল এবং অনুশোচনা করে সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করল। শিয়াদের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিদ্যমান রইল, কিন্তু তারা গোপনে গোপনে সংঘবদ্ধ হোল এবং শেষ পর্যন্ত আবদ-আল-মালিক কাওকবি এবং ইসহাকের নেতৃত্ব মেনে নিল। ইসহাক ছিল রায়-এর বাশিন্দা আর কাওকবি বাস করত গিরদ্কুহ্তে

খোরাসানের আমীর ছিলেন নাসর ইবনে আহমদ। গিয়াস কর্তৃক বাতিনী মতবাদে দীক্ষিত হোসাইন ইবনে মার্ভ-আর-রুদি মরণাপন্ন

অবস্থায় মোহাম্মদ ইবনে আহমদ নাখসাবীকে খোরাসানের প্রচারকার্য পরিচালনা করার ভার দেয় এবং তাকে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে। এই ব্যক্তি খোরাসানের বিখ্যাত দার্শনিকদের দলভুক্ত ছিল এবং সে ছিল ধর্মতত্ত্ববিদ। হোসাইন তাকে নির্দেশ দিল ঐ জায়গার একজন সহকারীকে রেখে আমুদরিয়া পার হয়ে বোখারা ও সমরকন্দে গিয়ে সেই সমস্ত শহরের লোকদেরকে ধর্মান্তরিত করতে, বিশেষ করে, খোরাসানের আমীর নাসর ইবনে আহমদের রাজ্য পারিষদদেরকে। এতে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তাই হোসাইনের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ নাখসাবী তার স্থান দখল করে খোরাসানের বহু লোককে ধর্মান্তরিত করল এবং তারা তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিল। সাওপদার পুত্র নামে পরিচিত এক ব্যক্তি রায়-এ সুন্নীদের থেকে রেহাই পেয়ে খোরাসানে হোসাইন মার্ভ-আর-রুদীর কাছে পালিয়ে যায়; সে ছিল বাতিনীদের একজন নেতা। মোহাম্মদ নাখসাবী তাকে মার্ভ-আর-রুদেতে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে নিজে নদী পার হয়ে বোখারায় চলে যায়। সে দেখল, সেখানে তার মতবাদের তেমন কদর নাই; তাই সে প্রকাশ্যে আসতে সাহস পেলো না। সে সেখান থেকে নাখসাবে গিয়ে খোরাসানের আমীরের এক কালের বন্ধু এবং তার আত্মীয় আবু বকর নাখসাবীকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হলেন। সে আসাদকেও ধর্মান্তরিত করল—যিনি ছিলেন আমীরের নিজস্ব কর্মসচিব এবং বন্ধু সমতুল্য। অন্যান্য ধর্মান্তরিতদের মধ্যে সামরিক বিভাগের প্রধান এবং আসাদের ভগ্নীপতি আবু মনসুর এবং আমীরের নিজস্ব গৃহাধ্যক্ষ এবং উপরোক্ত ব্যক্তিদের বন্ধু আইতাস।

এই লোকগুলো তখন মোহাম্মদ নাখসাবীকে বলল, 'আপনার আর নাখসাবে থাকার প্রয়োজন নাই; আপনি রাজধানী বোখারাতে চলে যান। আমরা আপনার আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করতে চেষ্টা করব এবং নামকরা লোকদেরকে এই ধর্মে দীক্ষিত করব।' সে নাখসাব থেকে বোখারায় গিয়ে ওমরাহদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের মধ্যে তার প্রচার কার্য চালালো। সে তার ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্তদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করালো, তারা যেন জনগণের কাছে সে নিজে সব প্রকাশ করার পূর্বে কিছু না বলে। প্রথমে শিয়া ধর্ম প্রচার করছিলো; পরে আস্তে আস্তে বাতিনী মতবাদ প্রচার করে আর এই মতবাদেই সে দীক্ষিত করেছিলো বোখারার মেয়রকে, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীকে এবং গণ্যমান্য ব্যবসায়ীদেরকে। ইরাকের শাসনকর্তা এবং রাজার একজন পরিষদ-সদস্য হাসান

মালিক এবং গোমস্তা আলী যারাদকেও সে ধর্মান্তরিত করেছিলো। যাদের নাম উল্লেখ করলাম তাদের বেশীর ভাগই ছিল রাজার আত্মীয় অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার অনুচরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাজাকে ধর্মান্তরিত করবার সাধ তার জাগল। সে সভাসদদের প্ররোচিত করলো নাসর ইবনে আহমদের সামনে সর্বদাই তার প্রশংসা করতে। তারা তাই করল এবং তার এমন প্রশংসা করল যে নাসর ইবনে আহমদ তাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হলেন। তাই তারা মোহাম্মদ নাখসাবীকে খোরাসানের আমীরের কাছে নিয়ে গেল এবং তার জ্ঞানের খুব প্রশংসা করল; আমীরও তাকে সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করলেন। সুযোগ পেলেই মোহাম্মদ আমীরকে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু বলতেন এবং সে যাই বলতো আমীরের সঙ্গীরা তাতেই সম্মতি ও প্রশংসা জ্ঞাপন করে বলত, 'আপনি ঠিক বলেছেন।' নাসর ইবনে আহমদ দিনের পর দিন তার সঙ্গে আরো বেশী সদয় ব্যবহার করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার অনুরোধ রক্ষা করলেন; এর পর থেকে মোহাম্মদ নাখসাবীর প্রতিপত্তি এত বেড়ে যায় যে, সে যা বলতো রাজা তাই করতেন।

মোহাম্মদ নাখসাবীর প্রচারকার্য যখন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং রাজা নিজেই যখন শিয়া মতবাদ সমর্থন করলেন, তখন তুর্কীরা ও সেনাবাহিনীর অফিসাররা রাজা কারমাতি মতালম্বী হয়ে গেছেন দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তখন একদল বিদ্বান লোক একত্র হয়ে সেনাবাহিনী-প্রধানের কাছে গিয়ে বললেন, 'ইসলামকে রক্ষা করুন, কারণ ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে ইসলামে দুর্নীতি ঢুকেছে এবং হতভাগ্য নাখসাবী রাজাকে বিপথে নিয়েছে এবং তাঁকে কারমাতি মতাবলম্বী করেছে; এখন সে প্রকাশ্যে তার মতবাদ প্রচার করে লোকদেরকে বিপথে নিচ্ছে।' সেনাপতি বললেন, 'আমি লক্ষ্য রাখব, তোমরা ফিরে যাও এবং চুপ করে থাক, আশা করি আল্লাহ্ সব ঠিক করে দিবেন।' পরের দিন তিনি নাসর ইবনে আহমদের কাছে একথা বললেন কিন্তু তাতে কোন ফল হোল না। সৈনিকদের মধ্যে বিরক্তি দেখা দিল, তারা বলল, 'রাজা যে পথ ধরেছেন তাতে আমরা সম্পূর্ণ অমত।' এবং সৈনিক বাহিনীর অফিসাররা এই ব্যাপারে কি করা যায় পরস্পরের মধ্যে তা আলোচনা করতে লাগল। তাদের মনোভাবে বুঝা গেল যে, দুই-একজন তুর্কী প্রধান যারা নিজেরাই ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা ছাড়া সব সৈনিক এবং তাদের দলপতিরা রাজার

এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। শেষ পর্যন্ত সৈনিকরা সাব্যস্ত করল যে, তারা নাস্তিক রাজাকে বরদাশ্‌ত করবে না ; তাকে হত্যা করে তার স্থলে সেনাপতি-প্রধানকে অভিষিক্ত করবে ; এই সিদ্ধান্তে বিচ্যুত না হবার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হল। ধর্মীয় নীতির খাতিরে এবং নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সেনাপতি-প্রধান এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে বললেন, 'প্রথমে সেনাপতিদের এক জায়গায় মিলিত হয়ে একটা চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আলোচনা করার দরকার যাতে রাজার অজ্ঞাতে এ ব্যাপারে আমরা সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।'

সেনাপতিদের একজন ছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর নাম ছিল তালান আউকা। তিনি বললেন, 'সর্বোত্তম পন্থা হোল আপনি সেনাপতি-প্রধান হিসাবে রাজাকে বলেন যে অফিসাররা আপনার কাছে একটা ভোজের বন্দোবস্ত করার দাবী করছে। তিনি নিশ্চয়ই না বলবেন না। তিনি সম্ভবতঃ বলবেন, 'আপনার সামর্থ্যের মধ্যে যদি বন্দোবস্ত করতে পারেন তাহলে করুন।' তখন আপনি বলবেন যে, খাবার ও পানীয় ব্যাপারে আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই কিন্তু তোশক, কার্পেট ও অন্যান্য আসবাবপত্র এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের সজ্জিত জিনিসপত্র তেমন নাই। রাজা তখন বলবেন, 'আপনার যা যা দরকার সব আমার ধনাগার, আসবাব-পত্রের গুদাম এবং অন্দর কোঠা থেকে নিয়ে যান।' তখন আপনি বলবেন যে, আপনি সৈনিকদের এই কথায় ভোজ দিতে রাজী হয়েছেন যে ভোজ শেষ হলে তারা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবে এবং আপনার সঙ্গে বালাসাঘুনে যাবে ; কারণ তুর্কী নাস্তিকরা প্রদেশটি দখল করে নিয়েছে আর লোকদের দুঃখ-কষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজার সম্পর্কে তাদের কোন ভুল ধারণা জন্মানোর কোন কারণই থাকতে পারে না। তখন আপনি ভোজের বন্দোবস্ত করে সৈনিকদের অমুক দিনে আসতে দাওয়াত করবেন আর রাজার ধনাগার, অন্দর কোঠা ও আসবাব-পত্রের গুদাম থেকে পছন্দসই স্বর্ণ, রৌপ্য, কার্পেট, রেশমী কাপড়, যা-কিছু পাবেন সব আপনার বাড়ীতে নিয়ে আসবেন। নির্দিষ্ট দিনে সৈনিকরা সব আপনার বাড়ীতে এসে গেলে বেশী ভীড় হবার অজুহাতে বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিবেন। তখন সৈনিকদের শরবত পানের জন্য এক কামরায় নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে এই ব্যাপারটা বলবেন। যারা এই আন্দোলনের মূলে অর্থাৎ আমরা আপনার সঙ্গেই থাকব।

আমাদের অধীনস্থ সকলেই আমাদের যুক্তি শুনে বিনা দ্বিধায় আমাদের সঙ্গে একমত হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হব এবং রাজা হিসাবে আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নেব। তখন আমরা কামরা থেকে বের হয়ে খাবার টেবিলে যাব। খাওয়া শেষ হলে আমরা মদের ঘরে গিয়ে প্রত্যেকে তিন পাত্র করে পান করব। সেই কামরায় সব স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বস্তু আমরা অফিসারদের উপহার দেব। তখন আমরা ওখান থেকে সোজা রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে বন্দী করে হত্যা করব। তার সহচরদের এবং সধর্মীদের কাউকে আমরা রেহাই দিব না এবং প্রাসাদ ও ধনাগার থেকে সব জিনিস-পত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে আসব। আপনাকে তখন আমরা সিংহাসনে উপবেশন করাব এবং সৈনিকদের বলব সশস্ত্রে গ্রাম ও শহর আক্রমণ করে কারামাতিদের যাকে পায় তাকে হত্যা করতে, তাদেরকে পুড়িয়ে দিতে এবং তাদের বাড়ী-ঘর লুট করতে।' সেনাপতি-প্রধান শুনে বললেন, 'এটা একটা ভাল পরিকল্পনা।'

পরের দিন তিনি নাসর ইবনে আহমদকে বললেন, 'অফিসাররা আমাকে তাদের জন্য একটা ভোজের বন্দোবস্ত করতে বলছে এবং তারা প্রত্যেক দিনই আমাকে অনুরোধ করছে।' নাসর ইবনে আহমদ বললেন, 'আপনার সামর্থ্য থাকলে ভোজের বন্দোবস্ত করতে অন্যথা করবেন না।' তিনি বললেন, 'আমার খাবার ও পানীয় বস্তুর অভাব নাই কিন্তু কার্পেট, আসবাব-পত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম যেমন—স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি তেমন নাই। ভোজের বন্দোবস্ত করলে ভালভাবেই করতে হয় অথবা মোটেই করা উচিত নয়।' নাসর বললেন, 'আপনার যা যা দরকার আছে সবই আমার ধনাগার, অন্দর কোঠা ও আসবাব পত্রের গুদাম থেকে নিতে পারেন।' সেনাপতি-প্রধান সালাম করে চলে এলেন। পরের দিন সব সৈনিককে নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বাড়ীতে আসবার জন্য দাওয়াত করলেন। তিনি তখন ধনাগার, অন্দর কোঠা ও আসবাব-পত্রের গুদামে, স্বর্ণ, রৌপ্য, কার্পেট এবং পছন্দমত যা-কিছু পেলেন নিয়ে নিলেন এবং এমন এক ভোজের বন্দোবস্ত করলেন যা পূর্বে সে-যুগে কেউ আর দেখে নাই। তিনি সব সেনাপতিদের তাদের সৈন্য ও অনুচরবর্গ সহ তাঁর বাড়ীতে অভ্যর্থনা করলেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওমরাহ ও সেনাপতিদের এক কামরায় নিয়ে গিয়ে তাদেরকে দিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলেন।

তারা সেখান থেকে খাবার টেবিলে গেলে তাদের একজন ছাদে উঠবার জায়গা দিয়ে বাইরে এসে সোজা নুহ ইবনে নাসরের কাছে গিয়ে সব বলে দিল। নুহ সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণ করে দ্রুতবেগে তাঁর পিতার প্রাসাদে গিয়ে বললেন, 'আপনার সেনাপতিরা এক্ষণি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেনাপতি-প্রধানের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে আর আপনি কেন চুপচাপ বসে আছেন? তাদের খাওয়া শেষ হলেই তারা পান-কক্ষে গিয়ে তিন গ্লাস করে পান করবে এবং আপনার ধনাগার থেকে নেওয়া সব স্বর্ণ-রৌপ্য চুরি করবে। তারপরে তারা সোজা রাজপ্রাসাদে এসে আপনাকে, আমাকে এবং যাকেই পাবে হত্যা করবে। এই ভোজের উদ্দেশ্যই হোল আমাদেরকে ধ্বংস করা।' নাসর নুহকে বললেন, 'এখন আমরা কি করব?' নুহ বললেন, 'আপনার জন্য এখন সবচেয়ে উত্তম পন্থা হোল তারা খাবার সেরে পান-কক্ষে যাবার পূর্বেই দু'জন নিজস্ব ভৃত্যকে পাঠিয়ে দেন সেনাপতি প্রধানের কানে কানে বলতে যে রাজা বলছেন, 'আমি জানতে পারলাম যে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে এক জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন করেছেন। এখন আমার কাছে এমন এক সেট স্বর্ণ নির্মিত এবং মুক্তা খচিত খাবার পাত্র আছে, যা অন্য কোন রাজার নাই। সেগুলো ধনাগারের বাইরে কোথাও ছিল এবং এক্ষুণি তা আমার মনে পড়েছে। আপনার আয়োজিত ভোজকে যথাসম্ভব সজ্জিত করার জন্য এগুলোও নিয়ে যান। এগুলোর মূল্য বিশ লক্ষ দিনারের চেয়েও বেশী। অতি শীঘ্র চলে আসুন, অতিথিরা পান-কক্ষে যাবার পূর্বেই সেগুলি নিয়ে যান।' অর্থলোভে তিনি নিঃসন্দেহে চলে আসবেন। আর তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁর শিরশ্ছেদ করে দিব। তখন কি করতে হবে আমি আপনাকে বলব।'

তৎক্ষণাৎ নাসর খবর পৌঁছানোর জন্য দু'জন নিজস্ব ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলেন। সকলে তখন ভোজে ব্যস্ত ছিল। সেনাপতি-প্রধান তাঁর দু' একজন সহচরকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা তাঁকে ডাকছেন কেন। তারা বলল, 'যান এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে আসুন, কারণ আজ আমরা যা পাই সবই আনা উচিত।' সেনাপতি-প্রধান দ্রুতবেগে রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তাঁকে এক কামরার মধ্যে ডাকা হোল এবং রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর শিরশ্ছেদ করে একটা থলের মধ্যে ভরবার জন্য কয়েকজন বালক-ভৃত্যকে হুকুম দিলেন। নুহ তখন তাঁর পিতাকে বললেন, 'অশ্বারোহণ করে চলুন আমরা এই থলে সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি

প্রধানের বাড়ীতে যাই। সেখানে সব অফিসারের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করতে হবে এবং আমাকে করতে হবে আপনার উত্তরাধিকারী। এইভাবেই শুধু তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যাবে এবং রাজত্ব আমাদের পরিবারে রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে ; কারণ সৈন্যরা আপনাকে আর সহ্য করবে না এবং যেভাবেই হোক না কেন আপনাকে একদিন মরতেই হবে।' তাই তাঁরা দু'জনে অশ্বারোহণ করে দ্রুতবেগে সেনাপতি-প্রধানের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। অফিসাররা তাকিয়ে রাজাকে তাঁর পুত্রসহ ভিতরে আসতে দেখলো। তারা সকলেই উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গেল। তাদের কেউ জানতে পারল না যে কি ঘটছে। তারা বলল, 'সম্ভবতঃ রাজা ভোজে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক।' নাসর ইবনে আহমদ গিয়ে তাঁর উপযুক্ত স্থানে বসলেন আর দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে রইল তাঁর পিছনে। নুহ তাঁর পিতার ডানদিকে বসে তাঁকে বললেন, 'আরাম করে বসুন, খাওয়া শেষ করুন এবং ভোজ উপভোগ করুন।'

সুতরাং তারা সকলে একত্রে ভোজ সমাধা করল। ভোজ শেষে নাসর বললেন, 'জেনে রাখুন যে, আপনাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি। আপনাদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে আপনাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। এরপরে আমার প্রতি আপনাদের কোন বিশ্বাস থাকবে না আর আমারও আপনাদের প্রতি থাকবে না কোন ভরসা। আমি হয়ত প্রচলিত ধর্মমত থেকে বিচ্যুত হতে পারি, অথবা বিধর্মী মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি অথবা অন্য কোন অন্যায় করতে পারি যা আপনাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে ; কিন্তু আমার ছেলে নুহের নিশ্চয়ই কোন দোষ নাই।' তারা বলল, 'না, তাঁর কোন দোষ নাই।' তিনি বললেন, 'আমার সৈনিক হবার যোগ্যতা আপনাদের আর নাই আর আমিও আপনাদের রাজা হবার উপযুক্ত নই। তাই আমি নুহকে আমার উত্তরাধি-কারী নিযুক্ত করছি ; সে এখন থেকে আপনাদের রাজা। আমি ন্যায়ই করে থাকি আর অন্যায়ই করে থাকি, এখন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে অনুশোচনা করব। যে-ব্যক্তি আপনাদেরকে এইভাবে বিপথে নিয়েছিল, সে তার উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।' এই বলে তিনি সেনাপতি-প্রধানের মস্তক তাদেরকে দেখাতে হুকুম করলেন এবং থলেটা তাদের সামনে ফেলে দিলেন। তিনি নিজে সিংহাসন থেকে নেমে নীচে জায়নামাযের উপরে হাঁটু গেড়ে বসলেন আর নুহ সিংহাসনে গিয়ে তাঁর পিতার জায়গায় বসলেন।

এই সমস্ত শুনে ও দেখে সেনাপতিরা বিস্মিত হয়ে গেল এবং তাদের কোন অজুহাত বা আপত্তির কিছু থাকল না। তারা সকলে নতজানু হয়ে নুহকে অভিনন্দন জানাল এবং সেনাপতি-প্রধানের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে তারা বলল, 'আমরা সকলেই আপনার একান্ত বাধ্যগত।' নুহ বললেন, 'জেনে রাখুন, আমি নুহ—নাসর নই। অতীত—অতীতই। আমি মনে করি, আপনাদের সব ভুল সংশোধিত হয়ে গেছে। আমার মাধ্যমে আপনাদের সব আশাই পূরণ হবে। আমার আদেশ পালন করে আপনারা যার যার কাজে যান।' তিনি তখন শিকল এনে তাঁর পিতাকে শৃঙ্খলিত করতে হুকুম দিলেন এবং সোজা কুহনদিজে নিয়ে বন্দী করে রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আসুন এবারে পান-কক্ষে যাওয়া যাক।'

তারা পান-কক্ষে গিয়ে প্রত্যেকে তিন গ্লাস করে মদ খাবার পর তিনি বললেন, 'আপনাদের পরিকল্পনা ছিল সবাই তিন গ্লাস করে মদ খেয়ে এই কামরার সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবেন। আপনাদেরকে লুণ্ঠন করতে না দিয়ে আমি আপনাদের সব কিছু উপহার দিচ্ছি। এইগুলো সব নিয়ে নিজেদের মধ্যে যার যার পদ-মর্যাদা অনুসারে বণ্টন করে নিন যাতে সকলেই কিছু-না-কিছু অংশ পান।' সঙ্গে সঙ্গে তারা জিনিসগুলো বস্তার মধ্যে ভরল এবং সীল মেরে একজন বিশ্বস্ত লোকের কাছে রাখল। তখন নুহ বললেন, 'সেনাপতি-প্রধান আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন এবং আমার পিতাও ন্যায় পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এখন শাস্তি ভোগ করছেন আর আপনাদের পরিকল্পনা ছিল ভোজ শেষে বালাসাঘুনে গিয়ে তুর্কী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কিন্তু আমাদের নিজ দেশেই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। চলুন আমরা ধর্মযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আপনারা ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে এবং খোরাসানে গিয়ে ধর্ম-বিরোধীদেরকে হত্যা করুন— যে ধর্মমত আমার পিতা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাদের সব জিনিসপত্র ও ধনসম্পদও আপনাদের হবে। এইমাত্র আমি আমার পিতার সব সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি যা এই কক্ষের মধ্যে ছিল; আগামীকল্য ধনাগারে যা আছে সব আপনাদের দিয়ে দিব। কারণ বাতিনীদের অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠনকারীদের জন্যই। এই জরুরী কাজ শেষ করে আমরা তুর্কী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ধাবিত হব। কিন্তু সর্বপ্রথমে আমি চাই মোহাম্মদ নাখসাবীকে ধরে এনে তাকে ও আমার পিতার সব মিত্রের শিরশ্ছেদ করে দিন, তারপর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখবেন এই শহর ও আশেপাশের জেলাগুলো।'

তৎক্ষণাৎ তারা অশ্বারোহণ করে দ্রুতবেগে গিয়ে মোহাম্মদ নাখসাবীকে নিয়ে এল এবং তার শিরশ্ছেদ করল। তারা হাসান মালিক, আবু মনসুর চাঘানী, আসাদ ও অন্যান্য কয়েকজন আমীরকেও প্রাণদণ্ড দিল— যারা বাতিনী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারপর তারা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে বিধর্মীদের যাকে পেল তাকেই হত্যা করল আর বিধর্মীদের তাদের চিনতে অসুবিধা হয় নি, কারণ তারা রাজার সঙ্গে সদরে তাদের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করত এবং জনসমক্ষে সেটা প্রচার করত। সেইদিনই নুহ সৈন্য-সামন্তসহ একজন আমীরকে আমুদরিয়া পার হয়ে দ্রুতবেগে মার্ভ-আর রুদে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে হুকুম দিলেন প্রথমে সাওয়াদার পুত্রকে বন্দী করে তাকে হত্যা করতে এবং তারপরে সারা খোরাসানে এই গোত্রের যাকে পাবে তাকেই হত্যা করতে। তবে তিনি সকলকে সাবধান করে দিলেন যেন ভুলক্রমে কোন মুসলমানকে হত্যা করা না হয় এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলেন কোন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে তিনি বধ করবেন, কোন অজুহাতই তিনি শুনবেন না। তারপর সাত দিন ধরে তারা বোখারা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে হত্যা এবং লুণ্ঠন করতে করতে চলল যে পর্যন্ত না সারা খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে বিধর্মীরা শেষ হল।

সিরিয়া ও পশ্চিম দেশে বাতিনীদের আবির্ভাব

এখন আমরা সিরিয়ার কথা বলব। আবদ-আল্লাহ ইবনে মায়মুন বসরায় গিয়ে গোপনে তার প্রচারকার্য চালানোর সময় মারা গেলে তার পুত্র আহমদ সেখান থেকে সিরিয়া চলে যায় এবং সিরিয়া থেকে পরে চলে যায় পশ্চিম দেশে (উত্তর আফ্রিকা)। সেখানে তার প্রচার-কার্য বেশ জমে উঠে। তারপর সে আবার সিরিয়ায় ফিরে এসে সালামী শহরে বাস করতে থাকে। সেখানে তার একটা পুত্রসন্তান হয় আর তার নাম রাখা হয় মোহাম্মদ। আহমদের মৃত্যুর সময় তার পুত্রের বয়স ছিল খুব কম, তাই তার ভাই সাইদ ইবনে আল হোসাইন তার স্থান দখল করে নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখে আবদ-আল্লাহ ইবনে-আল-হোসাইন এবং চলে যায় পশ্চিম দেশে। আবু আবদ-আল্লাহ মুহতাসিব নামে তার এক বন্ধু ছিল। সে তাকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে বানী আঘলাবে পাঠাল সেখানকার লোকদেরকে ধর্মান্তরিত করবার জন্য।

বানী আঘলাবে বসতির সংখ্যা ছিল খুব কম এবং তাদের বেশীর ভাগই ধর্মান্তরিত হোল। তখন সে হুকুম দিল এরপর থেকে তাদের ধর্মমত-বিরোধী সকলকেই হত্যা করতে। সেই অনুসারে বানী আঘলাবের বিরাট এক দল একত্রিত হয়ে শহরে গেল হত্যা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম দেশের বেশীর ভাগ জায়গায়ই তারা কর্তৃত্ব লাভ করল। এদিকে জিকরাওয়াই (যিনি পরিচিত ছিলেন সাহিব আল হাল নামে) ছিলেন পশ্চিমের কতকগুলো শহরের কর্তা; তিনি সুন্নী ছিলেন আর আলী ওয়ামুদান দাইলামী ছিলেন তাঁর সেনাপতি। তিনি সিরিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে আলীকে পাঠালেন হঠাৎ করে আবু আবদ-আল্লাহ মুহতাসিবকে আক্রমণ করার জন্য। মুহতাসিব পালিয়ে গেল কিন্তু সিরিয়াবাসীরা তাদের আক্রমণধারা অব্যাহত রাখল এবং বানী আঘলাবের যাকে পেল সবাইকে হত্যা করল এবং বাকীদেরকে তাড়িয়ে দিল। আবু আবদ-আল্লাহ বানী আঘলাবের একটা শহরে পৌঁছে তাঁবু টাঙ্গিয়ে তাপসের ন্যায় বাস করতে লাগল। লোকেরা তাকে খুব সমাদর করতে লাগল। সাহেব আল হাল অনবরত সংবাদদাতা পাঠিয়ে দাবী করতে লাগলেন যে, তাকে তাঁর কাছে হস্তান্তরিত করা হোক; কিন্তু তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাকে হস্তান্তর করল না। আবু আবদ-আল্লাহ শঙ্কিত ছিল যে, বানী আঘলাবরা না আবার সাহেব আল হালের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। তাই সে বানী আঘলাবের অন্তর্গত একটা দ্বীপে গিয়ে বাস করতে লাগল। সেখানে সে একটা বাড়ী তৈরী করে বাস করতে থাকে। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে উত্তরাধিকারী হয়। সে অঞ্চলের পরিস্থিতি বহুদিন ধরে অপরিবর্তিত ছিল।

হেরাত ও ঘুর জেলায় বাতিনীদের আবির্ভাব এবং পতন

২৯৫ হিজরীতে হেরাতের শাসনকর্তা মোহাম্মদ ইবনে হারসামা সামানীদের ইসমাঈল ইবনে আহমদকে জানালেন যে, ঘুর ও ঘারচার পাদদেশে আবু বিলাল নামে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে কারামাতী মতবাদ প্রচার করছে; সব শ্রেণীর লোকেরা তার কাছে জমায়েত হয়েছে এবং সে নিজেকে দার-আল-আদল বলে দাবী করছে। হেরাত অঞ্চল থেকে বহু লোক এসে তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এবং তার কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে; তাদের সংখ্যা হবে ১০,০০০-এর চেয়েও বেশী। তিনি বললেন, 'আপনি যদি তাকে শায়েস্তা করতে অবহেলা করেন, তাহলে তার অনুচর সংখ্যা

দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং তখন এটা একটা কঠিন ব্যাপারে পরিণত হবে। এখন সে বিদ্রোহী যাজকদের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করছে।' আমীর ইসমাঈল এই কথা শুনে বললেন, 'আমি জানতে পারলাম যে, আবু বিলাল খুব উত্তেজিত হয়েছে।' তিনি তখন তাঁর গৃহাধ্যক্ষ জাকারীকে এই বলে হুকুম দিলেন, 'সবচেয়ে চতুর এবং সাহসী দেখে পাঁচ শত ভৃত্যদের বেছে নিয়ে তাদের বেতন পরিষ্কার করে দাও। তারপর বিঘিশকে তাদের দলপতি নিয়োগ করে তার কাছে ১০,০০০ দিরহাম দাও; পাঁচ শত সেট বর্ম ও অশ্বচালনার অস্ত্র তৈরী করতে বল। আগামীকল্য তাদেরকে সামরিক কুচকাওয়াজের জন্য জুই-ই-মুলিয়ানে আমার সামনে উপস্থিত করবে, আমি তাদের তদারক করে দেখব।' গৃহাধ্যক্ষ জাকারী তাই করল।

তখন আমীর ইসমাঈল মার্ভ-আর-রুদে আলী মারভাজীকে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখতে হুকুম করলেন, 'তোমার লোকদেরকে বেতন দিয়ে দাও এবং শহরের বাইরে এসে থাক—যাতে ভৃত্যরা পৌঁছেই তোমাকে দেখতে পায়; তখন তাদের সঙ্গে হেরাতে গিয়ে মোহাম্মদ ইবনে হারসামার সৈন্যদের সঙ্গে যোগদান কর।' আর মোহাম্মদ ইবনে হারসামাকে লিখলেন, 'তোমার সৈন্যদের প্রস্তুত করে বিঘিশ এবং আবু আলীনা যাওয়া পর্যন্ত শহরের বাইরে অপেক্ষা কর।' তিনি বিঘিশের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মোহাম্মদ ইবনে হারসামার নিকট থেকে উদ্দেশ্য সফলের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে একটা প্রদেশের ভার দিয়ে দিবেন। আর বাকী ভৃত্যদেরকে বললেন, 'এটা আলী ইবনে সারউইন আমর ইবনে লাইস, মোহাম্মদ ইবনে হারুন এদের কারো বিরুদ্ধেই সামরিক অভিযান নয়; কারণ তাহলে আমাদের আরো বিরাট ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী থাকত। এই যাত্রায় আমি তোমাদের উপর ভরসা করেই আছি। হেরাতের পাদদেশে কয়েকজন বিদ্রোহী আবির্ভাব হয়েছে; তারা কারামাতী মতবাদ প্রচার করছে; তাদের বেশীর ভাগই মেষপালক ও কৃষক। তোমরা যদি কৃতকার্য হতে পার তাহলে তোমাদেরকে সসম্মানে ভূষিত করব, উপহার দিব এবং পদোন্নতি করে দিব।' তখন তিনি তাদের দেখাশুনা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মসচিব নিযুক্ত করে সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

তাদের মার্ভ-আর-রুদে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আবু আলী তাঁর সৈন্য-সামন্তসহ তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। তারা সৈন্য দ্বারা

রাস্তার মুখ বন্ধ করে রাখলেন---যাতে বিদ্রোহীরা তাদের খবর জানতে না পারে। তারা হেরাতে পৌঁছলে মোহাম্মদ ইবনে হারসামা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে স্থলপথ আটক করে রাখল—যাতে আবু বিলালের কাছে কোন খবর না পৌঁছায়। তখন তারা পাহাড়ের উপরে গিয়ে তিন দিন ধরে বিভিন্ন উপত্যকা এবং গিরিপথ অতিক্রম করে বিদ্রোহীদের ওখানে পৌঁছল। বিদ্রোহীরা কোন সন্দেহ করতে পারে নাই। তারা তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করে সকলকে মেরে ফেলল। আবু বিলাল, হামদান, আবু জাকা এবং আরো দশ জন প্রধানকে গ্রেফতার করা হোল। সত্তর দিনের মধ্যেই তারা বোখারায় ফিরে এল। আবু বেলালকে কুহুনদিজের জেলে রাখা হোল এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। অন্য দশ জনকে বলখ, সমরকন্দ, রগানা, খায়ারাজম, নিশাপুর এবং মার্ভে পাঠান হোল এবং সেখানে তাদেরকে ফাঁসী দেওয়া হোল। এভাবে তাদের ধর্মকে ঘুর ও ঘারচা থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়। এই বছরই আমীর ইসমাঈল মারা যান এবং তাঁর ভাই নাসর ইবনে আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন, যার কাহিনী আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে বাতিনীদের আবির্ভাব

নুহ তাঁর পিতাকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে রাখার পর সেনাপতি-দিগকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেন এবং তিনি নিজে রাজা হিসাবে বহু বছর ধরে রাজত্ব করেন। নুহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মনসুর তাঁর পিতার স্থান দখল করে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর রাজত্ব পনের বছর অতিবাহিত হবার পর ধর্মপ্রচারকরা আবার গোপনে গোপনে খোরাসান ও বোখারায় ধর্মপ্রচার করে লোকদেরকে বিপথে নিয়ে যেতে শুরু করে। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগই ছিল যারা এই ধর্মের জন্য তাদের পিতা ও পিতামহকে হারিয়েছে। মনসুর তাঁর সময়ে ধার্মিক আমীর হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর উজির ছিলেন আবু আলী বালামী, সবুক্তগীনের মনিব আলপ্তিগীন ছিল তাঁর খোরাসানস্থ সেনাপতি-প্রধান, মনসুর ইবনে বেকারা ছিলেন তাঁর প্রধান গৃহাধ্যক্ষ, আবু ইয়াহিয়া আসাম ছিলেন ফারঘানার শাসনকর্তা, সারহাং হোসাইন ছিলেন ইজবিজাবের শাসনকর্তা, ইসমাঈল ছিলেন চাচের শাসনকর্তা, আবু মনসুর আবদ-আর-রাজ্জাক ছিলেন তুসের শাসনকর্তা আর ওয়াসমগীর ছিলেন গুরগানের

শাসনকর্তা। আমীরদের মধ্যে যাঁরা রাজধানীর বাশিন্দা ছিলেন, তাঁরা হলেন বাবদাহ, নাসর মালিক, হাসান মালিক, আবু সাইদ মালিক, হায়দার গাঘানী, আবু আল আব্বাস জাররাহ, বাকতুজুন, বাকিনাক, খামারতিগিন প্রমুখ। মনসুর ইবনে বেকারা, আবু সাইদ মালিক, আবু আল আব্বাস জাররাহ, খামারতিগিন, বাকিনাক, আবু আবদ-আল্লাহ জাইহানী এবং জাফর গোপনে বাতিনী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এই দলকে ধর্মান্তরিত করেছিল দু'জন প্রচারক। একজন ছিলেন আবুল ফজল বানগুরুজ বারদিজি আর অন্যজন ছিল এক-চক্ষুবিশিষ্ট আতিক। এই দলের লোকদের উপরই নির্ভর করত আদালত, দরবার ও দেওয়ানের কার্যনির্বাহ এবং সারা দেশের শাসন ব্যবস্থা। তারা গোপনে গোপনে তাদের ধর্মাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন ক্ষমতায় আসীন করত এবং তাদের পদোন্নতির বন্দোবস্ত করত আর তাদের উপর কাজের বিরাট চাপ না আসলে তারা সেটা অন্য কারো হাতে সমর্পণ করত না। সরকারী ও বেসরকারীভাবে তারা একে অন্যকে সমর্থন ও সাহায্য করত। যদি তাদের কেউ কোন কাজে অসুবিধায় পড়ত, তাহলে বাকী সকলে তার পক্ষ সমর্থন করে তাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করত তার কাজ সমাধা করতে। এইভাবে তাদের ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং সারা খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে তাদের যেখানেই দেখা যেত তারা একত্রিত থাকত এবং তাদের সহায়তায় বাতিনী প্রচারকার্য প্রসার লাভ করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। দূর বিদেশের লোকেরা ভাবতে লাগল যে, রাজ-দরবারের সকলেই বাতিনী মতবাদ গ্রহণ করেছে। তখন আবু মনসুর আবদ-আর-রজ্জাকও বাতিনীদের দলে যোগদান করলেন। রাজ-দরবারের বাতিনী মতবাদীরা তখন ফারঘানা, খুজান্দ এবং কাসানের শ্বেত পোশাক পরিহিতদেরকে বিদ্রোহ করতে আবেদন করে বলল, 'আমাদের আর আপনাদের যুক্তি আসলে একই। আমরাও বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি, তবে আমাদের উদ্দেশ্য হোল প্রথমে রাজাকে পরাভূত করা। তারপর আমরা সৈন্য পরিচালনা করে আমু দরিয়ার উত্তর পারের সব প্রদেশগুলো দখল করে নিব। খোরাসান আক্রমণ করব পরে।'

বাতিনীরা তখন একত্রিত হয়ে মনসুর ইবনে বেকারার সহায়তায় উজির আবু আলী বালামীকে এবং আমীর বাকতুজুনকে রাজার সামনে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে রওনা হোল। এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন ধর্মভীরু

মুসলমান এবং বাকতুজুনের কতৃত্বাধীনে ছিল সকল ভৃত্য। মনসুর এই দু'জনকেই শৃঙ্খলিত করে কুহনদিজের জেলে আটক করতে হুকুম দিলেন। এর ফলে দেশে শুরু হোল ভীষণ বিশৃঙ্খলা। আলপ্তিগীন যখন দেখলেন যে, রাজ্যের বেশীর ভাগ আমীর ও সভাসদরা বাতিনী মতবাদ গ্রহণ করেছে এবং এই দু'জন লোককে ভাল মুসলমান ও রাজার বাধ্যগত হওয়া সত্ত্বেও তাদের নির্দেশে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি নিশাপুর থেকে বোখারার দিকে রওনা হলেন এবং বাতিনীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদেরকে দমন করবার জন্য রাজাকে খবর পাঠালেন। তুসের শাসনকর্তা আবু মনসুর আবদ-আর-রাজ্জাক এই খবর জানতে পারলেন। তাঁর সৈন্য-সামন্ত প্রচুর ছিল, তাই তিনি আলপ্তিগীনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন—যাতে তিনি যুদ্ধ না করে রাজধানীতে পৌঁছতে না পারেন। একথা জানতে পেরে আলপ্তিগীন রাস্তা বদল করে সাবজভারের পথ দিয়ে আমু দরিয়ার পারে গিয়ে আমুল নামক স্থানে থামলেন। আবু মনসুর আবদ-আর-রাজ্জাক ফিরে এসে মনসুর ইবনে বের্কারা ও তার দলের অন্যান্যকে একখানা চিঠি লিখে জানালেন যে, আলপ্তিগীন তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে এসেছে। তারা একত্রে পরামর্শ করে রাজাকে জানাল যে, আলপ্তিগীন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তারা রাজাকে বলল, 'আপনি তাঁকে বহুবার ডাকা সত্ত্বেও তিনি এর আগে কোন দিন দরবারে আসেন নাই। আর এখন আপনাকে অস্বীকার করে আপনার বিনা তলবে আমু দরিয়া পার হবার জন্য তিনি তার তীরে এসে পৌঁছেছেন।' রাজা কিছু সৈন্যসহ বিক আরসলান হামিদী এবং হাসান মালিককে আমু দরিয়ার তীরে পাঠালেন। তারা সেখানে গিয়ে সমস্ত নৌকাগুলো দখল করে রাখল—যাতে আলপ্তিগীন নদী পার না হতে পারেন।

আলপ্তিগীন যখন দেখলেন যে, তারা তাঁকে নদী পার হতে দিবে না, তখন তিনি তাঁর এখানে আসার কারণ লিখে একখানা চিঠি পাঠালেন। তিনি তাতে লিখলেন, 'আপনার আমীর, সভাসদ ও সেনাপতিদের বেশীর ভাগই কারমাতীদের ধর্ম গ্রহণ করেছে; ছোট-বড় সকলেই তাদের দলে ভিড়েছে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছে। তাছাড়া তাদের কথায় আপনি এমন দু'জন লোককে বন্দী করেছেন যাঁরা সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মভীরু এবং অনুগত। আমি এসেছি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আপনি যদি আমার কথার চেয়ে

কারমাতীদের কথার মূল্য বেশী দেন, তাহলে আপনাকেও তার ফল ভোগ করতে হবে। আমি আপনাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি, সুতরাং আমি এখন বাল্‌খের দিকে যাচ্ছি।' একই ধরনের পত্র তিনি বোখারার বিচারপতি ও ধর্মীয় নেতাদেরও লিখলেন। তিনি লিখলেন, 'কারমাতীরা শক্তিশালী হয়ে পড়েছে; যে-কোন সময়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু রাজা এদিকে কোন নজরই দিচ্ছেন না, তাই আপনারা তাঁকে সৎ উপদেশ দেন যাতে ইসলাম ধর্ম ও রাজত্ব রক্ষা পায়।' এরপরে তিনি বোখারায় চলে গেলেন। তিনি চিঠি পেলেন। বিচারক আবু আহমদ এবং বোখারার ধর্মীয় নেতারা ব্যাপারটা সবই জানতেন, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পান নাই। কারণ কারমাতীদের বেশীর ভাগই ছিল রাজার বিশিষ্ট সভাসদ। তাঁরা বললেন, 'হয়ত তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে রাজা আমাদের কথা শুনবেন না। তাদের প্রত্যেকের একটা প্রদেশ ও সেনাবাহিনী আছে। তারা ধনী এবং শক্তিশালী, তাছাড়া আমরা কিছু বললে তাদের শত্রুতে পরিণত হব।'

একদিন বিকালে প্রধান বিচারক আবু আহমদ রাজপ্রাসাদে গিয়ে একটা গোপন আলোচনা সভার অনুরোধ করলেন। রাজা তাঁকে নিয়ে একাকী বসলেন। আবু আহমদ তখন বললেন, 'ধর্মীয় আলেমরা সর্বদাই আপনাকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে রাজী আছেন। আপনার পিতা নূহ ধর্মীয় আলেমদের প্রত্যেকদিন ডাকতেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছুই করতেন না। ফলে অবাধ্য লোকগুলো তার দ্বারা সৎপথে আসত। যেহেতু আপনি ধার্মিক ও জ্ঞানীলোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন না, আপনার পিতার সময়ে যারা সৎপথে আসত আপনার সময়ে তারা বিপথে যাচ্ছে।' তিনি তখন রাজাকে আলপ্তিগীনের চিঠি দেখালেন এবং পরে ধর্মীয় আলেমদের লেখা অন্য আরেকখানা চিঠিও তাঁকে দেখালেন—যাতে রাজা বুঝতে পারেন যে তিনি যা বলছেন সেটা শুধু তাঁর একার কথা নয়। তিনি তখন রাজাকে সতর্ক করে দিলেন এবং ব্যাপারটা খুলে বললেন তাঁকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য।

পরিস্থিতি এমন হোল যে, পরের দিন খবর পাওয়া গেল শ্বেত-বস্ত্র পরিহিত লোকেরা ফারঘানায় বিদ্রোহ করে মুসলমানদের যাকেই পাচ্ছে হত্যা করছে। তার পরের দিন খবর পাওয়া গেল, খোরাসান অঞ্চলে কারমাতীরা তালিকানে ও পর্বতের পাদদেশে প্রকাশ্যভাবে শিয়া

ধর্ম প্রচার করছে এবং হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য অপরাধ অবাধে করে যাচ্ছে। তাই মনসুর আবু আহমদকে উজিরের পদ দিতে প্রস্তাব করলেন কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, 'আমি উজিরের পদ গ্রহণ করলে রাজাকে নিরপেক্ষভাবে সংবাদ সরবরাহ করবার এবং উপদেশ দেবার আর কে আছে? তাছাড়া স্বার্থবাদীরা বলবে যে, বিচারক উজিরের পদের জন্য এতসব করেছে, ধর্মবিশ্বাসের জন্য করে নাই।' তাঁর কথায় রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তাহলে উজিরের পদের ব্যাপারে কি করা সবচেয়ে ভাল হবে?' তিনি বললেন, 'আপনার একজন উজির আছে তিনি শুধু যোগ্য এবং উপযুক্তই নন, তিনি একজন পাকা মুসলমান এবং উজিরের ছেলেও বটে।' রাজা বললেন, 'তিনি কোথায় আছেন?' তিনি বললেন, 'তিনি কুহনদিজে জেলে আছেন।' মনসুর হুকুম দিলেন এবং আবু আলী বালামীকে ও বাকতুজুনকে কুহনদিজের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হোল আর সেইদিনই তাঁদেরকে ভোজে আপ্যায়ন করা হোল এবং যথাসম্ভব মর্যাদা ও শানশওকতের সঙ্গে তাঁদের পূর্বপদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হোল। পরের দিন রাজা, উজির, বিচারক এবং বাকতুজুন এক গোপন সভায় মিলিত হলেন এবং রাজাকে দেশ-বিদেশের সব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন। তাঁরা প্রথমে ফারঘানা ও সুগ্দ-এর কারমাতীদেরকে দমন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা তালিকানের কারা-মাতীদেরও দমন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা স্থির করলেন আবু আবদ-আর-রাজ্জাককে দমন করার পর তাঁরা আমীর ও সভাসদদের ব্যাপারে মনোযোগ দিবেন।

পরের দিন প্রতিটি শহর থেকে আলেমরা উজিরের কাছে নালিশ করতে আসলেন। তাঁরা উজিরকে অনুরোধ করলেন রাজাকে কারমাতীদের বিদ্রোহ সম্পর্কে জানিয়ে দেবার জন্য। এদিকে আবু আলী ইচ্ছা করেই দেরী করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তার ফলে আলেমরা তাঁকে বললেন, 'তাঁর তাদের সঙ্গে কোন মিত্রতা না থাকলে তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণে ইতস্তত: করতেন না।' আবু আলী তখন স্পষ্টভাবে একথা রাজাকে জানিয়ে কারমাতীদের ও আলেমদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। ব্যাপারটা আলোচনা করে ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী তাঁরা যে সিদ্ধান্তে আসবেন, সেটা সকলে মেনে নিবেন। তাই আবু আলী বালামী পরের দিন একটা সভা ডেকে

আদালতের প্রধান বিচারক আবু আহমদ মারঘাজি, সব ধর্মীয় নেতা এবং কারমাতী ধর্মপ্রচারক ও নেতাদেরকে ডাকলেন। তিনি দুই দলের সমর্থকদেরকে ডেকে আনলেন যাতে ধর্মীয় বিষয়ে একটা আলোচনা হতে পারে। যুক্তিতর্কের পর কারমাতীরা শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। এক-চক্ষুবিশিষ্ট আতিককে একশত বেত্রাঘাত করে তাকে খোয়ারাজমে পাঠিয়ে দেওয়া হোল আর সেখানকার জেলেই তার মৃত্যু হয়। আবু'ল ফজল জাঙ্গুরজকেও একশত বেত্রাঘাত করে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সহ তাকে মার্ভে নির্বাসিত করা হয়, সেখানে পরে তার মৃত্যু হয়। তখন বাক-তুজুন ও আবু আল কাসেমকে একদল সৈন্যসহ পাঠিয়ে দেওয়া হোল তালিকানে। হত্যা করা ছাড়াও তারা চার শত লোককে গ্রেফতার করেছিল যারা তাদের কারমাতী মতবাদের কথা স্বীকার করেছিল এবং তাদেরকে ৬০,০০০ দিনার জরিমানা করা হয়েছিল। তাদেরকে তখন রাজধানীতে পাঠিয়ে দেবার হুকুম হোল। তাদের কিছু লোককে দেওয়া হয়েছিল ফাঁসি আর বাকীদেরকে দেওয়া হয়েছিল আজীবন কারাদণ্ড।

তালিকানের বিদ্রোহ দমন শেষ হলে মনসুর বিক্ আরসলানের সঙ্গে ফারঘানায় যাবার জন্য ইসহাক বাল্খীকে পাঠালেন। তিনি তাদের সঙ্গে ধর্মীয় আলেম আবু মোহাম্মদকেও পাঠালেন বিদ্রোহীদেরকে ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেবার জন্য। এই লোকগুলো ফারঘানাতে একদল সৈন্য নিয়ে গিয়েছিল এবং সহজেই বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিদ্রোহীদের কিছু লোককে জরিমানা করা হোল, কিছু লোক তাদের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করে অনুতাপ করল এবং তারা অন্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। সৈন্যরা বহু টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র সহ বোখারায় ফিরে এল। আবু মোহাম্মদকে জিজ্ঞেসা করা হোল, 'ঐ সমস্ত ঘৃণিত ব্যক্তিরা কোন্ ধর্ম পালন করত?' তিনি বললেন, 'তাদের অবস্থা এমন ছিল যে তারা তাদের গোপনীয় স্থান ঢেকে রাখত না এবং একে অন্যের সঙ্গে কামলিপ্সা চরিতার্থ করতে পিছ-পা হতো না। কোন লোকের বিয়ে হোলে তাদের দলপতিই প্রথমে তার স্ত্রীকে উপভোগ করত, তারপরে আসত তার পালা; মদ্যপানকে তারা আইনসঙ্গত মনে করত; পায়খানা করে তারা শৌচকার্য করত না। মা ও বোনের সঙ্গে থাকত তাদের অবৈধ সম্পর্ক। তারা নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্ব ও ধর্মযুদ্ধের কথা স্বীকার করত না।'

এই কাজটা শেষ হবার পর ধর্মপরায়ণ আমীর মনসুর উজির, বিচারক এবং বাকতুজুনকে নিয়ে সভাসদ, আমীর এবং সেনাপতিদের কতজন কারমাতী ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিভাবে আবু মনসুর আবদ-আর-রাজ্জাকের পতন ঘটান যায় এবং কিভাবে খোরাসান, ইরাক এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা থেকে কারমাতীদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায় ইত্যাদি আলোচনা করার জন্য এক সভা ডাকলেন। যেহেতু তুসের আমীর আবু মনসুর আবদ-আর-রাজ্জাক খোরাসানের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী, কারণ আলপ্তিগীন খোরাসান থেকে গাজনী চলে গেছেন তাই তাঁরা স্থির করলেন প্রথমে রাজধানীকে কারমাতীদের থেকে মুক্ত করতে হবে। এইজন্য তাঁরা নাসির আদ-দৌলা আবু আল হাসান সিমজুরকে খোরাসানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে তাঁকে সৈন্যদেরসহ দরবারে ডাকলেন। তিনি রাজধানীতে এলে তাঁর সহায়তায় তারা কারমাতী মতবাদে বিশ্বাসী রাজ-দরবারের সব গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদেরকে হত্যা করা হলো। তারপর খোরাসানের সৈন্যদের সঙ্গে আবু আল হাসান সিমজুরকে পাঠান হল আবু মনসুর আবদ-আর রাজ্জাকের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে গ্রেফতার করতে। ওয়াসমগীর ও অন্যান্য সীমান্ত এলাকার সেনাপতিদেরকেও চিঠি লিখে গুরগান থেকে সৈন্য এনে অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তুস ঘিরে ফেলে আবু মনসুরকে গ্রেফতার করে সব কারমাতীকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হল।

আবু মনসুর অসুস্থ ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে সৈন্যরা তুস ঘিরে ফেলেছে তখন হঠাৎ গুরগানের দিকে রওনা হলেন; পথে ওয়াসমগীর তার গতিরোধ করলেন এবং সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ হোল। আবু মনসুর রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ছিলেন তাই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে একজন ভৃত্যের কাঁধের উপর মাথা রাখলেন এবং ঐ অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁর সৈন্যরা পালিয়ে গেল। ওয়াসমগীর তার শির-শ্ছেদ করতে হুকুম দিলেন। তারা পলায়নরত সৈন্যদের সন্ধ্যা পর্যন্ত ধাওয়া করে কিছু হত্যা করল আর কিছু গ্রেফতার করল। আবু মনসুরের সঞ্চিত সব মূল্যবান জিনিসপত্র উদ্ধার করা হোল; ওয়াসমগীর সব লুণ্ঠিত জিনিসপত্র এবং ১৭০ জন বন্দী লোককে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন আবু আল হাসান সিমজুর একদিকে আর ওয়াসমগীর ও তাঁর পুত্র কুবুদ অন্যদিকে গিয়ে সবাইকে হত্যা করলেন। শেষ পর্যন্ত সারা খোরাসান

ও ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে একটা বাতিনীও রইল না ; এবং বাতিনী ধর্ম সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেল।

খুজিস্তান ও বসরাতে ধর্মের উদ্যোক্তা হিসাবে মোহাম্মদ ইবনে আলীর আবির্ভাব

২৫৫ হিজরীতে মোহাম্মদ ইবনে আলী আলাভী আহবাজে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। কয়েক বছর ধরে সে খুজিস্তান ও বাসরার নিগ্রো দাসদের বিভিন্ন প্রচারকার্য এবং প্রতিশ্রুতি দ্বারা ফাঁকি দিয়ে আসছিল। ওয়াদা মত সময়ে সে বিদ্রোহ করে এবং নিগ্রোরাই তার সঙ্গে সহায়তা করে। সে প্রথমে দখল করে আহবাজ, তারপর বসরা এবং সারা খুজিস্তান। সব নিগ্রোরাই তাদের মনিবদের হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ, স্ত্রী, বাড়ীঘর এবং জমিজমা দখল করে নেয়। তারা কয়েকবার খলিফা আল মুতাদীদের সৈন্যদেরকে পরাজিত করে এবং ১৪ বছর ৪ মাস ৬ দিন ধরে মোহাম্মদ ইবনে আলী বসরা ও খুজিস্তানে রাজার ন্যায় রাজত্ব করে। শেষে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যা করা হয় সব নিগ্রোকে। ২৭০ হিজরীতে সফর মাসের শেষের দিকে তাকে বাগদাদে নিয়ে এসে হত্যা করা হয়। তার ধর্ম সব দিক দিয়ে মাজদাক, বাবাক, আবু জাকারিয়া, খুররামী এবং কারমাতীদের ন্যায়ই ছিল।

বাহরাইন ও আল আহসাতে আবু সাইদ জান্নাবী ও তার পুত্র তাহিরের বিদ্রোহ

আল মুতাদীদের সময়েও বাহরাইনে এবং আল আহসাতে আবু সাইদ আল হাসান ইবনে বাহরাম আল জান্নাবীর বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। সে ঐ অঞ্চলের লোকদেরকে শিয়া ধর্ম, যাকে আমরা বলি বাতিনী মতবাদ, গ্রহণ করতে বলে এবং তাদেরকে বিপথে নিয়ে যায়। আস্তে আস্তে শক্তি বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর সে রাজপথে ডাকাতি এবং গ্রাম অঞ্চলে লুটতরাজ শুরু করে। সে সম্পত্তিতে সাধারণ মালিকানারও প্রচলন করে। এইভাবে কিছুদিন চলার পর এক ভৃত্য তাকে হত্যা করে। ঐ ঘটনার পর বাহরাইন ও আল আহসাতে ভৃত্যদেরকে বিশ্বাস করা হোত না। আবু সাইদের আবু তাহের নামে একটা ছেলে ছিল।

সে তার পিতার স্থান অধিকার করে কিছুদিন যাবৎ ভালভাবেই জীবন যাপন করে। সে শিয়া মতবাদ সম্পর্কে কিছু জানত তাই সে শিয়াদের পুস্তক 'বালাগাত আসসাবী' আনতে একজন লোককে পাঠাল তাদের প্রচারকদের কাছে। তারা পুস্তকখানা তাকে পাঠিয়ে দিল। সে পুস্তকখানা পড়ে এবং শিয়াদের মতবাদ গ্রহণ করে। তখন বাহরাইন ও আল আহসার সকল যুবককে যাদের অস্ত্রের প্রতি ঝোঁক আছে সে ডেকে বলল, 'আমি তোমাদের নিয়ে শিকারে যাব।' হজ্বের সময় নিকটবর্তী ছিল। বিরাট একদল লোক নিয়ে ঠিক হজ্বের সময় যখন সারা দুনিয়া থেকে হাজীরা এসে জমায়েত হয়, সে মক্কার দিকে রওনা হল। সে তাদের অস্ত্র পরিচালনা করে যাকে সামনে পাবে তাকেই হত্যা করতে হুকুম দেয় বিশেষ করে মক্কা ও পবিত্র স্থানের আশে-পাশের লোকদের হত্যা করার জন্য। তারা হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যাকাণ্ড শুরু করল। এই দেখে হাজীরা পালিয়ে গেল পবিত্র স্থানে এবং যে সিন্দুকের মধ্যে কোরআন শরীফ রক্ষিত হত তার পিছনে গিয়ে আত্মগোপন করে। মক্কাবাসীরা অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ শুরু করে দিল।

এই সময় আবু তাহের তাদের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দিয়ে বলল, 'আমরা হজ্ব করতে এসেছি, যুদ্ধ করতে আসি নাই। তোমরা হজ্বের আচার (ইহরাম) ভঙ্গ করে অন্যায়ভাবে আমাদের একজনকে হত্যা করছো, তাই আমরা অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছি। এই সংবাদ যদি দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে যে মক্কাবাসীরা অস্ত্রধারণ করে হাজীদেরকে হত্যা করছে তাহলে কেউ আর হজ্ব করতে উৎসাহী হবে না। হজ্বের প্রচলন বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাদের খুব দুর্নাম হবে। আমাদের জন্য হজ্বটা নষ্ট করো না। আমাদেরকে যেতে দাও।' মক্কাবাসীরা ভাবল যে সে হয়ত সত্য কথা বলছে; হয়ত তাদের কেউ ঐ দলের সঙ্গে ঝগড়া করে অস্ত্র বের করে তাদের কাউকে মেরে ফেলেছে। দুই দলই অস্ত্র পরিত্যাগ করতে সম্মত হল এবং কোরআন শরীফ স্পর্শ করে তারা প্রতিজ্ঞা করল যে তারা আর যুদ্ধ করবে না, মক্কাবাসীরা ফিরে গিয়ে কোরআন শরীফ রাখার সিন্দুক আবার পবিত্র জায়গায় রেখে দিবে যাতে হাজীরা নিরাপদে কাবা পরিদর্শন করতে পারে। মক্কাবাসী ও হাজীরা শপথ গ্রহণ করে ফিরে গেলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। মক্কাবাসীরা তখন সিন্দুকগুলো পূর্বের জায়গায় রাখল এবং হাজীরা কাবা প্রদক্ষিণ করলেন।

আবু তাহের যখন দেখল যে, মক্কাবাসী সৈন্যরা চলে গেছে তখন সে তার সঙ্গীদেরকে অস্ত্রধারণ করে পবিত্র স্থান (কাবা) আক্রমণ করে তার ও বাইরে যাকেই পাওয়া যায় হত্যা করতে হুকুম দিল। তারা হঠাৎ করে তাই কাবা আক্রমণ করে যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। তারা আশে-পাশের সব লোককে হত্যা করল। তাদের অস্ত্রের ভয়ে বহু লোক জলাশয়ের মধ্যে ঝাঁপ দিল এবং বহু পাহাড়ের উপরে পালিয়ে গেল। আক্রমণকারীরা কালো পাথরটা তুলে ফেলল এবং ছাদের উপরে গিয়ে স্বর্ণনির্মিত ছাদের নালী চূর্ণ বিচূর্ণ করে বলল, 'তোমাদের খোদা তার বাসস্থান দুনিয়াতে রেখে বেহেশতে থাকেন তাই আমরা তার ঘর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করব।' তারা তখন পর্দা নামিয়ে সেগুলো খণ্ড বিখণ্ড করে লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে নিয়ে যাবার সময় বিদ্রূপ করে কোরআনের উদ্ধৃতি বলতে লাগল, (কোরান ৩.৯১) 'এর মধ্যে যে ঢুকবে সেই নিরাপদে থাকবে' এবং 'আল্লাহ্ই তাদের ভীতি থেকে রক্ষা করেছেন' (১০৬.৪)। তোমরা তো কাবার মধ্যে লুকিয়েছিলে, কেন আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাও নাই? তোমাদের আল্লাহ যদি সত্যিই থাকতেন তাহলে তিনি তোমাদেরকে আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন।' এই জাতীয় আল্লাহ্ নিন্দা তারা করল। তারা মক্কাবাসীদের স্ত্রী ও শিশুদের বন্দী করে নিয়ে গেল। সর্বমোট ২০,০০০ লোককে হত্যা করা হোল। বহু লোক কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল। এই সমস্ত ধৃত ব্যক্তির দেহও কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হোল যাতে তারাও মরে যায়। স্বর্ণ, দিরহাম, দিনার, রেশম, কস্তূরী, কাঠের সুগন্ধর ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস তারা লুণ্ঠন করে নিয়েছিল যার পরিমাপ করা সম্ভব ছিলনা। আবু তাহের আল আহসাতে ফিরে তার লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু অংশ বিভিন্নস্থানে প্রচারকদের মধ্যে উপহার হিসাবে বণ্টন করে দিল। ৩১৭ হিজরীতে আল মুকতাদিরের সময়ে ইসলামের এই দুর্যোগ ঘটেছিল।

আবু তাহের পশ্চিমে আবু সাইদকে কিছু উপহার পাঠাল। আবু সাইদ ছিল ইহুদী বালক। আবদ আল্লাহ ইবনে মাইমুন আল কাদ্দার আহমদ নামক এক পুত্র ছেলেটির মাকে বিবাহ করে তাকে লালন পালন করে। সে তাকে উদার মতবাদ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত করে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে। সে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দান করে এবং কতকগুলো নির্দিষ্ট সংকেত দিয়ে যায়। আবু সাইদ সেখান থেকে পশ্চিমে গিয়ে সিজিলমাস শহরে বাস করতে থাকে।

সেখানে তার ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং সে অস্ত্রবলে লোকের উপর তার ধর্ম চাপাতে থাকে। সে নিজেকে মেহেদী এবং আলীর পরিবারভুক্ত বলে দাবী করে। সে শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, মদপান আইন-সঙ্গত করে এবং মা, বোন ও মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে অনুমতি দেয়। সে প্রকাশ্যভাবে মারওয়ানিদের ও আব্বাসীয়দেরকে অভিসম্পাৎ করত। আমাদেরকে যদি তার নিরীহ লোকদের কাহিনী এবং তার কু-অভ্যাসের কথা বলতে হয় তাহলে এই অল্প পরিসরের মধ্যে সম্ভব হবে না। তবে ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মিসরের বর্তমান রাজা (ফাতেমীদের খলীফা) তারই বংশধর।

আবু তাহের আল আহসাতে ফিরে এসে কোরআন শরীফ, তৌরাত এবং ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নষ্ট করে ফেলল। সে বলত, 'তিনজন লোক মানব জাতিকে বিপথে নিয়েছে---একজন মেষপালক, একজন চিকিৎসক আর একজন উট-চালক (মুসা, ঈসা এবং মোহাম্মদ) ; আর তাদের মধ্যে উট-চালকই সবচেয়ে ভেলকীবাজ এবং দুর্বৃত্ত। আবু তাহের মা, বোন এবং মেয়ের সঙ্গে যৌনসংসর্গ বৈধ ঘোষণা করে ; সে পবিত্র কালো পাথর-খানাকে ভেঙ্গে দুই ভাগ করে দুই খণ্ডকে এক পায়খানার দুই পার্শ্বে রেখে দেয় এবং পায়খানাতে বসবার সময় দুই পা পাথরের দুই অংশের উপরে রাখত ; সে জনগণকে নবীদের অভিশপ্ত করার জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে যৌনসংসর্গের বিধান আরবদের সহ্য হোল না ; তাদের অনেকেই মায়ের সঙ্গে সহবাস করার চেয়ে সোঁকো বিষ ও গন্ধক খেয়ে মরাকেই শ্রেয় মনে করল। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা ও অপেক্ষাকৃত মূর্খ বেদুইনরা এটাকে স্বাভাবিক মনে করে নিল। সে পুনরায় হজ্বযাত্রীদেরকে আক্রমণ করে এবং এবারেও মিথ্যা শপথ করে অসংখ্য লোককে হত্যা করল। কিন্তু খোরাসান ও ইরাকের মুসলমানেরা সমুদ্র ও স্থল উভয় পথেই আসতে স্থির করলে দস্যুরা ভীত হয়ে কালো পাথরখানা ফিরিয়ে দেয়। একদিন কুফার প্রধান মসজিদে ঢুকবার সময় লোকেরা অপ্রত্যাশিত-ভাবে কালো পাথরটা সেখানে দেখতে পেল। সেটাকে তারা তুলে নিয়ে একটা লোহার পেরেক দিয়ে সংযুক্ত করে মক্কাতে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাতে রেখে দিল। তখন আবু তাহের জরথুস্ত্রবাদী রকিবরাকে গোপনে ইস্পাহান থেকে আল আহসাতে এনে তাকে রাজা করল। এই লোক তাদের ৭০০ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং আবু তাহের ও তার

ভাইকেও হত্যা করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল ; কিন্তু আবু তাহের এটা জানতে পেরে তাকে এক কৌশলে হত্যা করে পুনরায় রাজত্ব লাভ করল। এই হতভাগা যে সমস্ত অন্যায় এবং হত্যাকাণ্ড ইসলামী রাষ্ট্রে করেছে, তার সবই যদি আমাদের বর্ণনা করতে হয় তাহলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তার সঙ্কুলান হবে না। এই গণ্ডগোল আর-রাযীর সময় পর্যন্ত ছিল এবং আর-রাযীর সময়েই দাইলামীরা ক্ষমতা লাভ করে।

এইটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যাতে সুলতান বাতিনী ধর্ম সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন, বুঝতে পারেন কি জন্য তাদের শপথ ও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়, তারা সুযোগ পেয়ে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কি অন্যায় ও অসৎ কাজ করেছে, তারা কতদূর পাপী এবং ইসলাম ও রাষ্ট্রের কতবড় শত্রু।

এই সময়ে ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে মুকান্না মারপজীরও আবির্ভাব হয়েছিল। সে লোকদের থেকে ধর্মীয় অনুশাসন একেবারেই তুলে দিল এবং সর্বপ্রথমে সে বাতিনীদের ন্যায়ই দাবী করল যেমন করেছিল আবু সাইদ জান্নাবী, আবু সাইদ মাগরিবি, মোহাম্মদ আলাভী এবং তাদের প্রচারকরা। মুকান্না ও দুই আবু সাইদ একই সময়ের লোক এবং তারা পরস্পরের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান করত। মুকান্না ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে একটা পর্বত থেকে চন্দ্র সাদৃশ্য একটা বস্তুর আবির্ভাব ঘটিয়ে যাদুমন্ত্রের খেলা দেখাল ; প্রত্যেক দিন একই সময়ে চন্দ্রটার আবির্ভাব হোত এবং ঐ অঞ্চলের লোকেরা চেয়ে দেখত। আর এটা ছিল অনেক দিন ধরে। সে ঐ প্রদেশের লোকদেরকে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিল। একটু ক্ষমতাশালী হলে সে ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী বলে দাবী করল এবং তারপরেই শুরু হোল রক্তপাত, রাজদ্রোহ এবং খুনাখুনি। সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ থেকে সৈন্যরা এল তাকে সাহায্য করার জন্য এবং মুসলমানেরা কয়েক বছর ধরে তার সঙ্গে যুদ্ধ চালাল। এইগুলো সব যদি আমার বর্ণনা করতে হয় তাহলে কলেবর দ্বিগুণ হবে এবং এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের—যাদের কথা আমি উল্লেখ করলাম প্রত্যেকের ইতিহাসই এক একটা বড় পুস্তকের রূপ নেবে। মুকান্নার গল্প থেকে এতটুকু বলা হয়েছে যাতে আমাদের পুস্তক থেকে তার কথা বাদ না পড়ে।

যখনই বাতিনীদের আবির্ভাব হয়েছে, তাদের একটা নাম বা ডাক নাম থাকত এবং প্রতি শহর ও প্রদেশে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল;

কিন্তু কাজে-কর্মে সবাই ছিল একই। আলেপ্পো ও মিসরে তারা তাদেরকে ইসমাঈলী বলত; কুম, কাসান, তাবারিস্তান এবং সাব্জ্ভারে তাদেরকে বলা হোত শিয়া সম্প্রদায়; বাগদাদ, ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও গাজনীতে তারা পরিচিত ছিল কারমাতী নামে; কুফাতে মুবারকী; বাসরাতে রাওয়ানদি এবং বুরকাই; রায়-এ খলীফী; গুরগানে লাল বস্ত্র পরিহিত; সিরিয়াতে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত; পশ্চিমে সাইদী; আল আহসা ও বাহরাইনে জান্নাবী এবং ইস্পাহানে বাতিনী নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু তারা নিজেদেরকে নীতিবাদী বা ঐ জাতীয় নামে অভিহিত করত। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে ধ্বংস করে মানব জাতিকে বিপথে নেওয়া।

সাতচল্লিশ অধ্যায়

ইস্পাহান ও আজারবাইজানে খুররামীদের উত্থান

আমি এখন খুররামীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে একটা অধ্যায় রচনা করব যাতে সুলতান তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারেন। খুররামীদের আবির্ভাব হলেই বাতিনীরা তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছে আর বাতিনীদের আবির্ভাব হলেও খুররামীরা তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়েছে এবং তাদেরকে লোকজন এবং ধনসম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছে; কারণ এই দুই ধর্মের মূল ভিত্তি একই এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোল—ইসলামকে বিপন্ন করা।

১৬২ হিজরীতে আল মেহদীর সময়ে গুরগানের বাতিনীরা (যারা পরিচিত ছিল লাল পতাকা অথবা লাল বস্ত্র পরিহিত বলে) যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে পড়ে। তারা খুররামীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলতে লাগল, 'আবু মুসলিম জীবিত আছেন। আমরা রাজ্য দখল করে তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই।' তারা তার পুত্র আবু আল ঘারাকে তাদের নেতা মনোনীত করে রায় অবধি অগ্রসর হোল। প্রত্যেকটা অন্যায় কাজকেই তারা ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করত, এবং তারা একে অন্যের স্ত্রীকে উপভোগ করত। তখন আল মেহদী সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোর শাসনকর্তাদের চিঠি লিখলেন তাবারিস্তানের শাসনকর্তা ওমর ইবনে আল আলার সঙ্গে যোগদান করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার হুকুম দিয়ে। তাঁরা তাদেরকে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। পরে হারুন-আর-রশিদ খোরাসানে থাকা অবস্থায় খুররামীরা তিরমিজিন, কাপুলা, ফাবাক এবং অন্যান্য গ্রাম থেকে এসে ইস্পাহান জেলাতে বিদ্রোহ করে। রায়, হামাদান, কারাজ এবং দাসতাবা থেকে এক বিরাট জনতা এসে সমবেত হয় তাদের সঙ্গে। তাদের মোট সংখ্যা এক লক্ষের চেয়েও বেশীর হোল। হারুন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আবদ আল্লাহ ইবনে মালিককে পাঠালেন ২০,000 অশ্বারোহীসহ। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল। আবদ আল্লাহ ইবনে মালিক হারুন-আর-রশিদকে চিঠি লিখে জানালেন, 'আবু দুলাফকে আমাদের অত্যাবশ্যক।', চিঠির উত্তর এল, 'তাকে তুমি হুকুম কর।' এরপরে দু'জনে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করলো। খুররামীরা আবারও বাতিনীদের উৎসাহে বিরাট একদল

জনতার সমাবেশ করে তাদেরকে দিয়ে রাজদ্রোহ ও লুণ্ঠন কার্য চালান। আবু দুলাফ ইজলী এবং আবদ আল্লাহ ইবনে মালিক তাদেরকে অপ্রত্যাশিত-ভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁরা তাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করলেন এবং তাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের বাগদাদে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে নিলামে বিক্রি করলেন।

বাবাকের বিদ্রোহ

এই ঘটনার নয় বছর পরে আজারবাইজান থেকে বাবাক বিদ্রোহ করল। বাতিনীরা তার সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করল কিন্তু তারা শুনতে পেল যে তাদেরকে সৈন্যরা অনুসরণ করছে, তাই তারা ভীত হয়ে ফিরে এল এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ২১২ হিজরীতে আল মামুনের সময়ে খুররামীরা ইস্পাহান, রাভানদা এবং কাপুলা জেলায় আবার বিদ্রোহ করে। একদল বাতিনী তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং তারা আজার-বাইজানে গিয়ে বাবাকের দলে ভিড়ে যায়। আল মামুন বাবাকের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এবং খুররামীদের দমন করার জন্য মোহাম্মদ ইবনে হামিদ তাইকে পাঠান। তিনি প্রথমে তাঁকে জারির ইবনে আলী ইবনে সাদাকাকে আক্রমণ করতে হুকুম দিলেন, কেননা সে বিদ্রোহ করে কোহিস্তান ও ইরাকে ঘুরে ঘুরে দেশ লুন্ঠন এবং যাত্রীদলে ডাকাতি করছিল। মোহাম্মদ ইবনে হামিদ দ্রুতবেগে গেলেন। তিনি আল মামুনের কাছে কিছুই চাইলেন না। নিজের সম্পদ দিয়েই সৈন্যদেরকে সজ্জিত করলেন। তিনি জারিরকে আক্রমণ করে তাকে বন্দী করলেন এবং তার অনুচরদের নিঃশেষ করে দিলেন। এই কাজের পুরস্কারস্বরূপ আল মামুন তাঁকে কাজউইন, মারাঘা এবং আজারবাইজানের অধিকাংশ দিয়ে দিলেন। তারপর মোহাম্মদ বাবাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করলেন এবং দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলল। শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ ইবনে হামিদ মারা গেলেন। বাবাকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেল। খুররামীরা তাদের দলের ইস্পাহানী সদস্যদেরকে ইস্পাহানে ফেরত পাঠিয়ে দিল। মোহাম্মদ ইবনে হামিদের মৃত্যুর সংবাদে আল মামুন অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খোরাসানের শাসনকর্তা আবদ আল্লাহ ইবনে তাহিরকে নিযুক্ত করলেন বাবাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তিনি সারা কোহিস্তান প্রদেশ এবং আজারবাইজানের উদ্ধারকৃত সবটাই তাঁকে দিলেন। আবদ্ আল্লাহ প্রথম

হয়ে আজারবাইজানে গেলেন। বাবাক তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারল না ; সে একটা নিরাপদ দুর্গের মধ্যে পালিয়ে গেল এবং তার সৈন্যরা ও খুররামীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

২১৮ হিজরীতে আল মামুন রুমে চলে যাওয়াতে ইস্পাহান, পারস্ এবং সারা কোহিস্তান ও আজারবাইজানের খুররামীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা প্রদেশে ও শহরগুলোতে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এক নির্দিষ্ট রাত্রে বিদ্রোহ করে সব রাজস্ব আদায়কারীকে হত্যা করে এবং বহু কৃষককে মেরে তাদের বাড়ী-ঘর লুট করে ও তাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে যায়। পারসে মুসলমানেরা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহীদেরকে পরাভূত করে ও তাদের অনেককে মেরে ফেলে এবং বাকীদেরকে বন্দী করে নেয় কিন্তু ইস্পাহানে খুররামীরা আলী ইবনে মাজদাক নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একজোট হয়। সে শহর-ফটকের বাইরে ২০,০০০ লোক সমাবেশ করে তার ভাইয়ের সঙ্গে কারাজে যায় ; সেই সময় আবু দুলাফ সেখানে ছিলেন না। তাঁর ভাই মাকিল ছিলেন কারাজে এবং মাত্র ৫০০ অশ্বারোহী নিয়ে তিনি বাধা দিতে পারেন নাই, তাই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বাগদাদে চলে যান। আলী ইবনে মাজদাক কারাজ দখল করে শহর লুন্ঠন করে, সে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সেখান থেকে আজারবাইজানে গিয়ে সে মিলিত হয় বাবাকের সঙ্গে। চারদিক থেকে খুররামীরা বাবাকের সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৫,০০০ এবং তারা সমবেত হয় কোহিস্তান ও আজারবাইজানের মধ্যবর্তী শারিস্তান নামক এক জায়গায়। বাবাক তাদের সঙ্গে সেখানে মিলিত হয়।

আল মু'তাসিম ৪০,০০০ অশ্বারোহীসহ ইসহাককে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালে তিনি হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করেন, ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদেরকে পরাজিত করেন এবং বাবাক পালিয়ে যায়। ইসহাকের সৈন্যরা তখন তরবারি দ্বারা খুররামীদের নিপাত করতে লাগল। গণনা করে দেখা গেল যে, আত্মসমর্পণকারীদের বাদ দিয়ে প্রকৃত নিহতের সংখ্যাই ১০০,০০০। রক্ষাপ্রাপ্ত কিছু লোক ইস্পাহানের দিকে পালিয়ে যায়, আলী এবং ইবনে মাজদাকের ভাইয়ের নেতৃত্বে ১০,০০০ লোক ইস্পাহানের আশে-পাশের অঞ্চল লুণ্ঠন করে। ইস্পাহানের আমির আলী ইবনে ঈসা তখন সেখানে ছিলেন না, তাই বিচারক চাঘান

ওমরাহ, মেয়র এবং নাগরিকদের এক দল নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। তাঁরা তিন দিক থেকে তাদেরকে আক্রমণ করে বেপরোয়াভাবে হত্যাকাণ্ড চালালেন, তাদের সব স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদেরকে বন্দী করে রাখলেন এবং বয়স্ক ছেলেদের শিরশ্ছেদ করে দিলেন।

এই ঘটনার ছয় বছর পরে আল মু'তাসিম আবারও খুররামীদের ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন এবং তিনি বাবাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আফসিনকে নিয়োগ করলেন। সৈন্য-সামন্ত সহকারে আফসিন রওনা হলেন তার মোকাবেলা করার জন্য। বিভিন্ন স্থান থেকে খুররামীরা এবং বাতিনীরা বাবাকের সাহায্যার্থে এল। আফসিন ও বাবাকের মধ্যে দুই বছর ধরে তুমুল যুদ্ধ চলল এবং দুই পক্ষের বহুলোক হতাহত হোল। শেষ পর্যন্ত আফসিন বাবাককে বন্দী করতে না পেরে এক রণ-কৌশল আঁটলেন; তিনি তাঁর সৈন্যদের রাত্রির মধ্যে তাঁবু ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে দশ ফারসাং পিছু হটে অবস্থান করতে হুকুম দিলেন। তখন আফসিন বাবাকের কাছে এক দূত মারফত বলে পাঠালেন, 'আমার কাছে একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোককে পাঠান; কারণ আমি আমাদের দু'জনের উপকারার্থেই তার কাছে কিছু বলতে চাই।' বাবাক তাঁর কাছে একজন লোককে পাঠাল। আফসিন তাকে বললেন, 'বাবাককে বলবেন যে, সবকিছুরই একটা পরিণতি আছে। মানুষের মাথা তৃণগুল্ম নয় যে পুনরায় জন্মাবে। আমার প্রায় সব লোকই মরে গেছে; এক-দশমাংশও অবশিষ্ট নাই। আমার কোন সন্দেহ নাই যে, আপনাদের বেলাতেও ঠিক তাই ঘটেছে। আসুন আমরা শান্তি স্থাপন করি। আপনারা এই প্রদেশ দখল করে আছেন এটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন এবং এখানে নিরাপদে বাস করতে থাকুন আর আমি ফিরে গিয়ে খলীফার কাছে আপনাদের তরফ থেকে অন্য একটা প্রদেশ দাবী করব এবং আপনাদেরকে স্বত্বাধিকার পাঠিয়ে দিব। আর আপনারা যদি আমার উপদেশ গ্রহণ না করেন তাহলে আসুন জন্মের মত ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যাক।' দূত চলে গেল।

এদিকে আফসিন ২০০০ অশ্বারোহী এবং ৩০০০ পদাতিক বাহিনীকে পর্বত ও গিরিখাতের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে রাখলেন যে তারা মরার মত হয়ে পড়ে রইল। দূত বাবাকের কাছে ফিরে এসে খবরটা দিল এবং শত্রুদের সৈন্যের পরিস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তারিত বলল। গুপ্তচররাও একই সংবাদ দিল। তাই তারা তিন দিন পরে এক তুমুল যুদ্ধ করতে স্থির করল। আফসিন তখন গোপনে তাঁর সৈন্যদের কাছে

একজন সংবাদদাতা পাঠিয়ে বললেন, 'যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে এসে পাহাড় ও উপত্যকা থেকে দেড় ফারসাং দূরে ডান দিকে ও বাঁ দিকে পালিয়ে থাকবে। আমি তাঁবু পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলে শত্রুদের কিছু আমাকে অনুসরণ করবে আর অন্যেরা ব্যস্ত থাকবে লুট করতে। তোমরা তখন পাহাড় থেকে এসে তাদের যাবার পথ বন্ধ করে দিবে যাতে তারা গিরিখাতে ফিরে যেতে না পারে। আমি তখন ফিরে এসে প্রাণপণ যুদ্ধ করব।'

যুদ্ধের দিন বাবাক গিরিপথ থেকে তার সৈন্যদের বের করল। অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে মোট ছিল ১০০,০০০। আফসিনের সৈন্য সম্পর্কে গুপ্তচররা যে সংবাদ দিয়েছিল বাবাকের সৈন্যরা সেই রকমই দেখতে পেল। দুইদলে তুমুল যুদ্ধ হোল এবং দুইদলেই বহু লোক নিহত হোল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আফসিন পলায়ন করে তাঁর তাঁবু থেকে এক ফারসাং পিছু হটে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর পতাকাবাহীকে বললেন, 'পতাকা উত্তোলন কর।' সে পতাকা উত্তোলন করল। তাঁর সৈন্যরা ঐ স্থানে এসে থেমে গেল। বাবাক তার সৈন্যদের লুটতরাজ করতে নিষেধ করে আফসিনের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে নির্দেশ দিল। তাই অশ্বারোহীরা বাবাকের সঙ্গে আফসিনকে অনুসরণ করতে গেল। কিন্তু পদাতিকরা তাঁবুতে আক্রমণ করে লুট-তরাজ শুরু করল। তখন ২০,০০০ অশ্বারোহী পর্বতের ডান ও বাম দিক থেকে আবির্ভূত হয়ে সারা মাঠ খুররামীদের পদাতিক সৈন্যে ভরপুর দেখল। তারা তাদের গিরিখাতের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে সশস্ত্রে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আফসিন এলেন তাঁর সৈন্য নিয়ে এবং বাবাক ধরা পড়ল মাঝখানে। শত চেষ্টা করেও বের হবার কোন পথই সে পেল না। আফসিন তাকে বন্দী করলেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ ধারা ও হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকল। তারপরে বাবাক ও অন্যান্য বন্দীদেরকে বাগদাদে নিয়ে প্রদর্শনীর জন্য শহর প্রদক্ষিণ করান হোল।

বাবাকের দিকে চক্ষু পড়তেই আল মু'তাসিম বললেন, 'রে কুকুর, কেন তুমি এই গণ্ডগোল দুনিয়াতে ছড়িয়েছ এবং কেন হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছ?' সে কোন উত্তর দিল না। আল মু'তাসিম তার হাত-পা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। তার এক হাত কেটে ফেললে সে অন্য হাত রক্তের উপর রেখে সেই হাত মুখে ঘসে সারা মুখ লাল করে দিল। আল মু'তাসিম বললেন, 'নরাধম, এটা কিসের চিহ্ন?' বাবাক বলল, 'এখানেই জ্ঞানের পরিচয়। আপনি আমার হাত-পা কেটে

ফেলতে যাচ্ছেন। রক্ত মানুষের মুখকে করে রক্তবর্ণ। শরীরে রক্ত না থাকলে মুখ পীতবর্ণ হয়ে যায়। আমি আমার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ করছি যাতে আমার শরীর রক্তহীন হলে লোকেরা না বলতে পারে যে ভয়ে আমার মুখ পীতবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।' তখন আল মু'তাসিমের হুকুমমত একটা ষাঁড় থেকে চামড়া ছাড়িয়ে তাজা ও শিংযুক্ত সেই চামড়া আনা হোল। বাবাককে সেই চামড়ার মধ্যে তখন ভরে দেওয়া হোল; শিংগুলো কানের কাছে বেরিয়ে রইলো এবং তাকে তার মধ্যে রেখে সেলাই করে তার গায়েই চামড়াটা শুকানো হোল। ঐ অবস্থায়ই তখন তাকে ফাঁসি দেওয়া হোল এবং সে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাল।

বাবাকের বিদ্রোহ থেকে শুরু করে আটক হওয়া পর্যন্ত পুরা গল্পটা বিরাট বড়। তার ঘাতকদের একজন বন্দী হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে কত লোককে মেরেছে। সে বলল, 'বাবাকের কয়েকজন ঘাতক ছিল কিন্তু আমি নিজেই হত্যা করেছি ৩৬,০০০ জনকে।'

আল মু'তাসিম তিনবার জয়লাভ করেন এবং এই তিনটি বিজয়ের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। প্রথমটা ছিল রুম বিজয়, দ্বিতীয়টা বাবাকের বিরুদ্ধে জয়লাভ এবং তৃতীয়বার তিনি জয়লাভ করেছিলেন তাবারিস্তানে জরথুস্ত্রবাদী মাজিয়ারের বিরুদ্ধে। এই তিনটার যে-কোন একটাতে বিজয় যদি না হোত তাহলে ইসলামের জন্য দুর্যোগ নেমে আসত।

আল ওয়াসিকের সময়ে খুররামীরা পুনরায় ইস্পাহানে বিদ্রোহ করে এবং তাদের সময়ে রাজদ্রোহ ও অসন্তোষ ভীষণভাবে দেখা দেয়। ৩০০ সাল অবধি তাদের বিদ্রোহ চলে। তারা কারাজ শহর লুণ্ঠন করে কিছু লোককে হত্যা করবার পর শান্ত হয়ে যায়। বাবর বারশাহ বিদ্রোহ করে ইস্পাহানের নিকটে পর্বতে আশ্রয় নেয়। খুররামীরা এবং বাতিনীরা তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাত্রীদলকে আক্রমণ করতে শুরু করে, গ্রামে লুট-তরাজ করে এবং বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রীলোক ও বালকদের হত্যা করে। সে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তার এই অনাচার চালিয়ে যায় এবং কোন সৈন্যদলই তাকে দমন করতে সক্ষম হয় নাই। শেষ পর্যন্ত সে বন্দী হয় এবং তাকে হত্যা করে ইস্পাহানে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই বিজয় সংবাদ সারা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, সবকিছু উল্লেখ করলে অনেক সময় লাগবে। খুররামী ও বাতিনীদের বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহ সম্পর্কে কারও জানতে ইচ্ছা হলে তাঁকে তাবারীদের ইতিহাস, ইস্পাহানের ইতিহাস এবং আব্বাসীয় খলীফাদের ইতিহাস পড়া উচিত।

খুররামীদের ধর্মের ভিত্তিই হল তারা ভোগ-বিলাসী, তারা নামাজ, রোজা, হজ, ধর্মযুদ্ধ এবং ওজু বাদ দিয়ে আল্লাহ্র বিধানকে পরিত্যাগ করেছে। তারা মদ খাওয়া এবং স্ত্রী ও সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা অনুমোদন করেছে। আসলে তারা সব ফরজ কাজগুলো বর্জন করেছে। যখনই তারা কোন সভা করে কোন জরুরী বিষয় আলোচনা করে, তারা সর্বদাই আবু মুসলিম সাহেব আদ-দৌলার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ এবং তার হত্যাকারীকে অভিশাপ দিয়ে সভার কাজ শুরু করে। তারা আবু মুসলিমের কন্যা ফাতিমার পুত্র মেহদী ফিরোজের জন্যও প্রার্থনা করে থাকে, তারা বলে 'জ্ঞানী সন্তান' (আল ফাতা'ল আলীম)।

পূর্বে উল্লিখিত বিষয় থেকে মাজদাকের ধর্মনীতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় এবং খুররামী ও বাতিনীদের মতবাদের সঙ্গে সেগুলোর মিলও নিশ্চিত প্রমাণ করা হয়েছে। তাদের সকলেরই সর্বদা উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে বিপন্ন করা। মুসলমানদের প্রলোভিত করার জন্য তারা প্রথমে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পরিবারের প্রতি দেখাত বিশ্বস্ততা এবং নিজেদের সত্যবাদী ও ধার্মিক বলে জাহির করত। ক্ষমতা লাভ করে এবং অনুচরদের সংখ্যা বাড়িয়ে তারা আল্লাহ্র আইনকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করত। এমন কি, নাস্তিকরাও মুসলমানদের প্রতি তাদের মত নির্মম নয়।

তাদের কাজের ও কথার এই তথ্য বর্ণনা করলাম যেহেতু তারা বর্তমানে ইসলামের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন লোক আছে যারা তাদের প্রচারকার্যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করছে, বিভিন্ন কাজে যোগদান করছে এবং তাদের পরিকল্পনা সমর্থন করছে। যদিও সুলতান সারা দুনিয়ার প্রভু এবং দুনিয়ার সকলেই তাঁর ক্রীতদাস, তবুও তারা তাঁকে করেছে সম্পদ অর্জনের জন্য লোভী। যোগ্য ব্যক্তিদেরকে তারা তাঁদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। তারা মিতব্যয়িতার কথা বলছে; কিন্তু সমস্ত কাপড় কেটে আস্তিনে পরিণত করলে তা দিয়ে কখনও একটা পুরা জামা তৈরী করা সম্ভব নয়। তারা যখন ভাল লোকদের সর্বনাশ ডেকে আনবে, তাদের ঢাকের শব্দ যখন সবার কানে পৌঁছবে এবং যখন তাদের অসৎ আচরণ ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন সুলতানের এই বান্দার কথা মনে পড়বে। কারণ তখন মুসলমানরা জ্বালাতন ভোগ করবে, দেশে নেমে আসবে অরাজকতা এবং ধর্ম অধর্মে পরিণত হবে। তখন তিনি বুঝতে পারবেন যে, এই

বান্দা যা বলেছিল সবই সত্য, সে কখনও কোন সদুপদেশ দিতে বা প্রতিষ্ঠাধিকারে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই এবং সুলতানের প্রতি তার কর্তব্য ও অনুরাগ সর্বদাই ছিল। দুর্বিপাক ও অনিষ্টকারীদের হাত থেকে আল্লাহ্ যেন তাঁকে ও তাঁর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন এবং তিনি যেন কখনও তাঁর শত্রুদের অভিলাষ ও উদ্দেশ্য সাধন না করেন এবং তিনি যেন এই দরবার এবং দেওয়ানে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বিশ্বাসীদের স্থান দেন এবং কখনও যেন এই রাজবংশের অনুগতদের অভাব না হয় এবং তিনি যেন প্রত্যহ নব বিজয়ের, নব সফলতার ও নব দিগন্তের সূচনা করতে সুলতানকে তৌফিক দেন।

আটচল্লিশ অধ্যায়

রাজকোষ এবং সেগুলো দেখাশুনা করার রীতি-নীতি প্রসঙ্গে

রাজাদের সব সময় দুইটা রাজকোষ থাকত---একটা সঞ্চয়-রাজকোষ আর অন্যটা ব্যয়-রাজকোষ। রাজস্ব আদায় হলে সেগুলো সাধারণতঃ সঞ্চয়-রাজকোষে নেওয়া হোত। কোন জরুরী কাজে প্রয়োজন না হলে তাঁরা সঞ্চয়-রাজকোষ থেকে খরচ করতে দিতেন না। সেখান থেকে কিছু নিলে তাঁরা সেটা ধার হিসাবে নিতেন এবং ঠিক সমপরিমাণে পরে ফেরত দিয়ে দিতেন। এইভাবে যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হয়, তাহলে দেশের পুরা আয়টাই বিভিন্ন খরচে ব্যয়িত হয়ে যাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কখনও টাকার দরকার হলে বিপদে পড়তে হয় ও অঙ্গীকার পালনে ত্রুটি ও বিলম্ব হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, প্রদেশগুলো থেকে রাজস্ব হিসাবে রাজকোষে কোন টাকা জমা দিলে সেটা বদল করা বা ভাঙ্গান যেত না। এইভাবে সব খরচপত্র সময়মত করা হোত, পুরস্কার, বেতন এবং উপহারের টাকা সময়মত দেওয়া হোত এবং ধনাগারগুলো সর্বদা পূরণ করে রাখা হোত।

আমি শুনেছি, সুলতান মাহমুদের আমীর-গৃহাধ্যক্ষ আমীর আলতুন তাসকে খোয়ারাজমশাহ নিয়োগ করে খোয়ারাজমে পাঠান হয়। তখন খোয়ারাজমের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬০,০০০ দিনার ; কিন্তু আলতুন তাসের সৈন্যদের বেতনের পরিমাণ ছিল ১২০,০০০ দিনার। আলতুন তাসের খোয়ারাজমে যাবার এক বছর পরে রাজস্ব চেয়ে একজন লোককে পাঠান হোল। আলতুন তাস তাঁর বিশেষ দূতকে গজনীতে পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলেন যে ৬০,০০০ দিনার রাজস্ব খোয়ারাজমের উপর বোঝাস্বরূপ আছে, সেটা দেওয়ান থেকে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর সৈন্যদের বেতন দেবার জন্য তাঁর নিজের নামে নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। সেই সময় উজির ছিলেন শামস আল কুফাত আহমদ ইবনে হাসান মাইমান্দী। তিনি চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখলেন, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে জেনে রাখুন যে, আলতুন তাস কোনমতেই মাহমুদ হতে পারেন না। রাজস্বের টাকাটা তাঁকে সুলতানের ধনাগারে আগে জমা দিতে হবে, স্বর্ণ পরীক্ষা ও ওজন করবার পর হস্তান্তর করে একটা কুপন নিয়ে যাবেন। তারপর তিনি তাঁর ও তাঁর সৈন্যদের বেতন চাইতে পারেন। তাঁকে বুস্ত ও

সিস্তানের জন্য হুণ্ডি দেওয়া হবে ; তিনি তখন লোক পাঠিয়ে খোয়ারাজমে টাকা নিতে পারবেন আর এর ফলে মনিব ও ক্রীতদাস এবং মাহমুদ ও আলতুন তাসের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা হবে। কারণ রাজার কর্তব্য ও সৈনিকদের দায়িত্ব পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে। খোয়ারাজমশাহের নিরর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ তাঁর এই অনুরোধে বোঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই সুলতানকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন অথবা তিনি মনে করেন যে আহমদ ইবনে হাসান অমনোযোগী এবং অনুপযুক্ত। খোয়ারাজমশাহের মত সত্যিকার বিজ্ঞ ও সুস্থ বিচারবোধ সম্পন্ন লোকের কাছ থেকে আমরা এটা আশা করি নাই। তাঁকে নিশ্চয়ই তাঁর এই ভুলের জন্য মাফ চাইতে হবে। ক্রীতদাসদের পক্ষে রাজার অংশীদার হতে চাওয়া ভীষণ বিপদের কথা।'

তিনি দশজন ভৃত্যসহ একজন 'সুবাসী' মারফত চিঠিখানি খোয়ারাজমে পাঠালেন। যাই হোক, ৬০,০০০ দিনার এনে মাহমুদের ধনাগারে দেওয়া হোল এবং তার পরিবর্তে বুস্ত ও সিস্তান প্রদেশের জন্য গাজনাইনের দেওয়ান থেকে হুণ্ডি নেওয়া হোল। লোকেরা ঐ সমস্ত স্থানে গিয়ে হুণ্ডির পরিবর্তে ডালিমের দানা, ওক আপেল, তূলা ইত্যাদি নিয়ে খোয়ারাজমে ফিরে এলো।

দেশের স্বার্থরক্ষার খাতিরে, কৃষক সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে ও রাজকোষের উন্নতি বিধান করতে এবং অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিদেরকে সুলতানের রাজস্ব ও জনগণের সম্পত্তি থেকে বিরত রাখবার জন্য রাজকার্য সর্বদা এইভাবেই পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয়।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়

অভিযোগকারীদের প্রতিবিধান ও ন্যায় বিচার করা

অভিযোগকারীদের ভীড় দরবারে সর্বদাই আছে এবং তারা অনবরত দরবারে আসছে। এমন কি, তারা তাদের আবেদনের উত্তর পেলেও চলে যায় না। কোন আগন্তুক বা রাজদূত রাজধানীতে এসে এই বিশৃঙ্খলা দেখলে মনে করবে যে এই দরবারে লোকদের প্রতি ভীষণ অবিচার করা হচ্ছে। এই জাতীয় জনসমাবেশের পথ বন্ধ করতেই হবে এবং শহরই হোক আর গ্রামই হোক প্রত্যেকটা অনুরোধ শুনতে হবে ও সেগুলোর উৎস লিখে রাখতে হবে। তারপরে পাঁচজন করে দরবারে এসে তাদের বক্তব্য বলবে, পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবে, উত্তর শুনবে এবং বিচারের রায় পাবে। মামলার রায় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেখান থেকে চলে যেতে হবে যাতে এই অপ্রয়োজনীয় বিশৃঙ্খলা আর না থাকে।

কথিত আছে যে, ইয়াজদিজিরদ শাহরিয়ার খলীফা উমরের (রাঃ) কাছে এক দূতকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'সারা দুনিয়াতে আমাদের দরবারের মত আর কোথাও এত ভীড় নাই, আমাদের মত কোথাও এত পরিপূরিত ধনাগার আর নাই, আমাদের সৈন্যদের মত সাহসী আর কোথাও নাই এবং আমাদের যত বেশী সম্পদ আছে আর কারো এত নাই।' হযরত উমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের দরবার জনাকীর্ণ কিন্তু সেটা অভিযোগকারীদের ভীড়, তোমাদের ধনাগার পরিপূর্ণ কিন্তু অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদে, তোমাদের সৈন্যরা সাহসী কিন্তু অবাধ্যও বটে; ভাগ্য অপ্রসন্ন হলে ধন-সম্পদ কোন কাজেই আসে না। এই সমস্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তোমাদের ভাগ্য ক্ষীয়মান হচ্ছে এবং ধ্বংসের পথে যাচ্ছে তোমাদের রাজ্য।' আর হয়েছিলও তাই।

প্রত্যেকে যাতে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারে এবং অসৎ ও অসম্ভব বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা যাতে বন্ধ হয় সেজন্য শাসনকর্তাদের উচিত নিজেরা উপস্থিত থেকে ন্যায় বিচার করা, যেমন করেছিলেন সুলতান মাহ্‌মুদ।

মাস্‌উদ ইবনে মাহ্‌মুদ ও তাঁর ঋণের গল্প

কথিত আছে যে, এক ব্যবসায়ী সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে মাস্‌উদ ইবনে মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে নালিশ এনে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে বলল, 'আমি একজন ব্যবসায়ী, অনেক দিন হোল আমি এখানে এসেছি এখন আমি আমার নিজের শহরে ফিরে যেতে চাই। আমি যেতে পারছি না, কারণ আপনার ছেলে আমার থেকে ৬০,০০০ দিনার মূল্যের জিনিস কিনেছে কিন্তু আমার টাকা এখনও দেয় নাই। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমীর মাস্‌উদকে আমার সঙ্গে বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য।' ব্যবসায়ীর কথা শুনে সুলতান মাহ্‌মুদ খুব বিরক্ত হলেন এবং মাস্‌উদকে কঠোর বাণী পাঠিয়ে বললেন, 'আমি চাই, তুমি লোকটার পাওনা টাকা ফেরত দিয়ে দাও অথবা লোকটার সঙ্গে বিচারকের কাছে যাও যাতে মুসলিম আইন মোতাবেক বিচারক রায় দিতে পারেন।' ব্যবসায়ী বিচারকের বাড়ীতে গেল আর একজন দূত গিয়ে মাস্‌উদকে দিল খবরটা। শুনে মাস্‌উদ হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর কোষাধ্যক্ষকে বললেন, 'দেখুন ধনাগারে মোট কতটাকা আছে।' কোষাধ্যক্ষ গুণে বললেন, '২০,০০০ দিনার আছে।' তিনি বললেন, 'এগুলো ব্যবসায়ীকে দিয়ে বাকী টাকার জন্য তিন দিনের সময় চাইবেন।' আর দূতকে বললেন, 'সুলতানকে গিয়ে বল যে আমি এক্ষুণি ২০,০০০ দিনার পরিশোধ করেছি আর বাকীটা তিন দিনের মধ্যে দিয়ে দিব। আমি এখানে সুলতানের আদেশের অপেক্ষায় রইলাম।' মাহ্‌মুদ বললেন, 'আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে, ব্যবসায়ীর পুরা টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তুমি আমার মুখ দেখবে না।' মাস্‌উদের আর কিছু বলতে সাহস হোল না। তিনি চারদিকে লোক পাঠালেন টাকা ধারের জন্য। আসরের নামাজের মধ্যে পুরা ৬০,০০০ দিনার পরিশোধ করা হোল। এই সংবাদ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন চীন, ক্যাথে, মিসর এবং এডেন থেকে ব্যবসায়ীরা দুনিয়ার বাছাই করা জিনিসপত্র নিয়ে গজনী অভিমুখে রওয়ানা হোল।

কিন্তু এই যুগের রাজাদের ব্যাপার ভিন্ন। তাঁরা নগণ্যতম ভৃত্য বা সহিসকেও যদি বালখের বেসামরিক গভর্নর অথবা মার্ভের মেয়রের সঙ্গে আইন-আদালতে উপস্থিত হতে বলেন, সেও আইন অমান্য করবে এবং রাজার কথার এতটুকু তোয়াক্কা করবে না।

হোম্‌স শহরের শাসনকর্তা উমর ইবনে আবদ-আল-আজিজকে লিখলেন, 'হোম্‌স শহরের প্রাচীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এটা তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। আপনার কি আদেশ?' উমর উত্তর দিলেন, 'হোম্‌স শহর ন্যায় বিচারের প্রাচীর দ্বারা রক্ষা করা হোক এবং ভীতি ও বিশৃঙ্খলার রাস্তা নির্মূল করা হোক। তাহলে ইট, পাথর ও চুনের আর প্রয়োজন হবে না।'

আল্লাহ্‌তায়ালা দাউদ (আঃ)-কে আদেশ করলেন, (কোরআন ৩৮·২৫), 'হে দাউদ, আমি পৃথিবীতে তোমাকে প্রতিনিধি করেছি যাতে তুমি লোকের সঙ্গে নিরপেক্ষ ব্যবহার কর।' কোরআনে উল্লিখিত আছে (৩৯·৩৭), 'আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার রেজেকদাতা ন'ন?'

হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে ভাল লোক থাকা সত্ত্বেও অন্য একজনকে মুসলমানদের শাসনকর্তা নিয়োগ করে সে আল্লাহ্‌র, তাঁর নবীর এবং সমস্ত মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।' অর্থাৎ ভাল, ধার্মিক ও সৎ লোকদের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা উচিত যাতে তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট না দিয়ে বরং তাদের প্রতি দয়াপ্রবণ হয়। এমন একজনকে যদি নিয়োগ করা হয় যার মধ্যে ঐ সমস্ত গুণ নাই, তাহলে আল্লাহ্‌, নবী ও মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

এই দুনিয়া রাজাদের কাজের পরীক্ষাশালা। তারা যদি সৎ হয় তাহলে তারা আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করবে এবং সকলেই তাদেরকে স্মরণ করবে আর তারা যদি অসৎ হয়, তাহলে সকলেই অভিশাপ দিবে এবং কেউ তাদের কথা মনে করবে না। যেমন আনসুরী বলেছেন:

'সমস্ত আকাশটাই যদি তোমার সিংহাসন হয় তাহলে তুমি হবে প্রসিদ্ধ আর তারকা দ্বারা যদি তুমি তৈরী কর তোমার কটিবন্দ্‌ তাহলে হবে যশস্বী; তবে যশ অর্জন করলে দেখবে সেটা যেন হয় পবিত্র ও দৃঢ়; এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করলে দেখবে সেটা যেন ভালর জন্যই হয়।'

পঞ্চাশ অধ্যায়

প্রদেশসমূহের রাজস্বের হিসাব-রক্ষণ প্রণালী প্রসঙ্গে

প্রদেশসমূহের রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা উচিত। এর উপকারিতা হোল যে, ব্যয়-তালিকার উপর একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখা যায়; কোন জিনিস কমাবার প্রয়োজন হলে সেটা বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারো যদি আয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছু বলার থাকে এবং সে যদি আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন প্রস্তাব দেয় তাহলে তার কথা শোনা উচিত এবং তার কথায় কোন যৌক্তিকতা থাকলে তা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আর যদি বোঝা যায় যে, কোথাও টাকার অপচয় করা হচ্ছে তাহলে সেটাও বন্ধ করা যাবে এবং রাজ্যের সত্যিকার অবস্থা কখনও অগোচর থাকবে না।

আর অর্থ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হলে রাজাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, তাকে প্রাচীন রীতি-নীতি এবং ভাল ভাল রাজাদের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন ও অন্যান্য প্রথা মেনে চলতে হবে। তার কোন অসত্য আইনের সূত্রপাত করা উচিত নয় এবং বিধর্মীদের কোন কিছুতে সম্মতিও জ্ঞাপন করা উচিত নয়। আয়-ব্যয় সম্পর্কে জানবার জন্য, রাজস্ব বিষয়ে তদারক করার এবং রাজ্যকে শক্তিশালী করার ও শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শাসনকর্তাদের কার্যকলাপ ও লেনদেন তদারক করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। তাঁর এত কৃপণ হওয়া উচিত নয় যাতে লোকেরা তাঁকে অতিলোভী অথবা পার্থিব বলে গণ্য করে। অন্যদিকে তাঁর এমনভাবে টাকা অপচয়ও করা উচিত নয় যাতে লোকেরা তাঁকে অপব্যয়ী এবং অকর্মণ্য বলতে পারে। উৎসবের সময়ে উপহারদ্রব্য বিতরণের ব্যাপারে রাজাকে প্রাপকের পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। দশ দিনার যদি কোন লোকের জন্য উপযুক্ত হয় তাহলে তাকে এক শত দিনার দেওয়া উচিত নয় অথবা এমন লোককে এক হাজার দিনার উপহার দেওয়া উচিত নয় যে ব্যক্তি এক শত দিনার পাবার উপযুক্ত। কারণ এটা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। তাছাড়া লোকেরা বলবে যে, রাজা লোকের যোগ্যতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাঁর প্রজাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতি উদাসীন। . তখন লোকেরা কারণে-অকারণে রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং তাদের কাজে তারা পূর্বের ন্যায় মনোযোগী থাকবে না।

অধিকন্তু রাজার তাঁর শত্রুদের সঙ্গে এমনভাবে যুদ্ধ করতে হবে যাতে শান্তি বজায় থাকে ; তাঁর এমনভাবে বন্ধুত্ব করতে হবে যেটার বিচ্ছেদ হতে পারে এবং এমনভাবে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে যেটা আবার পুনরায় গড়ে তোলা যায়। পানাসক্তিবশতঃ তাঁর মদ খাওয়া উচিত নয়। তাঁর সর্বদা রঙ্গপ্রিয়ও হওয়া উচিত নয় আবার অতিশয় কঠোরতাও অবলম্বন করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে আমোদ-ফুর্তি, শিকার, মদ্যপান এবং অন্যান্য পার্থিব উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কখনও কখনও ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভিক্ষাদান, নৈশ উপাসনা, রোজা রাখা এবং দানশীল কাজেও নিমগ্ন থাকতে হবে। তাহলেই তিনি উভয় জগতে লাভবান হবেন। সব কাজেই তাঁর মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কারণ হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'মধ্যমই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' কারণ মধ্যম পন্থাই সবচেয়ে বেশী লোকের অনুমোদন লাভ করে। সব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশমত করলে তাঁর আর কোন দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। তিনি যদি কোরআনের বাণী ও ধর্মীয় অনুশাসন অত্যন্ত আগ্রহসহকারে পালন করেন তাহলে ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে আল্লাহ্ তাঁকে শক্তিশালী করবেন এবং ইহকালে ও পরকালে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে।

উপসংহার

এখানেই শেষ হোল রাজার শাসনবিধি। এই খাদেমকে পূর্বেই এই বিষয়ে একখানি বই সংকলন করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সে সেটা পালন করেছে। সেই সময় পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতীত ঊনচল্লিশটি অধ্যায় রচনা করে সেগুলো রাজ-দরবারে পেশ করা হয়েছিল। সেগুলো গ্রহণীয় বলে বিবেচিতও হয়েছিল। যাই হোক, সেটা ছিল সংক্ষিপ্তসার মাত্র। পরে অবসর সময়ে সেই সংক্ষিপ্তসারকে সম্প্রসারণ করে বিভিন্ন বিষয়ের সবকিছু স্বচ্ছতম ও সহজতম ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রাসঙ্গিক গল্প ও উদ্ধৃতিসহ কতিপয় অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। ৪৮৫ হিজরীতে আমরা যখন বাগদাদের পথে রওনা হচ্ছিলাম, তখন আমি পুস্তকখানা রাজকীয় পুস্তকের নকলনবিস মোহাম্মদ মাগিখকে সেই পুস্তকখানা সুন্দর হাতের লেখায় নকল করতে এবং যদি আমার ঐ যাত্রা থেকে ফেরা না হয় তাহলে পুস্তকখানা সুলতানের হাতে তুলে দিতে বলি—যাতে তিনি সতর্ক থাকতে পারেন এবং তাঁর

অনুগত ক্রীতদাসের আনুগত্য ও রাজানুগত্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। অন্যেরা কি বলে সেটা না শুনে তিনি যেন এই পুস্তক সর্বদা পড়েন। এই পুস্তক পড়ে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করবেন না, কারণ এতে লিপিবদ্ধ আছে উপদেশ, বিজ্ঞতা, প্রবাদ, কোরআনের ব্যাখ্যা, হাদীস, নবীদের গল্প, ধার্মিক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা এবং ন্যায়পরায়ণ রাজাদের গল্প এবং এর মধ্যে আছে মৃত ব্যক্তিদের জীবনী এবং জীবিতদের জীবন কথা ও কার্যকলাপ ; সবকিছু মিলে এটা একটা সংক্ষিপ্তসার মাত্র এবং ধার্মিক রাজার দৃষ্টি এর প্রতি পড়া উচিত। আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন কোনটা ন্যায়।